মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম
যাকাত

যাকাত

মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম (রহ)

প্রকাশকাল ঃ

২য় ঃ মে ২০১০ ॥

গ্রন্থস্বত্ব ঃ

খায়রুন প্রকাশনী

প্রকাশক ঃ

মোস্তাফা তারেকুল হাসান

খায়রুন প্রকাশনী

প্রচ্ছদ ঃ

আবদুল্লাহ্ জুবাইর

শব্দ বিন্যাস ঃ

মোস্তাফা কম্পিউটার্স (ওয়ালী উল্যাহ ভুইয়া)

১০/ই-এ/১, মধুবাগ, মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

মুদ্রণ ঃ

আফতাব আর্ট প্রেস, ২/১ তনুগ লেন, ঢাকা

মূল্য ঃ ১০০.০০ টাকা

ISBN : 984-8455-10-2

www.amarboi.org

প্রকাশকের কথা

ইসলাম আল্লাহ্‌র দেওয়া একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। এ জীবন ব্যবস্থায় নামাযের গুরুত্ব যেমন অপরিসীম তেমনি গুরুত্ব রয়েছে যাকাতের। কুরআনুল কারীমের বহুতর স্থানে নামায প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে যাকাত প্রদানের আদেশ দেওয়া হয়েছে। অথচ মুসলিম সমাজ যাকাতের গুরুত্ব আজ প্রায় ভুলে বসেছে। যাকাত মুসলিম সমাজের জন্য যেমন একটি তওহীদী আকীদাহ্ তেমনি সামাজিক সুস্থতা ও অর্থনৈতিক ভারসাম্য। যাকাত যেমন ধনশালীর ধরকে হালাল করে তদ্রুপ গরীব জনগণের জন্য সচ্ছলতা এনে দেয়। মুসলিম সমাজে ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা ও অর্থনৈতিক ব্যবধান কমাতে এর গুরুত্ব অপরিসীম।

এ উপমহাদেশের বিখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম (রহ) আশির দশকে ইসলামিক ফাউণ্ডেশনের এক সেমিনারে 'ইসলামী অর্থনীতিতে যাকাত ও ওশর' শীর্ষক এক প্রবন্ধ পাঠ করেন। এ প্রবন্ধটি পাঠ করার সময় সেমীনারে উপস্থিত শ্রোতাদের মাঝে আলোড়ন সৃষ্টি হয়। ইসলামী ফাউণ্ডেশন পরবর্তীতে প্রবন্ধটি তাদের মাসিক পত্রিকা ইসলামিক ফাউণ্ডেশন পত্রিকায় প্রকাশ করে।

খায়রুন প্রকাশনী ইতোমধ্যে মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম অনূদিত আল্লামা কারযাভীর 'ইসলামের যাকাত বিধান' নামে দুই খণ্ডে বৃহৎ দুখানি গ্রন্থ প্রকাশ করেছে। গ্রন্থ দু'টির বিশালত্বের কারণে এর মূল্য বেশি থাকায় বৃহত্তর পাঠকের চাহিদার দিকে লক্ষ্য রেখে প্রকাশনীর তরফ থেকে মওলানার উক্ত প্রবন্ধের সাথে ইসলামের যাকাত বিধানের 'যাকাত ব্যয়ের খাতসমূহ' থেকে বিশেষ অংশ সংযোজন করে 'যাকাত' নামে এ গ্রন্থ প্রকাশ করছে। যাতে এদেশের সাধারণ জনগণ যাকাতের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে এবং কোন কোন খাতে যাকাত প্রদান করতে হবে তা অনুধাবন করতে পারে। আশাকরি মহান সৃষ্টিকর্তা আমাদের এ প্রচেষ্টাকে সফলকাম করবেন।

প্রকাশক

www.amarboi.org

সূচী পত্র

www.amarboi.org

www.amarboi.org

www.amarboi.org

যাবগত

যাবগত
যাবগত

www.amarboi.org

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

যাকাত

যাকাত তিনটি দিক দিয়ে বিবেচ্য

- ⊕ তওহীদী আকীদাহ
- ⊕ সামাজিক সুস্থতা
- ⊕ অর্থনৈতিক ভারসাম্য

তওহীদী আকীদা

ইসলাম তওহীদী আকীদাহ ভিত্তি দ্বীন, মূল ঘোষণা ঃ

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ -

الـــــه- মাবুদ-সার্বভৌম, মালিক, এই তিনটি দিকদিয়ে একমাত্র আল্লাহই চূড়ান্ত- সর্বোচ্চ, আল্লাহ-ই মাবুদ আর আল্লাহ-ই সার্বভৌম, আল্লাহ-ই মালিক।

মাবুদ আল্লাহ ছাড়া আর কেউ নয়, কেউ নেই- ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ। সার্বভৌম একমাত্র আল্লাহ্র আল্লাহ্ তা'আলা ছাড়া সার্বভৌম আর কেউ নেই- এ সামাজিক ও রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ।

মালিক আল্লাহ ছাড়া আর কেউ নেই, গোটা বিশ্ব প্রকৃতির, সমস্ত মানুষের- মানুষের যাবতীয় শক্তি-সামর্থের এবং যাবতীয় সম্পদ-সম্পত্তির নিরংকুশ মালিক একমাত্র আল্লাহ- এটাই সামাজিক ও অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ।

ইসলামে এই প্রধান তিনওটি দিক দিয়ে তিনি সার্বোচ্চ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত রয়েছেন। তিনি ছাড়া স্বতন্ত্রভাবে এর কোনো একটি দিক দিয়েও আর কেউ নেই। যাকাত সম্পর্কিত ধারণায় এই তিনওটি দিক আল্লাহতেই পরিণত আর এ-ই হচ্ছে তাওহীদী আকীদা।

ক. নামায ও রোযা ইত্যাদির ন্যায় যাকাত একটি ইবাদত। অতএব যাকাত আদায় করে- যাকাত ফরয হয় যে লোকদের ওপর- তারা এই ইবাদত করে।

খ. আল্লাহ্ই সার্বভৌম। আর সার্বভৌমের আদেশ নিষেধ আইন। আইন কি, এ প্রশ্নের জবাবে আইন দার্শনিকদের কথা হলো ঃ Command of the soveriegn. যাকাত সম্পর্কে কুরআন মজীদে আল্লাহ তা'আলা সুস্পষ্ট আদেশ করেন واتوالزكوة -এবং যাকাত দাও। অতএব যাকাত দিতে হবে। কেননা তা আল্লাহ হুকুম- যিনি সার্বভৌম।

www.amarboi.org

গ. আল্লাহ্ মালিক, আল্লাহ সারে জাহানের মালিক, মানব সত্তার এবং মানব সত্তায় নিহিত মেধা, বুদ্ধি-জ্ঞান, বিবেচনা-বিচক্ষণতা দৈহিক কর্মশক্তি– এই সব কিছুর একমাত্র মালিক তিনিই। মালিকের হুকুম তারই মালিকানা সম্পদে অবশ্যই কার্যকর হতে হবে। মানুষের নিকট ধন-সম্পদ যা কিছু আছে, তা হয় উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছে না হয় নিজের মেধা, বুদ্ধি-জ্ঞান, বিচক্ষণতা দিয়ে– অথবা দৈহিক শ্রম দিয়ে উপার্জন করেছে– উপার্জনের এইসব সূত্র একমাত্র আল্লাহ্র উদ্ভাবিত, আল্লাহ্র সৃষ্ট। অতএব আল্লাহ্র মালিকানা সম্পদ থেকেই আল্লাহ্রই আদেশে যাকাত দিতে হবে। কেননা তা এক ব্যক্তির নিকট আছে বটে; কিন্তু সে তো তার মালিক নয়, সে তার আমানতদার। মালিক হচ্ছেন আল্লাহ ঃ

وَاَنْفِقُوْا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَخْلَفِيْنَ فِيْهِ -

এবং ব্যয় করো সে সব জিনিস হতে যে সবের ওপর তিনি তোমাদেরকে খলিফা বানিয়েছেন। (সূরা হাদীদ ঃ ৭)

وَاٰتُوْهُمْ مِّنْ مَّالِ اللّٰهِ الَّذِىْۤ اٰتٰكُمْ -

আর তোমাদের সেই মাল-সম্পদ হতে দাও যা আল্লাহ তোমাদেরকে দিয়েছেন। (সূরা নূর ঃ ৩৩)

এ হলো তওহীদী আকীদার দিক দিয়ে যাকাতের মূল্যায়ন। তাই আল্লাহ্র হুকুম হিসেবেই যাকাত দিতে হবে।

সামাজিক সুস্থতা

সামাজিক দিক দিয়ে বিবেচনা করলে দেখা যাবে, মানব সমাজের জন্যে সবচাইতে কল্যাণকর ব্যবস্থা এই যাকাত।

সমাজের লোকদের পরস্পরের মধ্যে সহনুভূতি, দরদ– একের দুঃখে-বিপদে-অভাবে অন্য লোকদের সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়া, প্রত্যেকের মনে এই অনুভূতি যে, আমি অসহায় নই– তা সৃষ্টি করার ব্যাপারে যাকাতের ভূমিকা অনন্য এবং অনস্বীকার্য।

সমাজের কিছু লোক ধনী-সচ্ছল হবে, আর বিপুল সংখ্যক লোক হবে দরিদ্র, কপর্দকহীন, তা সুষ্ঠু ও কল্যাণময় সমাজের লক্ষণ নয়। কেউ খাবে, আর কেউ খাবে না– তা হবে না-তা হবে না– এতো ইসলামেরই কথা। রাসূলে করীম (স) বলেছেন ঃ

www.amarboi.org

لَيْسَ بِمُؤْمِنٍ مَنْ بَاتَ شَبْعَانَ وَعَارُهٗ اِلٰى جَنْبِهٖ جَائِعٌ وَهُوَ يَعْلَمُ -

দারিদ্র প্রধানত ও প্রথমত কয়টি সামাজিক সমস্যা। পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্র– এ দু'টি চরমপন্থী ব্যবস্থার সম্পূর্ণ বিপরীতে ইসলাম একটি মধ্যম পন্থা সমাধান দিয়েছে।

পুঁজিবাদী সমাজে বহু প্রকারের অর্থনৈতিক কল্যাণমূলক কলা-কৌশল গ্রহণ করা হয়েছে বটে; কিন্তু তা সত্ত্বেও দরিদ্র শ্রেণীর লোকদের অভাব-অনটন ও পর-মুখাপেক্ষিতা পর-নির্ভরশীলতার অবসান হয়নি। আর সমাজতান্ত্রিক সমাজে ব্যক্তি মাত্রকেই তার ব্যক্তিগত মালিকানা থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে।

ইসলামে পুঁজিবাদী ব্যক্তি মালিকানা সম্পূর্ণ অস্বীকার করা হয়েছে। সেখানে খিলাফত ও আমানতদারী অর্থে নীতিগতভাবে ব্যক্তি ব্যবস্থাপনা কার্যকর করা হয়েছে। আর তার ওপর এমন কঠোর নিয়ন্ত্রণ কার্যকর করা হয়েছে যে, তার ফলে দরিদ্র লোকেরা সর্বপ্রকারের শোষণ ও বঞ্চনা থেকে মুক্তি লাভ করতে পারে।

ইসলামে মানুষকে প্রথমেই সামাজিক অর্থনৈতিক নিরাপত্তা দেওয়া হয়েছে। এই নিরাপত্তা ব্যবস্থার মেরুদন্ড– সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থা হচ্ছে যাকাত। এরূপ ব্যবস্থা যে সমাজে নেই, সে সমাজ মূলতই দ্বিধা-বিভক্ত। সেখানে তার অনিবার্য ফল হিসেবে শ্রেণী সংগ্রাম দেখা দেওয়া অবধারিত।

যাকাত বন্টনের জন্য আল্লাহ তা'আলা নিজেই যে আটটি খাত নির্দিষ্ট করেছেন, যাকাত যদি রীতিমত আদায় করা এবং প্রয়োজন মতো বন্টা করা হয়, তাহলে সমাজ হবে নিরবচ্ছিন্ন নিবিড় ও ঘন বিন্যস্ত compact। সামাজে সাময়িকভাবে গড়ে উঠা অর্থ সম্পদের এককেন্দ্রিকতা যেন বরফের পর্বতমালা যা সূর্য তাপে নিরন্তর গলে গলে চতুর্দিকের শুষ্ক নিরম্বু (পানিহীন) সমতল ভূমিকে সিক্ত ও শস্য শ্যামল তরতাজা বানিয়ে রাখছে।

অর্থনৈতিক ভারসাম্য

অর্থনৈতিক ভারসাম্যের দিক দিয়ে মূল্যায়নে যাকাতের গুরুত্ব আরো প্রকট। পাশ্চাত্য অর্থনীতির মেরুদণ্ড সুদ; কিন্তু ইসলামী অর্থনীতির মেরুদণ্ড যাকাত। সুদ শোষণ ও বঞ্চনার হাতিয়ার। তাতে ধনী লোকেরা অভাবগ্রস্থ লোকদেরকে ঋণ দেয় সুদের ভিত্তিতে। ফলে তারা নিজেদের মূলধন ফিরিয়ে নেয়ার সঙ্গে সঙ্গে অতিরিক্তি অর্থ নেয়, যা ঋণ গ্রহীতার মাথার ঘাম পায়ে ফেলে ও রক্ত পানি করে উপার্জন করা। এই অতিরিক্ত টাকা নিয়ে ঋণ গ্রহীতাকে বিনিময়ে কিছুই দেয় না।

www.amarboi.org

ঋণ গ্রহীতা নিজের উপার্জিত টাকা কোনোরূপ বিনিময় না পেয়েই দিতে বাধ্য হয়। ফলে ধনী আরও ধনী এবং দরিদ্র আরও দরিদ্র হয়ে যায়।

দরিদ্র লোকদের দারিদ্রতা মোচনের জন্যে বেশি বেশি অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং বহু ধরনের ও রকমের ব্যবস্থা গ্রহীত হয়েছে। বলা হয়েছে, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি হলে বেশি বেশি লোক কর্মে নিয়োগ করতে পারলে দারিদ্র সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। কিন্তু কার্যত দেখা গেছে জাতীয় অর্থনীতিতে যতই প্রবৃদ্ধি হয়েছে, জাতীয় সম্পদের বিরাট অংশ মুষ্টিমেয় লোকদের কুক্ষিগত হয়েছে, দরিদ্র ও অভাবগ্রস্থ লোকেরা আরো দরিদ্র হয়ে পড়েছে।

এক কথায় পাশ্চাত্য অর্থনীতি দারিদ্র্য সমস্যার সমাধান করতে ব্যর্থ হয়েছে। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে মাথাপিছু গড় আয় বৃদ্ধি পাবে এটা ঠিক কিন্তু সে প্রবৃদ্ধিটা মুষ্টিমেয় ব্যক্তি বা পরিবার কিংবা গোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ ও কুক্ষিগত হয়ে যায়। ফলে ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে পার্থক্য পূর্বের তুলনায় আরও বেড়ে যাবে। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও বিরাট জাতীয় আয় বৃদ্ধি পেলেও তা সুসম বন্টনের অভাবের কারণেই এই প্রবৃদ্ধি দরিদ্র জনগণের ওপর মারাত্মক অভিশাপ হয়ে দেখা দিবে।

এটা বড় কৌতুকের বিষয় যে, ভূত তাড়ানোর জন্যে যে ওঝা আনা হলো সে ওঝা ভূতটি আরও শক্ত করে বসিয়ে দিল। রোগের চিকিৎসার জন্যে যে ডাক্তার আনা হলো সে ডাক্তার রোগকে আরও মারাত্মক করে দিল। যে সব ব্যবস্থাপনা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি সৃষ্টিকরে, তা-ই একদিকে অর্থনৈতিক এক-কেন্দ্রিকতা এবং অপরদিকে অর্থনৈতিক শূন্যতার সৃষ্টি করে স্বাভাবিকভাবে। দারিদ্র্য সমস্যার সমাধানের জন্য maximigation of G. N. P এবং full emplyment ইত্যাদি উপায়ও অবলম্বিত হয়েছে বা হতে পারে। কিন্তু এ সব কলাকৌশলও কিছুমাত্র সফল হয়নি। এ সব উপায়ে অপ্রত্যক্ষভাবে দারিদ্র সমস্যার সমাধান করতে চাওয়া হলে তার ব্যর্থতা অবশ্যাম্ভাবী।

এই প্রেক্ষিতে যাকাতের অবদান পর্যালোচনা করলে প্রমাণিত হয় যে, যাকাত যেহেতু সরাসরিভাবে ধনীদের নিকট থেকে দরিদ্রদের নিকট সম্পদ হস্তান্তরিত হয়, ফলে একদিকে ধন-সম্পদের এককেন্দ্রিকতা কমতে থাকে। আর সেই সম্পদেই দরিদ্রদের নিকট প্রত্যক্ষভাবে পৌঁছে তাদের দারিদ্রতা ও অভাব মোচন করে। তারা ক্রয় ক্ষমতা লাভ করে। পণ্য দ্রব্যের ব্যাপক ক্রয়-বিক্রয় শুরু হয়, ফলে ব্যাপক উৎপাদন, কল-কারখানা চলে, শ্রমিক নিয়োগ– বেকারত্ব হ্রাস– এক সাথে এই সব কাজ শুরু হয়ে যায়।

তাই যাকাতের অর্থনৈতিক মূল্যায়নে আমাদের কথা হলো যাকাতই হচ্ছে দারিদ্র্য সমস্যার একমাত্র স্বাভাবিক, কার্যকর ও আল্লাহ্র সন্তুষ্টি মূলক সমাধান।

www.amarboi.org

যাকাত-এর প্রকৃতি উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য

'যাকাত' زكواة শব্দটি কুরআন মজীদের বহুল ব্যবহৃত একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ পরিভাষা। এ পারিভাষিক শব্দটির প্রকৃত তাৎপর্য এবং শরীয়তভুক্ত একটি বিধি হিসেবে তার গুরুত্ব ও মর্যাদা সম্পর্কে নির্ভুল ধারণা ও জ্ঞান লাভ করার জন্যে আমাদেরকে প্রথমেই কুরআনকে ভিত্তি করেই আলোচনা চালাতে হবে। অন্যথায় যাকাত-এর প্রকৃতি, লক্ষ্য-উদ্দেশ্য যথার্থভাবে বুঝতে পারা যাবে না এবং এক্ষেত্রে ভুল-ভ্রান্তি থেকে রক্ষা পাওয়াও কঠিন হবে। এ আলোচনা প্রধানত ও মৌলিকভাবে কেবলমাত্র কুরআনকে ভিত্তি করেই হতে হবে। কেননা 'যাকাত' শব্দ ও যাকাত পর্যায়ের মৌলিক ব্যবস্থাপনা কুরআনই উপস্থাপিত করেছে। এক্ষেত্রে মানবীয় কল্পনার নিজস্ব কোনো ভূমিকা নেই, কল্পনা করে নিজস্ব মত বা চিন্তাকে কুরআনের ওপর চাপিয়ে দেওয়ার বা এর কোনো মনগড়া ব্যাখ্যা দেওয়ার, কুরআনের ছত্রে ছত্রে নিজের চিন্তা পাঠ করার ও কুরআনেরই দোহাই দেওয়ার কোনো অধিকার কারোরই থাকতে পারে না। তাই আমরা সর্বপ্রথম 'যাকাত' শব্দটির আভিধানিক তাৎপর্য তুলে ধরব এবং তারপর কুরআনে এ শব্দটির ব্যবহার পর্যায়ে ব্যাপক আলোচনা পেশ করব। এজন্যে আমাদেরকে তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখতে হবে, কুরআনের কোনো সূরার কোনো আয়াতে এবং কোনো অর্থে এ শব্দটির ব্যবহার হয়েছে।

زكواة 'যাকাত' শব্দের তাৎপর্য

ইমাম রাগিব আল-ইসফাহানী তাঁর المفردات في غرائب القران গ্রন্থে زكا বা زكواة শব্দের তাৎপর্য ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে লিখেছেন ঃ

اصل الزكواة النمو الحاصل عن بركة الله تعالى ويعتبر ذالك بالا مور الدنيوية والاخروية يقال زكا الزرع يزكوا اذا حصل منه نمو وبركة وقوله تعالى ايهاازكى طعاما اشارة الى ما يكون حلالا لايستوخم عقباه ومنه الزكاة لما يخرج الانسان

www.amarboi.org

من حق الله تعالى الى الفقراء وتسميته بذلك لما يكون فيها من رجاء البركة اولتزكية النفس اى تنميتها بالخيرات اولها جميعا - فان الخيرين موجودان فيها وقرن الله تعالى الزكواة بالصلواة فى القران بقوله واقيموا الصلواة واتوا الزكاة بزكاء النفس وطهارتها يصير الانسان بحيث يستحق فى الدنيا الاوصاف المحمودة وفى الاخرة الاجر المثوبة وهو ان يتحرى الانسان ما فيه تطهيره (ص ٢١٢-٢١٣)

'যাকাত' শব্দের আসল অর্থ হচ্ছে 'প্রবৃদ্ধি' (Growth), 'প্রবৃদ্ধি লাভ' (Increase), 'প্রবৃদ্ধির কারণ হওয়া' (To cause to grow) ইত্যাদি যা আল্লাহ্ প্রদত্ত 'বারাকাত' (Blessing) থেকে অর্জিত হয়। তা বৈষয়িক ও পারলৌকিক উভয় ক্ষেত্র সম্পর্কিত ব্যাপারাদিতেই গণ্য করা যায়। বলা হয়; কৃষি ফসল প্রবৃদ্ধি লাভ করেছে ও করছে, যখন সে ক্ষেত্রে প্রবৃদ্ধি ও বারাকাত লাভ হয়। কুরআনের আয়াতাংশ ايها ازكى طعام অর্থ ঃ কোন জিনিস খাদ্য হিসেবে অধিক পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন'[১] (অথবা সবচেয়ে উত্তম খাবার কোনটি) বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যা হালাল– পরে পচে যায় না, সেই খাদ্যের প্রতি। আর এ শব্দ থেকেই গঠিত হয়েছে 'যাকাত' শব্দটি। তা বলা হয় সে কাজ বা সম্পদকে যা আল্লাহ্র হক্ হিসেবে মানুষ ফকীর-মিসকীনকে দেয়। সেই কাজ বা জিনিসকে যাকাত নাম রাখা হয়েছে এজন্যে যে, তাতে বরকত পাওয়ার আশা করা যায় অথবা তাতে নফ্সের পবিত্রতা-পরিশুদ্ধতা বিধান হয় অর্থাৎ তা পরিবর্ধিত হয় কল্যাণময় কার্যাদির কারণে। 'যাকাত' শব্দের দ্বারা একসাথে এ দুটো কথাই বোঝানো যেতে পারে। কেননা, যাকাতে এ উভয় ধরনের কল্যাণই সমানভাবে নিহিত রয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা কুরআন মজীদে যাকাতকে নামায-এর সঙ্গে একত্র মিলিত করে উল্লেখ করেছেন ও বলেছেন ঃ 'নামায কায়েম করো ও যাকাত দাও'। কেননা নফসের পরিচ্ছন্নতা পরিশুদ্ধতা ও পবিত্রতার দ্বারাই মানুষ দুনিয়ায় মহান উত্তম গুণাবলীর অধিকারী হতে পারে আর পরকালে লাভ করতে পারে শুভ পুণ্য ফল ও সওয়াব।

---

১. সূরা আল-বাকারা ২৩২ আয়াতের অংশ ذلكم ازكى لكم واطهر –তোমাদের অধিক সুষ্ঠু ও পবিত্র কর্মনীতি এ হতে পারে (যে তোমরা এ সব কাজ থেকে বিরত থাকবে)। সূরা আন্-নূর-এর আয়াতাংশ فارجعوا هو ازكى لكم 'তখন তোমাদের ফিরে যাওয়া– তাই তোমাদের জন্যে খুব উত্তম ও অধিক পবিত্র। (আয়াত ঃ২৮)

www.amarboi.org

আর তা এ কারণে যে, মানুষ তালাশ করবে, পেতে চেষ্টা করবে সেই জিনিস যাতে তার পবিত্রতা নিহিত রয়েছে ।

ইমাম শওকানী লিখেছেন ঃ

الزكواة ماخودة من الزكاء وهو النماء زكا الشئى اذانما وزاد رجل زكا اى زائد الخير وسمى جزء من المال زكواة اى زيادة مع انه نقص منه لانها تكثر بركته بذالك اوتكثر اجر صاحبه

زكواة 'যাকাত' শব্দটি মূল زكاء এর অর্থ, প্রবৃদ্ধি, বর্ধিত হওয়া। কোনো জিনিস বৃদ্ধি পেলে এই শব্দ বলা হয় 'বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়া।' খুব বেশি কল্যাণময় হলে তা زكى' 'যাকা' বলা হয়। আর ধন-সম্পদের একটা অংশ বের করে দিলে তাকে 'যাকাত' অর্থাৎ 'বৃদ্ধি পাওয়া বলা হয়, অথচ তাতে কমে।' তা বলা হয় এজন্য যে, যাকাত দিলে তাতে বরকত বেড়ে যায় বা যাকাতদাতা অধিক সওয়াবের অধিকারী হয়।(تفسير فتح القدير ج١ ص ٦٢)

কুরআনের আয়াতভিত্তিক আলোচনা

কুরআন মজীদের মোট ১৮টি সূরার ২৯ আয়াতে الزكواة। শব্দটির উল্লেখ বা ব্যবহার দেখা যায়। তন্মধ্যে ৯ টি সূরা মক্কী আর ৯টি মাদানী। তবে ১৮টি সূরার মধ্যে সূরা আল-মুজ্জাম্মিল মাদানী সূরা রূপে চিহ্নিত হলেও এর মোট দুটি রুকূর প্রথম রুকূটির আয়াতসমূহ মক্কায় নাযিল হয়েছিল বলে মুফাসসিরীন একমত এবং দ্বিতীয় রুকূর আয়াতসমূহ নাযিল হয়েছিল মদীনায়। আর 'যাকাত' সংক্রান্ত আয়াতটি এই দ্বিতীয় রুকূর অন্তর্ভুক্ত বিধায় চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হিসেবে বলা যায় যে, 'যাকাত' শব্দটি মোট 'নয়টি' নয়– 'দশটি' মাদানী আয়াতে বিধৃত এবং ৮টি মক্কায় অবতীর্ণ সূরায় শামিল রয়েছে। (এই মোট ১৮টি সূরা)

মক্কী সূরাসমূহ

মক্কায় অবতীর্ণ সূরাসমূহের নাযিল হওয়ার সময়-কাল সন্ধান করলে দেখা যায়, সূরা 'আল-আরাফ' নাযিল হয়েছিল মক্কী জীবনের শেষ দিকে, সূরা 'মরিয়ম' নাযিল হয়েছিল হাব্‌শায় হিজরতের পূর্বে– যা নবুওয়ত লাভের পঞ্চম বছর রজব মাসে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সূরা 'আল-মুমিনুন' মক্কী জীবনের প্রায় মাঝামাঝি সময়ে, সূরা 'আন্‌-নাম্‌ল' মক্কী জীবনের মধ্যবর্তী সময়ে, সূরা 'আর-রূম' হাব্‌শায়

www.amarboi.org

হিজরতের বছর, 'সূরা লুক্মান' মক্কায় কাফের কুরাইশের বিরুদ্ধতা তীব্র হওয়ার পূর্বে এবং সূরা 'হা-মীম আস্-সিজ্দাহ' হযরত হামযার ইসলাম গ্রহণের পর ও হযরত উমর ফারূকের ইসলাম গ্রহণের পূর্বে নাযিল হয়েছিল। এবং তা ঠিক সেই সময়ে যখন উৎবা ইবনে রবীয়া রাসূল-ই-করীমের সাথে আপোষের কথা বলতে এসেছিল। তা হলে কুরআন মজীদের যাকাত বিষয়ক যে আয়াতটি সর্বপ্রথম নাযিল হয়েছিল, তা হচ্ছে এই সূরা 'হা-মীম আস্ সিজদাহ'র আয়াত। সে আয়াতটি হচ্ছে ঃ

وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِيْنَ - الَّذِيْنَ لَايُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ كٰفِرُوْنَ -

সেই মুশরিকদের ধ্বংস নিশ্চিত যারা যাকাত দেয় না ও পরকাল অমান্যকারী। (আয়াত ঃ ৬-৭)

কুরআন মজীদে 'যাকাত' শব্দটির এ ছিল সর্বপ্রথম উল্লেখ এবং এ উল্লেখ মুশরিকদের পরিচিতিদান প্রসঙ্গে। এখানে 'যাকাত' শব্দের ব্যবহারের কারণ ও তার তাৎপর্য নির্ধারণে তাফসীরকারগণ দুটি মত প্রকাশ করেছেন। এক ভাগের মুফাস্সীরদের মত হচ্ছে, এখানে 'যাকাত' (زكـــوٰة) শব্দের অর্থ আত্মার পবিত্রতা-পরিশুদ্ধতা, যা তওহীদী আকীদা গ্রহণ ও কার্যত আল্লাহ্র আনুগত্য করার ফলে অর্জিত হয়ে থাকে। এই দৃষ্টিতে আয়াতটির তরজমা হবে ঃ 'ধ্বংস সেই মুশরিকদের জন্যে যারা নিজেদের আত্মার পবিত্রতা ও পরিশুদ্ধতা গ্রহণ করে না ও পরকাল যে হবে তা বিশ্বাস বা গ্রাহ্য করে না। অর্থাৎ আয়াতটিতে যাকাত(زكوٰة) শব্দটি ব্যবহার করে একথা বোঝাতে চাওয়া হয়েছে যে, এক আল্লাহ্ ও হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর প্রতি যারা ঈমান আনে না– আল্লাহ বিশ্বাসে দৃঢ়তা অবলম্বন করে না ও তাঁর নিকট ক্ষমা চায় না, তারা মুশরিক; তারা যেমন আত্মার পরিশুদ্ধি সাধন করে না, তেমনি পরকাল হবে, এ কথাও বিশ্বাস করে না। এহেন মুশরিকদের ধ্বংস নিশ্চিত। এ অর্থে 'যাকাত' দেওয়া-নেওয়ার কোনো ব্যাপার নেই। স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে, এ তাফ্সীরে 'যাকাত' (زكـــوٰة) -এর শাব্দিক অর্থের একটি মাত্র দিকের ওপর নির্ভর করা হয়েছে এবং কেবলমাত্র একটি দিককে নেহায়েত শাব্দিক অর্থের দিককে ভিত্তি করেই এ তাফসীর করা হয়েছে। আয়াতটির এ তাফসীর বর্ণিত হয়েছে হযরত ইবনে আব্বাস (রা), তাঁর ছাত্র ইকরামা ও মুজাহিদ থেকে।

এ আয়াতের দ্বিতীয় অর্থে 'যাকাত' অর্থ ধন-সম্পদের 'যাকাত'। এ দৃষ্টিতে আয়াতটির তরজমা হবে ঃ 'ধ্বংস সেই লোকদের জন্যে, যারা শিরক করে আল্লাহ্র হক্ নষ্ট করছে এবং যাকাত না দিয়ে দরিদ্র জনগণের হক্ নষ্ট করছে। আর তার

www.amarboi.org

সার কথা হচ্ছে, ইসলাম গ্রহণ ও পালন করছে না বলেই মুশরিকদের মর্মান্তিক পরিণতি অবধারিত।

বস্তুত এ দুই তাফসীরের মধ্যে মৌলিক কোনো পার্থক্য নেই। এক-একটি তাফসীরে যাকাত زكـوة শব্দের এক-একটি দৃষ্টিকোণ অবলম্বিত হয়েছে এবং এ দুটিকে একত্রিত করে দিতে কোনোই অসুবিধে নেই। শুধু তা-ই নয়, তা-ই হবে পূর্ণাঙ্গ তাফসীর। এবং এ তাফসীরের ওপর নির্ভর করেই আমরা বলতে চাই, কুরআন মজীদে 'যাকাত' সংক্রান্ত এই প্রথম আয়াতটি দ্বারা ইসলামী দাওয়াতের সেই সূচনা মুহূর্তে এ কথা জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল যে, এক আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান গ্রহণের জন্য শিরক পরিহার করা আবশ্যক। সেই সাথে সম্পদশালী লোকদের সম্পদে সমাজের দরিদ্র ও অভাবগ্রস্থ লোকদের অভাব মেটানো বা প্রয়োজন পূরণের জন্যে অংশ রয়েছে এবং সে কাজে অর্থব্যয় করে অন্তরের পরিশুদ্ধি সাধনের জন্যও প্রস্তুত থাকতে হবে। বস্তুত ইসলামী দাওয়াত যে আদর্শ নিয়ে এসেছে, তা যেমন দুনিয়ায় আল্লাহ্‌র হক্ প্রতিষ্ঠাকারী, তেমনি জনগণের হকও প্রতিষ্ঠাকামী। সেই সাথে দরিদ্র জনগণের মনে এ আশ্বাসও জাগিয়ে দেওয়া হয়েছিল যে, আজ ইসলাম প্রতিষ্ঠিত নয়, বরং শির্ক-এর প্রাধান্য রয়েছে বলেই দরিদ্র জনগণের চরম দুর্দশা– ইসলামী সংগ্রাম সফল ও ইসলামী আদর্শ বাস্তবায়িত হলে নিশ্চয়ই এ অবস্থার অবসান হবে। তখন যেমন শিরক-এর মূলোৎপাটন ঘটবে, তেমনি জনগণের অধিকার হরণও চিরতরে বন্ধ হয়ে যাবে।

ঐতিহাসিক পরম্পরায় এ সূরার পর নাযিল হয়েছে সূরা লুকমান-এর 'যাকাত' সম্বলিত আয়াতটি। এ সূরাটি নাযিল হয় যখন, তখন-ও মক্কার কাফেরদের বিরুদ্ধতা তীব্র হয়ে দাঁড়ায়নি। সে আয়াতটি হচ্ছে ঃ

الٓمّٓ ۞ تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْحَكِيْمِ ۞ هُدًى وَّرَحْمَةً لِّلْمُحْسِنِيْنَ ۞ الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ ط ۞ اُولٰٓئِكَ عَلٰى هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۞

আলিফ-লাম-মীম। ইহা মহাজ্ঞানের আঁধার কিতাবের আয়াত। ইহা সেই নেককার লোকদের জন্য হেদায়েতের বিধান ও রহমতের মাধ্যম যারা নামায কায়েম করে, যাকাত দেয়; তারাই পরকালের প্রতি দৃঢ় প্রত্যয় রাখে, তারাই তাদের রব্বের নিকট থেকে আসা হেদায়াতের ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং তারাই সফলকাম। (আয়াত ঃ ১-৫)

www.amarboi.org

এ আয়াতটিতে মুহ্‌সিন[১] –মহান কল্যাণ ভাবধারা পূর্ণ মন-মানসিকতা সম্পন্ন ও পূর্ণচারী লোকদের তিনটি প্রধান গুণ-পরিচিতির মধ্যে একটি গুণ হিসেবে উল্লেখ করা হযেছে ঃ الذين يؤتون الزكواة –'যারা যাকাত দেয়'। আয়াতটিতে নামায কায়েম করা, যাকাত দিয়ে দেওয়া এবং পরকালের প্রতি দৃঢ় প্রত্যয় পোষণ করা– এই প্রধান গুণসম্পন্ন লোকদেরকে মুহ্‌সিন বলে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং তারাই যে আল্লাহ্ প্রদত্ত হেদায়াত অনুযায়ী সঠিক পথে চলছে এবং চূড়ান্ত সাফল্য ও কল্যাণ যে কেবল তারাই লাভ করবে, তা বলিষ্ঠ ভাষায় বলা হয়েছে।

বস্তুত বর্ণনার এ ভঙ্গি ও শব্দের এ বিন্যাস প্রমাণ করে যে, এ তিনটি গুণ অবিচ্ছিন্ন। 'নামায' কায়েম করলে অবশ্যই 'যাকাত' দিতে হবে। 'যাকাত' না দিলে 'নামায' কায়েমের কোনো মূল্য হবে না। এবং 'নামায' কায়েম করা ও 'যাকাত' দেওয়া নির্ভর করে পরকালের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস পোষণের ওপর। আর এ দুটি বা এর যে-কোনো একটি কাজ যে লোক করবে না, তার সম্পর্কে কোনো সন্দেহ নেই যে, পরকাল যে অবশ্যই হবে– এ দৃঢ় প্রত্যয় তার নেই। কেননা তা থাকলে সে 'নামায' কায়েম না করে ও 'যাকাত' না দিয়ে কিছুতেই পারতো না। উপরন্তু নামায কায়েম করা, যাকাত দেওয়া ও পরকাল হবে এ দৃঢ় প্রত্যয় পোষণ করা আল্লাহ্‌র দেওয়া হেদায়াতের মর্মকথা। এ তিনটি গুণভিত্তিক জীবন যাপনকারী লোকেরাই প্রকৃত সাফল্যের অধিকারী হবে। এর কোনো একটিকেও অস্বীকার করা হলে পরকালীন জীবনে চরম ব্যর্থতাই ভাগ্যলিপি হবে, তাতে কোনোই সন্দেহ নেই।

অতঃপর হাবশা বা আবিসিনিয়ায় হিজরতের পূর্বে নাযিল হয়েছে সূরা মরিয়ম। এ সূরার 'যাকাত' সম্বলিত আয়াতটি হচ্ছে ঃ

قَالَ اِنِّىْ عَبْدُ اللّٰهِ قف اٰتٰنِىَ الْكِتٰبَ وَجَعَلَنِىْ نَبِيًّا ۝ وَّجَعَلَنِىْ مُبٰرَكًا اَيْنَ مَا كُنْتُ ص وَاَوْصٰنِىْ بِالصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ مَا دُمْتُ حَيًّا

(শিশু ঈসা) বলেন, আমি আল্লাহ্‌র বান্দাহ, তিনি আমাকে কিতাব দিয়েছেন এবং আমাকে বরকতওয়ালা বানিয়েছেন যেখানেই আমি থাকি না কেন; এবং আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন নামায ও যাকাত পালন করার জন্যে যতদিনই আমি জীবিত থাকব। (সূরা মরিয়ম ঃ ৩০-৩১)

---

১. 'মুহসিনীন' বহু বচনের শব্দ। এক বচনে 'মুহসিন'– যা ইহ্‌সান থেকে তৈরি, ইহ্‌সানকারী অর্থে। আর 'ইহ্‌সান' শব্দের দুটি অর্থ ঃ মূল কর্তব্যের অধিক কাজ করা এবং কর্মে সব প্রকার সৌন্দর্য সৃষ্টি করা। কাজে 'ইহসান' হয় দুভাবে ঃ কাউকে তার মূল পাওনার বেশি দেওয়া ও নিজের প্রাপ্যের তুলনায় কম গ্রহণ করা। নিজের কাজে ইহ্‌সান বা সৌন্দর্য সৃষ্টি করার অর্থ, ফরয করার পর মুস্তাহাব কাজও করা। (لغات القران نعمانى ج ٥ ص ٣٢٩)

www.amarboi.org

বস্তুত এ ছিল মহান আল্লাহ্র এক বিস্ময়কর সৃষ্টির মুখে উচ্চারিত বিস্ময়োদ্দীপক উক্তি। এ থেকে অকাট্যভাবে জানা গেল যে, হযরত ঈসা (আ)-এর শরীয়তেও 'নামায' ও 'যাকাত'-এর বিধান ছিল এবং এ দুটি মুহাম্মাদী শরীয়তের সম্পূর্ণ অভিনব কোনো উপস্থাপনা ছিল না। উপরন্তু এখানেও 'নামায' ও 'যাকাত' এক সাথে উল্লিখিত। ভিন্ন ও বিচ্ছিন্নভাবে এ দুটির বাস্তবতা অচিন্ত্যনীয়।

এর পর নাযিল হয়েছে সূরা আর-রূম হাবশায় হিজরত করার বছর অর্থাৎ নবুয়ত লাভের পঞ্চম বছর। আর যে আয়াতটিতে 'যাকাত' শব্দের উল্লেখ রয়েছে, তা হচ্ছে ঃ

وَمَآ اٰتَيْتُمْ مِّنْ رِّبًا لِّيَرْبُوَاْ فِىْٓ اَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوْا عِنْدَ اللّٰهِ ج وَمَآ اٰتَيْتُمْ مِّنْ زَكٰوةٍ تُرِيْدُوْنَ وَجْهَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُوْنَ ۞

তোমরা যে সুদ দাও লোকদের সম্পদ বৃদ্ধি পাবে এ উদ্দেশ্যে, তা কিন্তু আল্লাহ্র নিকট প্রবৃদ্ধি পায় না। তবে তোমরা যে যাকাত প্রদান করো আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের লক্ষ্যে, এ যাকাত দানকারীরাই তাদের সম্পদ বৃদ্ধিকারী।
(সূরা আর রূম ঃ ৩৯)

এ আয়াত থেকে স্পষ্ট বুঝা যায়, সে সময় আরবে ব্যাপক সুদী কারবার প্রচলিত ছিল। লোকেরা সাধারণ ভাবেই মনে করতো যে, সুদী কারবারে ধন-সম্পদ বৃদ্ধি পায়। আর ইসলামে যে যাকাতের কথা বলা হচ্ছে, তাতে ধন-সম্পদের পরিমাণ হ্রস পায়। কিন্তু নিতান্ত অর্থনৈতিক বিচার এবং মানবতার প্রকৃত কল্যাণের দৃষ্টি– এ উভয় দিক দিয়েই এ ধারণা ছিল সম্পূর্ণ ভুল। প্রচলিত সুদী কারবারের প্রতিবাদে এ ছিল কুরআনের সর্বপ্রথম ধ্বনিত আওয়াজ। দ্বিতীয়ত, সুদ ব্যবস্থার মুকাবিলায় এ আয়াতে যাকাত ব্যবস্থা উপস্থাপিত করা হয়েছিল। বস্তুত সুদভিত্তিক অর্থব্যবস্থার সম্পূর্ণ বিপরীত দিকে রয়েছে যাকাতভিত্তিক অর্থনীতি– এ তুলনামূলক পার্থক্যের কথা তদানীন্তন আরব সমাজে এই প্রথমবার প্রকাশ করা হলো। তার অর্থ, ইসলামী দাওয়াতের সে প্রাথমিক পর্যায়েই একথা জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল যে, ইসলাম আল্লাহ্র আনুষ্ঠানিক ইবাদতের একটা ধর্মই শুধু নয়– তা একটি পূর্ণাঙ্গ রাষ্ট্র-ব্যবস্থার সাথে সাথে একটি পূর্ণাঙ্গ অর্থ ব্যবস্থাও। ইসলামের লক্ষ্য মানুষকে কেবল মাত্র এক আল্লাহ্র ইবাদতকারী বানানোই নয়, সেই সাথে সাধারণ মানুষের ওপর যে মানবীয় সার্বভৌমত্বের জগদ্দল পাথর চেপে আছে– আছে সুদী কারবারের অমানুষিক শোষণ-বঞ্চনা ও নির্যাতন, ইসলাম সর্বসাধারণ মানুষকে

www.amarboi.org

তা থেকেও মুক্তি ও নিষ্কৃতি দেবে। সেই সাথে এই ধারণাও দেওয়া হয়েছিল যে, সুদভিত্তিক অর্থনীতির মৌল ভাবধারা হচ্ছে অর্থবৃদ্ধির লোভে এবং তার সম্পূর্ণ বিপরীত হচ্ছে যাকাতভিত্তিক অর্থব্যবস্থা। তা একান্তভাবে আল্লাহ্ সন্তুষ্টি লাভের ওপর ভিত্তিশীল। এ দুই ধরনের অর্থনীতির গতি প্রকৃতিও সম্পূর্ণ ভিন্ন ভিন্ন। একটির সাথে অপরটির একবিন্দু সাদৃশ্য বা সামঞ্জস্য নেই।

অতঃপর মক্কী জীবনের মধ্যবর্তী সময়ে তিনটি আয়াত নাযিল হয়। একটি সূরা আল-আম্বিয়ার, একটি সূরা আল-মুমিনূন-এর ও একটি সূরা আন্-নামল-এর আয়াত। ঐতিহাসিক বিবেচনায় এ সূরা তিনটি মক্কী জীবনের মাঝামাঝি সময়েই নাযিল হয়েছিল।

সূরা আল-আম্বিয়ার আয়াতটি হচ্ছে ঃ

وَجَعَلْنٰهُمْ اَئِمَّةً يَّهْدُوْنَ بِاَمْرِنَا وَاَوْحَيْنَآ اِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرٰتِ وَاِقَامَ الصَّلٰوةِ وَاِيْتَاۤءَ الزَّكٰوةِ ج وَكَانُوْا لَنَا عٰبِدِيْنَ ۝

এবং আমরা তাদের বানিয়েছি ইমাম– অনুসরণীয় নেতা। তারা আমার নির্দেশ বা বিধান অনুযায়ী লোকদের হেদায়াত দান করছিল এবং আমরা ওহীর সাহায্যে নেক কার্যাবলী করার এবং নামায কায়েম করার ও যাকাত দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলাম এবং তারা আমাদেরই 'ইবাদতকারী লোক ছিল।'

(আয়াত ঃ ৭৩)

আল্লাহ্ তা'আলার এ কথাটি হযরত ইস্হাক ও হযরত ইয়াকুব (আ) সম্পর্কে বলা। এর পূর্বের আয়াতটিতেই তাদের উল্লেখ রয়েছে। আয়াতটির বক্তব্য হচ্ছেঃ ভালো ভালো ও কল্যাণময় কাজ করা, 'নামায' কায়েম করা ও 'যাকাত' দেওয়া সব নবী-রাসূলগণের প্রতি নাযিল হওয়া বিধানের অন্তর্ভুক্ত। সব নবী ও রাসূলই অভিন্নভাবে 'নামায' ও 'যাকাত'-এর বিধান পালন করেছেন নিজেরা এবং লোকদেরও তারই হেদায়াত দিয়েছেন।

সূরা আল-মুমিনুন-এর আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ ۝ الَّذِيْنَ هُمْ فِىْ صَلَاتِهِمْ خٰشِعُوْنَ ۝ وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُوْنَ ۝ وَالَّذِيْنَ هُمْ لِلزَّكٰوةِ فٰعِلُوْنَ ۝ وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حٰفِظُوْنَ ۝

নিশ্চয়ই কল্যাণ লাভ করেছে সেই মুমিন লোকেরা যারা নিজেদের নামায-এ

www.amarboi.org

ভীত-সন্ত্রস্ত, বিনয়াবনত, যারা বেহুদা কাজ থেকে বিমুখ, যারা যাকাতের পন্থায় কর্মতৎপর এবং যারা নিজেদের লজ্জাস্থানের সংরক্ষণকারী।

(আয়াত ঃ ১-৫)

এ আয়াত কয়টিতে সাধারণ মুমিনদের জরুরী গুণাবলীর উল্লেখ করা হয়েছে। তাতে প্রথমে নামায কায়েম করা, দ্বিতীয় স্থানে বেহুদা কাজ থেকে বিরত থাকা এবং তৃতীয় পর্যায়ে 'যাকাত' পন্থায় কর্মতৎপর থাকার উল্লেখ করা হয়েছে। আর পঞ্চম আয়াতে বলা হয়েছে লজ্জাস্থানের সংরক্ষণ বা নৈতিক চরিত্র রক্ষার কথা। বস্তুত এ চারটিই একই মুমিন ব্যক্তির বা মুমিন সমাজের লোকদের অপরিহার্য গুণ-পরিচিতির বিভিন্ন দিক। মূল অভিন্ন সত্তায় এই পাঁচটি গুণের একত্র সমাবেশই কাম্য ইসলামী সমাজনীতির দৃষ্টিতে।

সূরা আন-নামল-এর আয়াত ঃ

طٰسٓ تٰلْكَ اٰيٰتُ الْقُرْاٰنِ وَكِتَابٍ مُّبِيْنٍ ۞ هُدًى وَّ بُشْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ ۞ الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ ۞

এ আয়াতসমূহ কুরআনের ও স্পষ্ট বর্ণনাকারী কিতাবের। তা হেদায়াতের বিধান ও সেই মুমিনদের জন্যে সুসংবাদদাতা যারা নামায কায়েম করে ও যাকাত দেয় এবং তারাই পরকালের প্রতি দৃঢ় প্রত্যয় পোষণকারী।

(আয়াত ঃ ১-৩)

অর্থাৎ কুরআন মজীদ একখানি সুস্পষ্টভাষী ও প্রকাশ্য বর্ণনাকারী গ্রন্থ। তা একাধারে হেদায়াত দানকারী ও সুসংবাদ বহনকারী সেই ঈমানদার লোকদের জন্যে যারা 'নামায' কায়েম করে ও 'যাকাত' দেয়। পরকালের প্রতি দৃঢ় প্রত্যয় এ লোকদেরই আছে বলে মনে করা যায়। পরকালের প্রতি দৃঢ় প্রত্যয় মুমিন জীবনের আসল অনুপ্রেরণাদাতা ও চালিকা শক্তি। তা যাদের আছে তাদের অবশ্যম্ভাবী রূপে 'নামায' কায়েম করার ও 'যাকাত' দেওয়ার গুণ দুটিও আছে– অবশ্যই থাকবে। ঈমানদার হওয়ার, এক আল্লাহ্কে নিজেদের একমাত্র ইলাহ্ ও রব্ব মেনে নেওয়ার, কুরআনকে আল্লাহ্র কিতাব রূপে গ্রহণ করার এবং মুহাম্মাদকে আল্লাহ্র সত্য নবী ও রাসূল রূপে গ্রহণ করার– আনুগত্য স্বীকার করার অনিবার্য ফল হচ্ছে কার্যত ও নিয়মিত 'নামায' কায়েম করা ও 'যাকাত' দেওয়া। এ দুটি শর্ত পূরণকারীরাই আলোচ্য আয়াত অনুযায়ী পরকালের প্রতি দৃঢ় প্রত্যয় পোষণকারী। অর্থাৎ পরকালের প্রতি তাদের দৃঢ় প্রত্যয় আছে বলেই তারা নিয়মিত 'নামায' কায়েম করে ও 'যাকাত' দেয়।

www.amarboi.org

আর মক্কী জীবনের শেষ পর্যায়ে নাযিল হয়েছে সূরা আল-আরাফ। তাতে রয়েছে এ আয়াতটি ঃ

وَاكْتُبْ لَنَا فِيْ هٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِي الْاٰخِرَةِ اِنَّا هُدْنَآ اِلَيْكَ قَالَ عَذَابِيْٓ اُصِيْبُ بِهٖ مَنْ اَشَاۤءُ وَرَحْمَتِيْ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَاَكْتُبُهَا لِلَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَالَّذِيْنَ هُمْ بِاٰيٰتِنَا يُؤْمِنُوْنَ ۞

অতএব (হে প্রভু) আমাদের জন্যে এ দুনিয়ার কল্যাণ লিখে দিন, আর পরকালেরও। আমরা আপনার দিকেই প্রত্যাবর্তন করছি। জবাবে বললেন ঃ শাস্তি তো আমি যাকেই ইচ্ছা দেই; কিন্তু আমার রহমত সব জিনিসেই পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে। আর তা আমি সেই লোকদের জন্যে নিশ্চিত করে লিখে দেবো যারা নাফরমানী থেকে বেঁচে থাকে, ভয় করে ও যাকাত দেয় আর আমার আয়াত ও নিদর্শনাবলীর প্রতি ঈমান রাখে। (আয়াত ঃ ১৫৬)

এ আয়াতটিতে ব্যতিক্রমভাবে 'যাকাত'-এর পূর্বে 'নামায'-এর উল্লেখ নেই। তার পরিবর্তে রয়েছে তাক্ওয়া অবলম্বনের কথা। আর তাক্ওয়া অবলম্বনের অনিবার্য পরিণতি হচ্ছে 'নামায' কায়েম। তাই বলা যায়, প্রকাশ্যভাবে 'নামায'-এর উল্লেখ না থাকলেও তার মৌল উৎসের উল্লেখ রয়েছে। ফলে এটা কোনো ব্যতিক্রমই নয়। এ আয়াতে ইহকালীন কল্যাণ ও পরকালীন কল্যাণকে অভিন্ন করে দেওয়া হয়েছে এবং 'তাক্ওয়া' ও 'যাকাত'কে করা হয়েছে অবিচ্ছিন্ন। বস্তুত 'তাক্ওয়া' মানে 'আল্লাহ্র ভয়' মনে প্রবল না থাকলে নিজের সম্পদ থেকে 'যাকাত' বের করা কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। তাই যাকাত এর কার্যকারিতা তাক্ওয়ার ওপর নির্ভরশীল, একথা অনস্বীকার্য।

পর্যালোচনা

১. মক্কায় অবতীর্ণ সূরাসমূহে 'যাকাত' زكـــوٰة শব্দ সম্বলিত আয়াতসমূহের উল্লেখ এখানেই শেষ হয়ে গেল। এ আয়াতসমূহের ওপর দৃষ্টি দিয়ে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, এ পর্যায়ের কোনো একাটি আয়াতেও وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ 'এবং যাকাত দাও' বলে কোনো আদেশের উল্লেখ নেই। আয়াতসমূহে প্রকৃত মুমিনের অপরাপর জরুরী গুণাবলীর মধ্যে যাকাত দান একটি জরুরী গুণ হিসেবেই উল্লেখিত হয়েছে। সূরা আল-আম্বিয়ার আয়াতে হযরত ইসহাক ও হযরত ইয়াকুব (আ) প্রমুখ নবীগণকে নামায কায়েম ও যাকাত দানের নির্দেশ ওহীর মাধ্যমে দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। আর সূরা মরিয়মে হযরত ঈসা (আ)-এর স্বীকারোক্তি হিসেবে উল্লেখিত হয়েছে 'নামায' ও 'যাকাত' এর কথা। ফলে স্পষ্ট মনে হচ্ছে, মক্কী পর্যায়ে যাকাত

www.amarboi.org

ফরয করা হয়নি। তবে মক্কী আয়াতসমূহে বিভিন্নভাবে যাকাত-এর উল্লেখ করে ঈমানদার লোকদের জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, ইসলামের তওহীদী দাওয়াতের মূল লক্ষ্য মানুষের মন-মগজ ও চিন্তা-বিশ্বাসকে সকল প্রকার কুসংস্কার ও অন্ধ-বিশ্বাসের স্তূপীকৃত আবর্জনা থেকে মুক্ত ও পবিত্র করা, শিরক থেকে মুক্ত করে তওহীদে বায়'আত করা এবং সে সাথে সমাজের দরিদ্র জনগণের প্রতি দায়িত্ব সচেতন হয়ে তাদের অভাব মোচনের জন্যে নিজের উপার্জিত সম্পদ ব্যয় করতে প্রস্তুত থাকার জন্যে তাদেরকে স্বতঃস্ফূর্ত করে তোলা।[১]

২. প্রায় প্রতিটি আয়াতে 'যাকাত'-এর পূর্বে 'নামায' এর উল্লেখ হয়েছে– যাকাত এর উল্লেখ হয়েছে নামাযের পরে পরে এবং সঙ্গে সঙ্গেই। এ থেকে বোঝা যায়, 'নামায' ও 'যাকাত' দুটি ভিন্ন ভিন্ন হলেও মূলত একই পর্যায়ের ও সমান গুরুত্বপূর্ণ কাজ এবং এ দুটি অবিচ্ছিন্ন। একটিকে বাদ দিয়ে অন্যটি হতে পারে না এবং একটি করলে অবশ্যই অন্যটিও করতে হবে। অন্যথায় যেটি করা হবে, সেটিরও কোনো সুফল ফলবে না অন্যটি না করার দরুন। তবে নামাযের স্থান প্রত্যেকটি আয়াতেই যাকাতের পূর্বে এবং যাকাতের স্থান নামায-এর পরে। বাস্তবায়নের সময় প্রথমেই নামায কায়েমের ব্যবস্থা করতে হবে এবং তার পরই করতে হবে 'যাকাত' সংক্রান্ত ব্যবস্থা গ্রহণ।[২]

৩. মক্কায় অবতীর্ণ আয়াতসমূহে প্রধানত ঈমান ও ইয়াকীন সৃষ্টি করতে চাওয়া হয়েছে তওহীদের ভিত্তিতে।

---

১. ফিকাহবিদদের কেউ কেউ বলেছেন ঃ হিজরতের পূর্বে মক্কায় যাকাত ফরয হলেও তার পরিমাণ নির্দিষ্ট হয়নি, যাকাত গ্রহণের ক্ষেত্র ও ব্যয়ের খাতও বলা হয়নি। তাতে ছিল প্রশস্ততা। ধনী লোকদের কর্তব্য হিসেবে দরিদ্র অভাবগ্রস্থদের জন্যে উদার হস্তে ব্যয় করা কর্তব্য ছিল। কেননা তখন মুসলমানদের সংখ্যা ছিল খুবই কম। অন্যান্য ফিকাহবিদগণ বলেছেন, মক্কী যুগে যাকাত ছিল ইচ্ছামূলক এখতিয়ারভূক্ত নিছক অনুগ্রহের ব্যাপার। কিন্তু সেজন্য সুনির্দিষ্ট নিয়ম-কানুন কিছুই ছিলনা, সেজন্য বিশেষ কোনো আইন-বিধানও তখন জারী হয়নি। তখন রাসূলের অনুসারীদের সংখ্যা অত্যন্ত কম হওয়ায় তার কোনো প্রয়োজনও তখন দেখা দেয়নি। (العامة الرسلاميةمر السامية ৬৫২-৫৫২)

২. ইবনে যায়দ থেকে বর্ণিত ঃ

فَرَضَ اللّٰهُ الصَّلٰواةَ وَالزَّكٰوةَ وَاَبٰى اَنْ يُّفَرِّقَ بَيْنَهُمَا وَاَبٰى اَنْ يَقْبِلَ الصَّلٰوةَ اِلَّا بِزَّكٰوةِ -

আল্লাহ তা'আলা ফরয করেছেন নামায ও যাকাতকে (এক সাথে) এ দু'টিকে বিচ্ছিন্ন করতে তিনি অস্বীকার করেছেন, অস্বীকার করেছেন যাকাত ব্যতীত নামাযকে কবুল করতে।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা) বলেছেন ঃ

اُمِرْتُمْ بِالصَّلَواةِ وَالزَّكَواةِ فَمَنْ لَمْ يَزِكَ فَلَا صَلَواةَ لَهٗ

তোমরা 'নামায' ও 'যাকাত' উভয়ের জন্যেই আদিষ্ট হয়েছ। কাজেই যে যাকাত দেবে না, তার নামাযও গৃহীত হবে না।

www.amarboi.org

হুকুম-আহকাম, আদেশ-নিষেধ, ফরয ও হালাল-হারামের বিধান মক্কী জীবনে খুব সামান্যই অবতীর্ণ হয়েছে। বিশেষজ্ঞদের মত হচ্ছে, মক্কায় কেবলমাত্র 'নামায'ই ফরয করা হয়েছিল, 'যাকাত' নয়। তা সত্ত্বেও নামায যাকাতের উল্লেখ সমান ভাবেই এবং এক সাথেই হয়েছে।[১] তাই তখন মুসলমানগণ যেমন নামায কায়েম করতে শুরু করেছিলেন, তেমিন নিজেদের উপার্জিত ধন-সম্পদ থেকে দরিদ্র, বিপদ-গ্রস্থ ও দাসত্ব বন্ধনে বন্দী মুসলমানদের জন্যে বিপুলভাবে দান করতেও শুরু করেছিলেন। তার অর্থ, যাকাত যদিও পরবর্তী কালের মতো একটি পূর্ণাঙ্গ ও বিস্তারিত নিয়ম-বিধি-সম্বলিত হয়ে চালু হয়নি, তা সত্ত্বেও মুসলমানগণ একটি কর্তব্য হিসেবেই এ কাজে অভ্যস্থ হচ্ছিলেন।

স্পষ্ট মনে হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলা কুরআনের আয়াতের আলোকে ও রাসূলে করীম (স)-এর নেতৃত্বে যে উন্নত আদর্শ সমাজ গড়ে তোলার সংগ্রাম শুরু করিয়ে দিয়েছিলেন, তার ভিত্তিই ছিল এক দিকে আল্লাহ্র হক আদায় ও সেই সাথেই দরিদ্র জনগণের হক্ আদায়ের ব্যবস্থার ওপর রক্ষিত। এর ফলে যে সমাজ প্রতিষ্ঠিত হবে, তাতে যেমন আল্লাহ্র হক্ পূর্ণ মাত্রায় প্রতিষ্ঠিত হবে, সার্বভৌমত্ব ও নিরংকুশ মালিকত্ব হবে একমাত্র আল্লাহ্র; তেমনি সেখানে কোনো মানুষই উপেক্ষিত ও তাদের হক্ থেকে বঞ্চিত থাকবে না। এ দুই দিকের প্রধান দুটি স্তম্ভ হচ্ছে এই 'নামায' ও 'যাকাত'।

অপর একটি হাদীসে বলা হয়েছে, নবী করীম (স) বলেছেন ঃ

مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ ثَلَاث فَرَّقَ اللّٰهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَحْمَتِه يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ قَالَ اَطِيْعُ اللّٰهَ وَلَا اَطِيْعُ الرَّسُوْلَ وَاللّٰهُ تَعَالٰى يَقُوْلُ اَطِيْعُوْا اللّٰه وَاَطِيْعُوْا الرَّسُوْلَ وَمَنْ قَالَ اَقِيْمُ الصَّلٰوةَ وَلَااُوْتِى الزَّكٰوةَ وَاللّٰهُ يَقُوْلُ وَاَقِيْمُوْا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوْا ا لزَّكٰوةَ -

যে লোক তিনটি জিনিসের মধ্যে পার্থক্য করবে, আল্লাহ কেয়ামতের দিন তার ও তাঁর রহমতের মধ্যে পার্থক্য করবেন। যে বলবে ঃ আমি আল্লাহ্কে মানি, রাসূলকে মানি না অথচ আল্লাহ তো আল্লাহ্কে মানতে ও তাঁর রাসূলকে মানতে বলেছেন। যে লোক বলবে ঃ আমি নামায কায়েম করি; কিন্তু যাকাত দেই না, অথচ আল্লাহ বলেছেন ঃ নামায কায়েম করো ও যাকাত দাও।' (الجامع لاحكام القران للقر طبى ج ٨ص٨١)

১. মক্কী সূরা আর-রূম-এর ৩১ নম্বর আয়াতটি হচ্ছে ঃ مُنِيْبِيْنَ اِلَيْه وَاتَّقُوْهُ وَاَقِمُو الصَّلٰوة (তোমরা দাঁড়াও আল্লাহ্ দিকে একান্ত নিবেদিত হয়ে এবং ভয় তাঁকেই করো আর নামায কায়েম করো।) এপর্যায়ে নামায কায়েম করার নির্দেশ স্পষ্ট ভাষায় দেওয়া হয়েছে, কিন্তু যাকাত দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়নি। নামায কায়েমের এই হুকুম দেওয়া হয়েছিল মক্কার সেই অবস্থা ও পরিবেশে যখন মুসলমানদের এক মুষ্ঠি জামা'আত কাফের কুরাইশদের অত্যাচার-জুলুমের নিষ্পেষণে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাচ্ছিল। (তাফহীমুল কুরআন)

www.amarboi.org

৪. সূরা আর-রূম-এর আয়াতটি থেকে স্পষ্ট বুঝা যায়, তদানীন্তন আরব সমাজের প্রচলিত সুদী ব্যবস্থাকে উৎখাত করার আগম নোটিশ প্রদান করা হয়েছে এবং তার পরিবর্তে যাকাতভিত্তিক অর্থব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার পক্ষে জনমত সৃষ্টির কাজ শুরু করে দেওয়া হয়েছে। সুস্পষ্ট ভাষায় বলে দেওয়া হয়েছে যে, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে প্রবৃদ্ধি (Growth) অবশ্যই কাম্য। কিন্তু সে প্রবৃদ্ধি সুদের দ্বারা অর্জিত হতে পারে না; তা অর্জিত হতে পারে যাকাতের দ্বারা। কেননা 'যাকাত' শব্দের অর্থই হচ্ছে প্রবৃদ্ধি (growth)। কিভাবে তা হয়, তা অবশ্যই অনুধাবনীয়।

৫. তা থেকে এ-ও জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, সুদভিত্তিক অর্থনীতি ও যাকাত ভিত্তিক অর্থনীতি সম্পূর্ণ পরস্পর বিরোধী ভাবধারা ও ব্যবস্থাসম্পন্ন বলে তা এক সাথে, এক দেশে, একই সময়ে চলতে পারে না। এক সময়ে বা একটি দেশে দুটির একটিই চলতে পারে। যারা দুটিকেই এক সাথে চালাতে চায়, তারা চরম নির্বুদ্ধিতারই পরিচয় দিচ্ছে।

এ পর্যায়ে সূরা 'আল-বাইয়্যেনা' সম্পর্কে স্বতন্ত্রভাবে কথা বলা আবশ্যক। কেননা এ সূরাটি মক্কী কি মাদানী, সে বিষয়ে মুফাস্‌সীরগণ বিভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। কতিপয় তাফসীরকার বলেছেন ঃ সাধারণ বা বেশির ভাগ বিশেষজ্ঞদের মত হচ্ছে, সূরাটি মক্কী। অপর কিছু সংখ্যক মুফাস্‌সীর বলেছেন– বিশেষজ্ঞদের মতে সূরাটি মাদানী। আমরা এ সূরার যাকাত শব্দ সম্বলিত আয়াতটি সামনে রেখে বলতে চাই, সূরাটি সম্ভবত মক্কী জীবনের শেষ মুহূর্তে নাযিল হয়ে থাকবে। কেননা যাকাত সম্পর্কে মক্কী সূরাসমূহে যে ধরনের কথা বলা হয়েছে, এ সূরাটিতে সে কথা একটু ভিন্ন ভঙ্গিতে বলা হয়েছে। আয়াতটি এই ঃ

وَمَآ اُمِرُوْٓا اِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ۙ حُنَفَآءَ وَيُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوا الزَّكٰوةَ وَذٰلِكَ دِيْنُ الْقَيِّمَةِ ۞

লোকদেরকে এ ছাড়া আর কোনো কিছুরই নির্দেশ দেওয়া হয়নি– শুধু এ নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, তারা এক আল্লাহ্‌র দাসত্ব গ্রহণ করবে। একনিষ্ঠভাবে তাঁরই জন্যে আনুগত্য নিবদ্ধ করে সবদিক থেকে মুখ ফিরিয়ে সম্পূর্ণ একমুখী হয়ে তারা নামায কায়েম করবে ও যাকাত দেবে। আর এ হচ্ছে সত্য সঠিক সুদৃঢ় কিতাবসমূহের উপস্থাপিত দ্বীন। (আয়াত ঃ ৫)

ক. গোটা সূরাটির প্রতি দৃষ্টি দিলে দেখা যায়, এ সূরার শুরুতে রাসূলে করীম (স)-এর আহলে কিতাব ও মুশরিক অর্থাৎ সর্বসাধারণ মানুষের জন্যে নবী ও রাসূল হওয়ার ঘোষণা রয়েছে।

www.amarboi.org

খ. এ সূরায় আহ্‌লে কিতাব সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে কথা বলা হয়েছে, অথচ মক্কী জীবনে আহলে কিতাবের কোনো ব্যাপার রাসূলে করীমের সম্মুখবর্তী হয়নি। তা হয়েছিল হিজরতের পর পরই।

গ. এ সূরাতেই সর্ব প্রথম সামষ্টিকভাবে সকল দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে কেবল এক আল্লাহ্ মুখী হওয়ার (حُنَفَاءَ) এবং 'নামায' কায়েম করার ও 'যাকাত' দেওয়ার নির্দেশের উল্লেখ হয়েছে। তবু এতে নামায কায়েম করো ও যাকাত দাও'। اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ –এ ধরনের কথা বলা হয়নি।

তাই সহজেই মনে করা যেতে পারে যে, এ আয়াত হয় মক্কী জীবনের সর্বশেষ মুহূর্তে, না হয় মাদানী জীবনের একেবারে সূচনাকালেই নাযিল হয়ে থাকবে। আর সম্ভবত এ কারণে সূরাটির মক্কী বা মাদানী হওয়া নিয়ে উক্তরূপ মতভেদের সৃষ্টি হয়েছে। এ আয়াতটিতে সামাজিকভাবে নামায কায়েম ও যাকাত আদায় করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে বলা হয়েছে। তাই বলা যায়, এ-ই হচ্ছে যাকাত ফরয হওয়ার প্রাথমিক ঘোষণা।

মাদানী সূরাসমূহ

সূরা 'আল-হজ্জ' হিজরতের পর প্রথম বছরই নাযিল হয়েছে। এ সূরার দুটি আয়াতে যাকাতের উল্লেখ রয়েছে। ৪০ ও ৪১ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

وَلَيَنْصُرَنَّ اللّٰهُ مَنْ يَّنْصُرُهٗ ط اِنَّ اللّٰهَ لَقَوِىٌّ عَزِيْزٌ ۝ اَلَّذِيْنَ اِنْ مَّكَّنّٰهُمْ فِى الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ وَاَمَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ط وَلِلّٰهِ عَاقِبَةُ الْاُمُوْرِ ۝

এবং আল্লাহ্ অবশ্য অবশ্যই সাহায্য করবেন তাদেরকে যারা তাঁকে সাহায্য করবে, যদিও আল্লাহ্ নিঃসন্দেহে অত্যন্ত শক্তিসম্পন্ন, সর্বজয়ী। সে সাহায্যকারী তারা, যাদের আমরা যদি দুনিয়ায় ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করি, তাহলে তারা নামায কায়েম করবে, যাকাত আদায়-বন্টন করবে এবং ভালো কাজের আদেশ দেবে ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখবে। অবশ্য সব ব্যাপারের চূড়ান্ত পরিণতি আল্লাহ্‌রই জন্যে।

আর ৭৮ নম্বর আয়াতটি হচ্ছে ঃ

وَجَاهِدُوْا فِى اللّٰهِ حَقَّ جِهَادِهٖ ط هُوَ اجْتَبٰكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ ط مِلَّةَ اَبِيْكُمْ اِبْرٰهِيْمَ ط هُوَ سَمّٰكُمُ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ قَبْلُ وَفِىْ هٰذَا

www.amarboi.org

لِيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ شَهِيْدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُوْنُوْا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ ج فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاعْتَصِمُوْا بِاللّٰهِ ط

এবং তোমরা জিহাদ করো আল্লাহ্‌র পথে (আল্লাহ্‌র ব্যাপারাদি নিয়ে) তাঁর জন্যে জিহাদ যেভাবে হওয়া বাঞ্ছনীয় সেভাবে। তিনিই তোমাদের বাছাই করেছেন এবং দ্বীন পালনে তোমাদের ওপর কোনো সংকীর্ণতা প্রতিবন্ধকতা চাপিয়ে দেননি। এটাই তোমাদের পিতা ইবরাহীমের নিয়ে আসা আল্লাহ্‌র আদর্শ ব্যবস্থা (مـلـة)। সে-ই তোমাদের 'মুসলিম' নামকরণ করেছে পূর্বেও এবং এই গ্রন্থেও, যেন রাসূল [মুহাম্মদ (স)] তোমাদের পথ প্রদর্শক– সাক্ষী হতে পারেন আর তোমরা হতে পার জনগণের পথ-প্রদর্শক– নেতা। অতএব তোমরা নামায কায়েম করো এবং যাকাত দাও আর আল্লাহ্‌কে শক্ত করে আকড়ে ধরো।

সূরা আল-হজ্জ-এর এ দুটি আয়াতে পূর্ণাঙ্গ ইসলামী সমাজের জনগণের ও রাষ্ট্রনায়কদের পরিচিতি ও দায়িত্ব-কর্তব্যের কথা অত্যন্ত বলিষ্ঠ ভাষায় বলা হয়েছে। স্পষ্ট মনে হয়, রাসূলে করীম (স) হিজরতের পরই মদীনা তাইয়্যেবায় যে ইসলামী আদর্শভিত্তিক সমাজ ও রাষ্ট্র গড়েছিলেন, তার-ই ভাষা-চিত্র এতে অংকিত হয়েছে। আয়াত দুটি বলিষ্ঠ কণ্ঠে ঘোষণা করছে যে, রাসূলে করীম (স)-এর তওহীদী দাওয়াতের ভিত্তিতে যে মানবগোষ্ঠীকে সংঘবদ্ধ করে তোলা হচ্ছে, তার প্রধান দায়িত্ব হচ্ছে, আল্লাহ্‌র দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্যে জিহাদ করা। এ জিহাদই মূলত ও কার্যত আল্লাহ্‌র সাহায্য করা। আল্লাহ্‌র সাহায্য-কর্ম এই জিহাদের মাধ্যমেই বাস্তবায়িত হতে পারে। আর এ সাহায্য কাজের ফলেই আল্লাহ্‌র সাহায্য লাভ সম্ভব হবে এবং তা হলেই এমন লোক ক্ষমতাসীন হবে যারা 'নামায' কায়েম করবে ও 'যাকাত' ব্যবস্থা কার্যকর করবে। এ জনগোষ্ঠীই মুসলিম নামে অভিহিত। মাদানী জিন্দেগীর সূচনাতেই এ রূপ আয়াত নাযিল হওয়া ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র-গঠনের দিক দিয়ে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ।

এরপর নাযিল হয়েছে সূরা আল-বাকারা– হিজরতের পর মাদানী জীবনের প্রথম দুই বছরের মধ্যে। এ সূরার ৫টি আয়াতে 'যাকাত' শব্দটির উল্লেখ হয়েছে। পাঁচটি আয়াতের ব্যাখ্যা এখানে পর পর পেশ করা হচ্ছে । ৪৩ আয়াতঃ

وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَارْكَعُوْا مَعَ الرّٰكِعِيْنَ –

www.amarboi.org

এবং নামায কায়েম করো যাকাত দাও ও রুকুকারীদের সঙ্গে মিলিত হয়ে এক সাথে রুকু করো।'

এ আয়াতটির পূর্ববর্তী আয়াতের সম্বোধন বনী-ইসরাঈলের প্রতি। তাই 'নামায' কায়েম করার ও 'যাকাত' দানের উক্ত নির্দেশ তাদেরই জন্যে বলা যেতে পারে।

৮৩ নম্বর আয়াতটির উল্লেখ হয়েছে বনী-ইসরাঈলের নিকট থেকে আল্লাহ্র প্রতিশ্রুতি (ميثاق) গ্রহণের বিবরণ উল্লেখ প্রসঙ্গে। কাজেই এ আয়াতে উদ্ধৃত নামায ও যাকাতের নির্দেশও তাদের প্রতি মনে করতে হবে। ১১০ নম্বর আয়াতটি হচ্ছে ঃ

وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ ط وَمَا تُقَدِّمُوْا لِاَنْفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوْهُ عِنْدَ اللّٰهِ -

এবং তোমরা কায়েম করো নামায ও দাও যাকাত আর তোমরা যে মহাকল্যাণময় কাজই অগ্রে পাঠিয়ে দেবে, তা তোমরা অবশ্যই আল্লাহ্র নিকট পাবে।

আর ১৭৭ নম্বর আয়াতটিতে প্রকৃত পূণ্যশীলতা (البر) লাভের উপায় ও পন্থা হিসেবে অন্যান্য কয়েকটি কাজে শামিল করে বলা হয়েছে ঃ

وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ وَاٰتَى الزَّكٰوةَ -

[প্রকৃত পূর্ণশীলতা ও পরম কল্যাণ লাভ করেছে সে, যে অন্যান্য কাজের সাথে] নামায কায়েম করেছে ও যাকাত দিয়েছে।

সুস্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, আল্লাহ্ তা'আলা মুসলিম সমাজকে প্রকৃত পূণ্যশীল ও কল্যাণধর্মী বানানোর লক্ষ্যেই এ আয়াতটি নাযিল করেছেন এবং এ পর্যায়ে সাধারণত যে সব ভুল-ভ্রান্তি বা কুসংস্কার ছিল তার মূলোৎপাটন করেছেন।

আর ২৭৭ নম্বর আয়াতটিতে বলা হয়েছে ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ لَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ج وَلَاخَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ -

যারাই ঈমান এনেছে ও নেক আমল করেছে আর নামায কায়েম করেছে ও যাকাত দিয়েছে, তাদের জন্যে তাদের শুভ কর্মফল রয়েছে প্রভুর নিকট এবং তাদের কোনো ভয় নেই, চিন্তারও কোনো কারণ নেই।

www.amarboi.org

শুভ কাজের শুভ ফল দান এবং 'নামায' 'যাকাত'-এরও শুভ ফল প্রাপ্তি নিশ্চিত করা হয়েছে এ আয়াতটিতে এবং মুমিনদের অন্তরে বড় আশাবাদের সৃষ্টি করা হয়েছে এ আয়াতটির দ্বারা।

সূরা আন্-নিসা নাযিল হয়েছে তৃতীয় হিজরী সনের শুরুতে। তার প্রথম 'যাকাত' সম্বলিত আয়াতটি হচ্ছে ঃ

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ قِيْلَ لَهُمْ كُفُّوْآ اَيْدِيَكُمْ وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ اِذَا فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللّٰهِ اَوْ اَشَدَّ خَشْيَةً

হে নবী; আপনি কি লক্ষ্য করেননি সেই লোকদের ব্যাপার, যাদের প্রথম দিকে বলা হয়েছিল যে, আপাতত তোমাদের হাত গুটিয়ে রাখো এবং নামায কায়েম করো ও যাকাত দাও; পরে যখন তাদের ওপর যুদ্ধ করাকে ফরয করে দেওয়া হলো, তখন তাদের মধ্য থেকে কিছু লোক মানুষকে ততটাই ভয় পেতে লাগল যতটা ভয় আল্লাহ্কে পাওয়া উচিত– কিংবা তার চাইতেও অধিক কঠিন ও তীব্র। (আয়াত ঃ ৭৭)

যুদ্ধ করা ফরয হওয়ার পূর্বে সাধারণ মুমিনদের প্রতি যুদ্ধ সম্পর্কিত চিন্তা-ধান্ধা থেকে বিরত থেকে 'নামায' কায়েম ও 'যাকাত' দিয়ে নিজেদেরকে ও ইসলামী সমাজকে প্রস্তুত করতে বলা হয়েছিল; কিন্তু পরে যুদ্ধ করা যখন ফরয করে দেওয়া হলো, তখন কিছু লোক শত্রু পক্ষের ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ল। এ চিত্রই এ আয়াতে অংকিত করা হয়েছে। অর্থাৎ তারা যদি পূর্ববর্তী নির্দেশ অনুযায়ী 'নামায' কায়েম করে ও 'যাকাত' দিয়ে নিজেদের প্রস্তুত করত, তা হলে আজ তারা যুদ্ধের নির্দেশ পেয়ে মানুষের ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ত না।

এ থেকে একথাও জানা গেল যে, ইসলামের দৃষ্টিতে একটি স্বাধীন সমাজ গড়ে তোলার প্রকৃত ও কার্যকর পন্থা হচ্ছে, তাতে নামায কায়েম করা ও যাকাত আদায়-বণ্টনের ব্যবস্থা কার্যকর করা। আর এ পন্থায় যদি কোনো সমাজকে গড়ে তোলা হয়, তা হলে সে সমাজের লোকেরা যে, কোনো শত্রুর মুকাবিলা করতে সাহসী হবে এবং তাদের স্বাধীনতা সংরক্ষতি হবে। আর তা করা না হলে বা অপর কোনো প্রক্রিয়া অবলম্বন করা হলে স্বাধীনতা সংরক্ষক সমাজ কখনো গড়ে তোলা যাবে না।

সূরা আন্-নিসার ১৬২ নম্বর আয়াতে বনী-ইসরাঈলীদের নিকট থেকে প্রতিশ্রুতি গ্রহণের বিষয়াদি প্রসঙ্গে 'নামায' ও 'যাকাত'-এর কথা বলা হয়েছে। প্রসঙ্গটি বনী-ইসরাঈল সম্পর্কিত।

www.amarboi.org

সূরা আল-মায়েদা ১২ নম্বর আয়াতেও অনুরূপ কথারই উল্লেখ হয়েছে। ৫৫ নম্বর আয়াতটিতে মুসলমানদের লক্ষ্য করে বলা হয়েছে ঃ

إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوا الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ رٰكِعُوْنَ ۞

তোমাদের একমাত্র বন্ধু-পৃষ্ঠপোষক-অভিভাবক হচ্ছে আল্লাহ্, তাঁর রাসূল এবং সেই সব ঈমানদার লোকগণ যারা নামায কায়েম করে ও যাকাত দেয় এবং তারা অবনত থাকতে অভ্যস্থ।

সূরা 'তওবা'র চারটি আয়াতে 'যাকাত' শব্দের উল্লেখ রয়েছে। ৫ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَدْ تُّمُوْهُمْ وَخُذُوْهُمْ وَاحْصُرُوْهُمْ وَاقْعُدُوْا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَاِنْ تَابُوْا وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ فَخَلُّوْا سَبِيْلَهُمْ

অতঃপর মুশরিকদের হত্যা করো যেখানেই তাদের পাও, তাদের পাকড়াও করো, তাদের পরিবেষ্টিত করো এবং প্রত্যেকটি ঘাটিতে তাদের পাকড়াও করার জন্যে অবস্থান গ্রহণ করো। অতঃপর তারা যদি তওবা করে ও নামায কায়েম করে ও যাকাত দেওয়ার নীতি মেনে চলে, তা হলে তাদের পথ মুক্ত করে দাও।

এ আয়াতের বক্তব্য হচ্ছে তওবা করে ইসলাম কবুল করলে ও ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ নামায কায়েম করা ও যাকাত দেওয়ার কাজ শুরু করে দিলে এ যুদ্ধমান মুশরিকরাও শেষ পর্যন্ত নিষ্কৃতি পেয়ে যাবে। ১১ নম্বর আয়াতেও এ কথাই আরও স্পষ্ট করে বলা হয়েছে ঃ

فَاِنْ تَابُوْا وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ فَاِخْوَانُكُمْ فِى الدِّيْنِ -

ওরা যদি তওবা করে এবং নামায কায়েম করে ও যাকাত দেওয়ার নীতি গ্রহণ করে, তা হলে ওরা তোমাদেরই দ্বীনি ভাই হয়ে যাবে।

এ আয়াতের দৃষ্টিতে ইসলামী সমাজের ভিত্তি হচ্ছে নামায কায়েম ও যাকাত দেওয়ার ওপর প্রতিষ্ঠিত। ইসলামী সমাজে এ ব্যবস্থা অবশ্যই কার্যকর হতে হবে। যে সমাজে তা চালু নয়, তা ইসলামী সমাজ নামে অভিহিত হতে পারে না। আর এ ব্যবস্থা মেনে চলা ইসলামী সমাজের সদস্য হওয়ার জন্য জরুরী শর্ত। এ শর্ত লংঘনকারী ব্যক্তি ইসলামী সমাজের সদস্য হতে পারে না।

www.amarboi.org

১৮ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

اِنَّمَا يَعْمُرُ مَسٰجِدَ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ وَاٰتَى الزَّكٰوةَ وَلَمْ يَخْشَ اِلَّا اللّٰهَ فَعَسٰۤى اُولٰۤـئِكَ اَنْ يَّكُوْنُوْا مِنَ الْمُهْتَدِيْنَ ۞

আল্লাহ্র মসজিদসমূহ নির্মাণ ও আবাদ করতে পারে কেবল সেই লোক যে আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান এনেছে এবং নামায কায়েম করেছে ও যাকাত দেওয়ার নীতি গ্রহণ করেছে এবং আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে ভয় করেনি। খুবই সম্ভব যে, তারাই হেদায়াত প্রাপ্ত হবে।

এ আয়াতে হেদায়াতপ্রাপ্ত হওয়ার জন্যে আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান গ্রহণ নামায কায়েম ও যাকাত দেওয়ার নীতি অবলম্বনের এবং আল্লাহ্ ছাড়া কাউকে ভয় না করার শর্ত আরোপ করা হয়েছে। আর মসজিদ নির্মাণ– অর্থাৎ মুসলিম সমাজে নেতৃত্ব করার অধিকার লাভের নামও ঠিক তাই।

৭১ নম্বর আয়াতে মুমিন পুরুষ ও স্ত্রীলোকদের পরস্পরের ওলী হওয়ার ঘোষণা দিয়ে বলা হয়েছে ঃ

يَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَيُطِيْعُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ اُولٰۤئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّٰهُ –

তারা ভালো কাজের আদেশ করে, মন্দ কাজের নিষেধ করে এবং নামায কায়েম করে, যাকাত দেয় ও আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে। আল্লাহ্ তাদেরকেই রহমত দান করবেন।

প্রকৃত ইসলামী সমাজের চিত্র অংকিত হয়েছে এ আয়াতটিতে। আর এরূপ সমাজ যে আল্লাহ্র রহমত লাভে ধন্য হবে, তাতে আর সন্দেহ কি ?

সূরা আন্-নূর ৫ম হিজরী সনে নাযিল হয়েছিল। এ সূরার ৩৭ নম্বর আয়াতটি হচ্ছে ঃ

رِجَالٌ ۙ لَّا تُلْهِيْهِمْ تِجَارَةٌ وَّلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَاِقَامِ الصَّلٰوةِ وَاِيْتَآءِ الزَّكٰوةِ ۙ يَخَافُوْنَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيْهِ الْقُلُوْبُ وَالْاَبْصَارُ ۙ ۞

www.amarboi.org

[আল্লাহ্‌র নূর-এর প্রতি হেদায়াতপ্রাপ্ত] সে সব লোক, যাদেরকে ব্যবসা ও কেনা-বেচা আল্লাহ্‌র স্মরণ এবং নামায কায়েম ও যাকাত দান থেকে গাফিল করে রাখে না, তারা ভয় করে সেই দিনকে যে দিন হৃদয় উল্টে যাওয়া ও চক্ষুর পাথরবৎ হয়ে যাওয়ার অবস্থা দেখা দেবে।

ইসলামী সমাজে উন্নত মানের আল্লাহওয়াআলা লোকদের চিত্র এ আয়াতটিতে তুলে ধরা হয়েছে।

সূরা আল-আহযাব নাযিল হয়েছিল ৫ম হিজরীতে। এ সূরার ৩৩ নম্বর আয়াতে রাসূলে করীম (স)-এর স্ত্রী উম্মাহাতুল মুমিনীনদের সম্বোধন করে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন ঃ

وَقَرْنَ فِى بُيُوْتِكُنَّ وَلَاتَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْاُوْلٰى وَاَقِمْنَ الصَّلٰوةَ وَاٰتِيْنَ الزَّكٰوةَ وَاَطِعْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ -

তোমরা তোমাদের ঘরেই অবস্থান গ্রহণ করো এবং [বের হলেও] পূর্ববর্তী জাহিলিয়াতের সময়ের ন্যায় নগ্নতা ও অশালীনভাবে সজ্জিতা হয়ে দেখিয়ে বেড়ানোর কাজ কখনোই করবে না। আর তোমরা নামায কায়েম করো ও যাকাত দাও। এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অনুগত হয়ে থাকো।

আর এই ৫ম হিজরীতেই সূরা আল-আহযাব-এরও পরে নাযিল হয়েছিল সূরা আল-মুজাদিলা। এ সূরার ১৩ নম্বর আয়াতটির শেষ কথা হচ্ছে ঃ

فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ط وَاللّٰهُ خَبِيْرٌ ۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ۞

অতএব তোমরা নামায কায়েম করো ও যাকাত দাও এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে চলো। আল্লাহ তোমাদের কাজ-কর্ম সম্পর্কে ভালো ভাবেই অবহিত আছেন।

সূরা আল-মুজাম্মিল-এর দ্বিতীয় রুকূতে বিধৃত আয়াত ঃ

وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاَقْرِضُوا اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا ط وَمَا تُقَدِّمُوْا لِاَنْفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوْهُ عِنْدَ اللّٰهِ هُوَ خَيْرًا وَّاَعْظَمَ اَجْرًا -

এবং নামায কায়েম করো, যাকাত দাও, আর আল্লাহ্‌কে উত্তম ঋণ দিতে থাকো। যা কিছু ভালো ও কল্যাণ তোমরা নিজেদের জন্য অগ্রিম পাঠিয়ে দিবে,

www.amarboi.org

তাই আল্লাহ্‌র নিকট মওজুদ পাবে, তাই অতীব উত্তম এবং তার শুভ প্রতিফল খুব বড়।[১] (আয়াত ঃ ২০)

মদীনা মুনাওয়ারায় অর্থাৎ হিজরতের পরে অবতীর্ণ সূরাসমূহের যে যে আয়াতে 'যাকাত' শব্দের উল্লেখ হয়েছে, আমরা এখানে তার প্রত্যেকটি আয়াত উদ্ধৃত করে বিশেষভাবে 'নামায' ও 'যাকাত' সম্পর্কিত কথাটির রূপ যথার্থ তুলে ধরেছি। মাদানী পর্যায়ে সূরা আল-বাইয়্যেনা বাদে সর্বপ্রথম অবতীর্ণ সূরা আল-হাজ্জ-এর প্রথম উদ্ধৃত আয়াতটিতেই বলা হয়েছে, নামায কায়েম ও যাকাত আদায় ও বণ্টনের দায়িত্ব রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাসীনদের। এ দুটি মৌলিক ও ভিত্তিগত ইবাদত। তারা তা নিজেরা যেমন যথাযথভাবে পালন করবে, তেমনি রাষ্ট্রের আওতাধীন সমগ্র এলাকার মুসলমানরা তা যথাযথ পালন করছে কি না, তার প্রতি কড়া ও সজাগ দৃষ্টি রাখাও এবং তা যথাযথভাবে পালন করতে সংশ্লিষ্ট সকলকে উদ্বুদ্ধ ও বাধ্য করাও তাদেরই কর্তব্য। লক্ষ্যণীয় যে, ইতিপূর্বে মক্কী পর্যায়ে অবতীর্ণ আয়াতসমূহে যাকাত-এর উল্লেখ হয়েছে মুমিনদের একটি মহত গুণ হিসেবে। এক্ষেত্রে সমাজ সমষ্টির কোনো দায়িত্বের কথা তাতে বলা হয়নি। রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে যাকাত সম্পর্কিত দায়িত্ব পালনের কথা হিজরতের পরে পরে এবং প্রথম অবতীর্ণ আয়াতেই সর্ব প্রথম বলা হয়েছে। কেননা এক্ষণে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে এ দায়িত্ব পালনের জন্যে নবী করীম (স)-এর নেতৃত্বে মদীনায় একটি পূর্ণাঙ্গ ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা যতারীতি কায়েম হয়ে গেছে এবং সে রাষ্ট্রের ওপরই এ দায়িত্ব পালনের ভার এ আয়াতটি দ্বারাই অর্পিত হয়েছে।

সূরা 'আল-বাকারা'র ৫টি আয়াতের মধ্যে ৪৩ ও ৮৩ নম্বরের আয়াতদ্বয়ে 'নামায কায়েম করো ও যাকাত দাও' বলে সুস্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। নির্দেশই যাকাত ফরয করে দিয়েছে। এ সংক্রান্ত দুটি নির্দেশই বহুবচনের বলে। اَقِيْمُوْا وَاٰتُوْا সুস্পষ্ট মনে হয় যে, এ দুটি কাজই সামষ্টিকভাবে ও জামা'আতবন্দী হয়ে করতে হবে। ১৭৭ নম্বর আয়াতে পূণ্যশীলতা বা সৌভাগ্য লাভের উৎস ও উপায় হিসেবে অন্যান্য কয়েকটি কাজের মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কাজ হিসেবে উল্লেখিত হয়েছে 'নামায' কায়েম করা ও 'যাকাত' দেওয়ার কথা।

---

১. আয়াতটি মদীনায় নাযিল হয়েছিল, তা এ প্রসঙ্গের বিষয়বস্তু দেখেই স্পষ্ট বোঝা যায়। কেননা এ আয়াতটির শুরুতে আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ করার কথা বলা হয়েছে, যা মক্কায় আদৌ ঘটেনি– তার কোনো প্রশ্ন উঠেনি; কিন্তু মদীনায় এ আয়াতটি ঠিক কখন নাযিল হয়েছিল, তা বলা মুশকিল। তবে তা যে মদীনার জীবনের প্রাথমিক দিকে নাযিল হয়েছিল, তা বলতে বাধা নেই।

www.amarboi.org

এ সূরারই ২৭৭ আয়াতে মুমিনদের অপরিহার্য গুণ-পরিচিতি রূপে নামায কায়েম ও যাকাত আদায়ের উল্লেখ হয়েছে। অর্থাৎ 'নামায'-এর ন্যায় 'যাকাত' দেওয়াও মুমিন হওয়ার অনিবার্য দাবি ও শর্ত। এর কোনো একটা না করলে সে মুমিন বিবেচিত হতে পারে না– মুমিন হওয়ার দাবি করার তার কোনো অধিকারই নেই।

সূরা আন-নিসার ৫৫ নম্বর আয়াতটির বক্তব্যও এই। সূরা তওবার চারটি আয়াতেই মুসলিম সমাজের সদস্য ও দ্বীনী ভাই রূপে গণ্য হওয়ার জন্যে এ নামায কায়েম ও যাকাত আদায়ের শর্ত ঘোষিত হয়েছে। তা করলেই এ সমাজের সদস্য হওয়ার অধিকার জন্মে, অন্যথায় নয়। সূরা আন্-নূর-এর আয়াতটিতে ইসলামী সমাজের আদর্শ নাগরিকদের পরিচিতি স্বরূপ অন্যান্য কয়েকটি বিষয়ের সাথে 'নামায' কায়েম ও 'যাকাত' দেওয়ার দায়িত্ব থেকে তারা কখনোই গাফিল হয় না বলে অত্যন্ত বলিষ্ঠ ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছে। আর এ পর্যায়ে সর্বশেষ আয়াতটি হচ্ছে সূরা মুজাদিলা। তাতে নামায কায়েম ও যাকাত দেওয়ার নির্দেশের পর-পরই আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এ-ও ঠিক, ইসলামী সমাজের অন্তর্ভুক্ত ও ইসলামী রাষ্ট্রের মুসলিম নাগরিকদের প্রতিই এ নির্দেশ।

'যাকাত' ও 'সাদাকাত'

কুরআন মজীদের 'যাকাত' সম্বলিত আয়াতসমূহ ভিত্তিক এ দীর্ঘ আলোচনা থেকে 'যাকাত'-এর প্রকৃতি ও স্বরূপ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে বলে মনে করছি। এ প্রসঙ্গেই আর একটি কথা বলাও একান্তভাবে জরুরী। আর তা হচ্ছে, এ পর্যন্ত 'যাকাত' বলে যে জিনিসটিকে আমরা সম্মুখে উদ্ভাসিত করে তুলেছি, কুরআনেরই (صدقة) অপর কয়েকটি আয়াতে এ 'যাকাত'কেই বোঝানো হয়েছে 'সাদাকাতুন' বলে। এ দৃষ্টিতে 'যাকাত' ও 'সাদাকাতুন' শব্দ দুটি অভিন্ন অর্থবোধক।[১]

---

১. হাদীসেও 'যাকাত'কে 'সাদাকাত' বলা হয়েছে। যথা ঃ

لَيْسَ فِيْمَادُوْنَ خَمْسَةَ اَوْسَقٍ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ دُوْنَ خَمْسَ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسَ اَوَاقٍ صَدَقَةٌ - (بخاری، مسلم)

পাঁচ অসাক-এর কম পরিমাণ ফসলে সাদকা নেই, পাঁচটি উটের কমে সাদ্‌কা নেই, পাঁচ আউকিয়ার কম পরিমাণে সাদকা নেই; এই সাদকা অর্থ 'যাকাত' صَدَقَةٌ আল্লামা মাওয়ার্দী বলেছেন ঃ সাদকা যাকাত, আর যাকাত সাদ্‌কা নাম দুটি, কিন্তু যে জিনিসের নাম তা একটি। রাসূলে করীম (স) হযরত মুয়ায (রা)-কে ইয়েমেন প্রেরণ কালে বলেছিলেন ঃ

اَعْلِمْهُمْ اَنَّ اللّٰهَ اِفْتَرَضَ عَلَيْهِمْ فِىْ اَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ اَغْنِيَا ئِهِمْ وَتَرَدُّفِىْ فُقَرَائِهِمْ -

তুমি ইয়েমেনবাসীদের জানিয়ে দিবে, আল্লাহ তাদের ধন-মালে যাকাত ফরয করেছেন, যা তাদের ধনীদের নিকট থেকে নিয়ে তাদেরই দারিদ্রদের মধ্যে বণ্টন করে দেওয়া হবে।

www.amarboi.org

'যাকাত' শব্দের তাৎপর্যে যেমন পবিত্রতা পরিশুদ্ধতা ও প্রবৃদ্ধি লাভ সংক্রান্ত ভাবধারা রয়েছে, তেমনি 'সাদাকাতুন' শব্দে আন্তরিক নিষ্ঠা সহকারে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের লক্ষ্যে দান-খয়রাত করার ভাবধারা শামিল রয়েছে। ফলে মৌল ভাবধারার দিক দিয়ে দুটি শব্দই এক ও অভিন্ন। তাই সূরা তওবার দুটি আয়াত-সমষ্টিতে 'সাদকা' শব্দটি যাকাত-এর বিকল্প শব্দ হিসেবে ব্যবহৃত হতে দেখা যাচ্ছে। এ দুটি আয়াতেই 'সাদকা' শব্দ বলে ফরয যাকাতই বোঝানো হয়েছে।

সূরা তওবার ৬০ নম্বর আয়াতটিতে যাকাত বণ্টনের খাতসমূহের উল্লেখ প্রসঙ্গে ঘোষণা করা হয়েছে ঃ

اِنَّمَا الصَّدَقٰتُ لِلْفُقَرَاۤءِ وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْعٰمِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ وَفِى الرِّقَابِ وَالْغٰرِمِيْنَ وَفِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَابْنِ السَّبِيْلِ فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ۝

'সাদাকাত'– অর্থাৎ যাকাত কেবল মাত্র ফকীর, মিকসীন, সে জন্যে নিয়োজিত কর্মচারী, যাদের অন্তর সন্তুষ্ট করা প্রয়োজন বলে বিবেচিত, ঋণভারাক্রান্ত, ক্রীতদাস মুক্তির জন্যে, আল্লাহ্‌র পথে, নিঃস্ব পথিক-এর জন্যে আল্লাহ্‌র ধার্যকৃত ফরয রূপে। আর আল্লাহ মহাজ্ঞানী, মহাবিজ্ঞানময় সুবিবেচক।[১]

আর এ সূরারই ১০৩ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তা'আলা নবী করীম (স)-কে লক্ষ্য করে নির্দেশ দিয়েছেন এই বলে ঃ

خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ط اِنَّ صَلٰوتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ -

---

১. আয়াতের শুরুতে انما। 'ইহা ছাড়া নয়' বলার কারণে যাকাত উল্লেখিত মোট আটটি খাতের মধ্যে সীমিতভাবে বণ্টিত হবে। এই আয়াতে নবী করীম (স) বলেছেন ঃ

اِنَّ اللّٰهَ لَمْ يَرْضَ فِىْ الصَّدَقَاتِ بِحُكْمِ وَلَانَبِىِّ غَيْرُهُ حَتّٰى جَزَاهَا ثَمَانِيَةَ اَجْزَاءٍ -

আল্লাহ আ'আলা যাকাত বণ্টনের ব্যাপারটি নবী বা অন্য কারুর হুকুমের ওপর ছেড়ে দিতে রাজি হন নি। তিনি নিজেই তা আটটি খাতে বিভক্ত করে দিয়েছেন। (আবূ দাউদ, দারেকুত্‌নী)

لجامع لاحكام القران للقرطبى ج٨ص ١٦٨ لجامع الاحكام القران ج ٨ ص ١٦٨ -

www.amarboi.org

তাদের সম্পদ থেকে যাকাত (সাদকা) গ্রহণ করো– তুমি তার দ্বারা তাদের পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করবে এবং তাদের জন্য তুমি দো'আ করো। কেননা তোমার দো'আসমূহ তাদের জন্যে বিশেষ সান্তনার বাহন।

এ দুটি আয়াতেই 'সাদকা' শব্দ বলে 'ফরয যাকাত' বোঝানো হয়েছে। আল্লামা কুরতুবী লিখেছেন ঃ الصدقة متى اطلقت فى القران فهى صدقة الفرض সাদকা শব্দটি কুরআনে যেখানে যেখানে বিনা শর্তে উদ্ধৃত হয়েছে, সেখানে সেখানেই তা ফরয সাদকা বোঝাবে।[১] আর ফরয সাদকা হচ্ছে যাকাত। প্রথমোদ্ধৃত আয়াতটিতে যে আটটি খাত নির্দিষ্ট করা হয়েছে 'সাদাকাত' বন্টনের জন্যে, তা-ই হচ্ছে যাকাত বন্টনের আল্লাহ্ কর্তৃক নির্দিষ্ট আটটি খাত। যাকাত এ খাতসমূহেই বন্টিত হতে হবে।

নবী করীম (স)-এর অবদান

সুস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, যাকাত নবী করীম (স)-এর নিজস্ব প্রবর্তিত কোনো বিধান নয়, তা স্বয়ং আল্লাহ্ কর্তৃক নির্দিষ্ট ও আরোপিত। তা বন্টনের খাত নির্ধারণের কাজটিও নবী করীমের জন্যে ছেড়ে দেওয়া হয়নি, আল্লাহ নিজেই তা নির্ধারণ করে দিয়েছেন। তবে এ 'সাদ্কা' বা যাকাত সংগ্রহ করার নির্দেশ নবীকেই দেওয়া হয়েছে।

হযরত মুহাম্মাদ (স) এ নির্দেশ পালনে বাস্তবে দুটি সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন। তা হচ্ছে যাকাত কোন কোন জিনিসের ওপর কখন ধার্য হবে এবং কোন জিনিস থেকে কখন কত পরিমাণ যাকাত বাবদ গ্রহণ করা হবে। তিনি আল্লাহ্র নির্দেশ ও অনুমতিক্রমে এবং দায়িত্ব পালনে বাস্তবভাবে সমস্যা সমাধানে আল্লাহ প্রদত্ত ক্ষমতানুযায়ীই তা নির্দিষ্ট করেছেন।[২] তাঁর এ নির্ধারণ কুরআনে

---

১. নবী করীম (স) 'সাদ্কা' বলে এই ফরয যাকাতই বুঝিয়েছেন। তিনি বলেছেন ঃ

أُمِرْتُ اَنْ اٰخُذَ الصَّدَقَةَ مِنْ اَغْنِيَا ئِكُمْ وَاَرُدُّهَا عَلٰى فُقَرَائِكُمْ -

আমি আদিষ্ট হয়েছি যে, আমি তোমাদের ধনী ব্যক্তিদের নিকট থেকে যাকাত (সাদ্কা) গ্রহণ করব এবং তোমাদের ফকীর লোকদের মধ্যে তা ফিরিয়ে দেব। (ঐ)

২. ইমাম ইবনুল কাইয়্যের আল-জাওজিয়ায় লিখেছেন ঃ

هدية فى الزكواة اكمل هدى فى وقتها وقدرها ونصابها ومن تجب عليه ومصر فها وقدراى فيها مصلحة ارباب الاموال ومصلحة المسا كين وجعلها الله سبحانه وتعالى طهرة للمال ولصاحبه وقيد النعمة فيها على الاغنيا ..... ثم انه جعلها فى اربعة اصناف من المال وهى اكثر الاموال دورنا بين الخلق وحاجتها اليها ضرورية .... (زاد المعاد ج ٢ ص ١)

www.amarboi.org

অর্পিত تبيين –বয়ান-বিশ্লেষণ-নিয়ম-পদ্ধতি ব্যাখ্যাকরণ পর্যায়ের কাজ। এ কাজের দায়িত্ব আল্লাহ্ তা'আলাই তাঁর ওপর অর্পণ করেছিলেন। বলেছিলেন ঃ

وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَانُزِّلَ اِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ

আর এখন এ যিকির (কুরআন) হে নবী! তোমার প্রতি নাযিল করেছি, যেন তুমি লোকদের সামনে লোকদের জন্যে সেই শিক্ষাধারার ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করতে থাকো যা তাদের জন্যে নাযিল করা হয়েছে এবং সম্ভবত তারা নিজেরাও যেন চিন্তা-ভাবনা-গবেষণা করে। (সূরা নহল ঃ ৪৪)

এ আয়াতের তাফসীরে ইমাম কুরতুবী লিখেছেন ঃ

يعنى القران ...... اى فى هذا الكتاب من الاحكام والوعد والوعيد بقولك وفعلك فالرسول صلى عليه وسلم مبين عن الله عزوجل مراده مما اجمله فى كتابه من احكام الصلاة وازكاة وغير ذالك مما لم يفصله -

(الجامع لاحكام القران ج ١٠ - ص ١٠٩)

আয়াতে 'যিকির' শব্দ দ্বারা কুরআন বুঝানো হয়েছে। আর تبيين বয়ান-বিশ্লেষণ করার বিষয় হচ্ছে, এ কিতাবে যে সব হুকুম-আহকাম, ওয়াদা ও অয়ীদ রয়েছে, তার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করার কাজ তোমাকে করতে হবে তোমার কথা দ্বারা ও তোমার কাজ দ্বারা। অতএব এ আয়াত অনুযায়ী রাসূল হচ্ছে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে বর্ণনাকারী।

অর্থাৎ আল্লাহ্র কিতাবে নামায ও যাকাত ইত্যাদি সংক্রান্ত হুকুম-আহকাম, যা অ-বিস্তারিত ও মোটামুটিভাবে বলা হয়েছে, আল্লাহ্ নিজে যার বিস্তারিত বর্ণনা দেননি, তার বিস্তারিত ও খুঁটিনাটি নিয়ম-কানুন বর্ণনা করার দায়িত্ব রাসূলে করীম (স)-এর ওপর অর্পিত।

যাকাত-এর ক্ষেত্রে রাসূল করীম (স)-এর পথ-নির্দেশ হচ্ছে তার সময়, পরিমাণ, নিসাব, কার ওপর তা ফরয ইত্যাদি নির্ধারণ করে দেওয়ার হেদায়াতকে তিনি পূর্ণাঙ্গ করে দিয়েছেন। তিনি এ কাজে এক সাথে সম্পদের মালিক ও যাকাত পাওয়ার যোগ্য মিসকীন সকলেরই কল্যাণকে সমুখে রেখেছেন। আল্লাহ্ এ যাকাত দ্বারা এক দিকে ধন-মালের পবিত্রতা ও তার মালিকের পরিশুদ্ধতার ব্যবস্থা করেছেন। এ নেয়ামত বের করার দায়িত্ব ধনীদের ওপর অর্পণ করেছে ... রাসূলে করীম (স) চার পর্যায়ের মালের ওপর যাকাত ধার্য করেছেন; কেননা সৃষ্টিকুলের মধ্য থেকে এ চার পর্যায়ের মালই অধিক ব্যবহৃত হয়। আর এ দিয়েই তাদের প্রয়োজন পূরণের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

www.amarboi.org

ফলে হযরত নবী করীম (স)-এর এ বর্ণনা-বিশ্লেষণ মূলত স্বয়ং আল্লাহ্‌র বর্ণনা-বিশ্লেষণ। এবং আল্লাহ্‌র কথার সমান মর্যাদায়ই তা অবশ্যই মাননীয় ও পালনীয়। রাসূলে করীম (স)-এর এ কাজকেই বলা হয় সুন্নাত। কুরআন মজীদ এ সুন্নাত সহ-ই ইসলামী আইনের প্রথম ও প্রধান উৎস। আর এই নির্ধারণ হচ্ছে توفيقى 'তওকীফী'– আল্লাহ্ নির্ধারিত। তা পরিবর্তন করার কোনো অধিকার কারুর নেই।

'যাকাত' সম্পদকে আল্লাহ নির্ধারিত খাতসমূহে বণ্টন করার মৌল উদ্দেশ্য হচ্ছে দুটি। একটি হচ্ছে, যাকাত দাতার মন-মানস ও ধন-সম্পদ পবিত্র ও পরিশুদ্ধকরণ। 'যাকাত' না দিলে তা পবিত্র ও পরিশুদ্ধ হতে পারে না। সূরা 'তওবা'র পূর্বোদ্ধৃত ১০৩ নম্বর আয়াতে تطهرهم وتزكيهم بها বলে সেই কথারই ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। আর দ্বিতীয় লক্ষ্য হচ্ছে, সমাজের অক্ষম অভাবগ্রস্ত লোকদের সচ্ছলতা বিধান– তাদের অভাব মুক্ত করণ। ইমাম কুরতুবী লিখেছেনঃ

خص اللّٰه سبحانه بعض الناس بالاموال دون بعض نعمة منه عليهم وجعل شكر ذالك منهم اخراج سهم يودونه الى من لامال له نيابة عنه سبحانه فيما ضمنه بقوله وما من دابة فى الارض الا على اللّٰه رزقها -

(الجامع لاحكام القران ج٨ - ص ١٦٨)

আল্লাহ তা'আলা কিছু কিছু লোককে বিশেষভাবে ধন-সম্পদ দিয়েছেন তাদের প্রতি নেয়ামত দান স্বরূপ এবং কিছু লোককে তা দেননি। এ নেয়ামত প্রাপ্ত লোকদের শোকর আদায় স্বরূপ পন্থা নির্ধারণ করেছেন সে নেয়ামতের অংশ বের করে দেওয়া যা তারা দেবে সেই লোকদের যাদের ধন-সম্পদ নেই– দেবে মহান আল্লাহ্‌র প্রতিনিধি হিসেবে। তাদের এ প্রতিনিধিত্ব হবে সেই কাজে যা আল্লাহ নিজের দায়িত্ব হিসেবে ঘোষণা করেছেন ঃ 'জমিনের ওপর অবস্থানকারী সব জীবেরই রিযিক দেওয়ার দায়িত্ব আল্লাহ্‌র– এ কথার মাধ্যমে।

অর্থাৎ রিযিক তো সকলেই পাবে। তবে তা পৌঁছানোর পন্থা হিসেবে আল্লাহ তা'আলা দুটি প্রক্রিয়া গ্রহণ করেছেন। একটি হচ্ছে, সরাসরি আল্লাহ্‌র দেওয়া নেয়ামত হিসাবে। আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে, এ নেয়ামতপ্রাপ্ত লোকদের মাধ্যমে তারা আল্লাহ্‌র প্রতিনিধি বা আল্লাহ্‌র নিকট থেকে দায়িত্ব প্রাপ্ত হিসেবে রিযিক পৌঁছানোর কাজ করবে। ফলে সমাজে Haves ও Have not's –'আছে' ও 'নেই' বা ধনী ও সর্বহারার কোনো ব্যবধান থাকবে না– সব মানুষই নিজেদের

www.amarboi.org

প্রয়োজন পাওয়ার দিক দিয়ে অভিন্ন ও একাকার হয়ে যাবে। যাকাত বণ্টনের আল্লাহ্ ঘোষিত খাতসমূহ চিন্তা করলেই এ কথার সারবত্তা আমরা নিঃসন্দেহে বুঝতে পারি।

শাহ্ ওলীউল্লাহ দেহলভী লিখেছেন ঃ 'আল্লাহ্ নির্ধারিত যাকাত বণ্টনের খাত যেমন অপরিবর্তনীয়, রাসূলে করীম (স)-এর যাকাত গ্রহণের উৎস ও পরিমাণ নির্ধারণও অনুরূপভাবেই অপরিবর্তনীয়। রাসূল (স)-এর এ নির্ধারণ যদি অপরিবর্তনীয় মর্যাদার না হতো, আর সাধারণ মানুষ তাতে কোনোরূপ হস্তক্ষেপ করার সুযোগ পেত, তা হলে অনেক বাড়তি কমতি সৃষ্টি হওয়ার কঠিন আশংকা থেকে যেত। অথচ রাসূল (স) যা নির্ধারণ করেছেন, তার চেয়ে কম হওয়া যেমন বাঞ্ছনীয় নয়, তেমনি বেশি হওয়াও অবাঞ্ছনীয়। কম হলে যাকাতের মূল লক্ষ্য কার্পণ্য প্রবৃত্তির সংশোধন ব্যাহত হতো। আর তার চাইতে বেশি হলে তা আদায় করাই কঠিন হতো। (حجة الله البالغة ج ٢)

কুরআনে ঘোষিত যাকাত-এর খাতসমূহের সর্বপ্রথম হচ্ছে ফকীর ও মিসকীন। রাসূলে করীম (স) আল্লাহ্‌র খাত নির্ধারণে ফকীর মিসকীনের প্রাধান্য পাওয়ার গুরুত্ব লক্ষ্য করেই বলেছিলেন ঃ

تُؤْخَذُ مِنْ اَغْنِيَائِهِمْ لِيُرَدَّ اِلٰى فُقَرَائِهِمْ -

যাকাত ধনশালী লোকদের নিকট থেকে গ্রহণ করা হবে এবং তা ফিরিয়ে দেওয়া হবে তাদেরই ফকীর-মিসকীন দরিদ্র লোকদের প্রতি।

দরিদ্রদের এ যাকাত প্রাপ্তি ধনী লোকদের অনুগ্রহ বা দয়ার দান নয়। তা আল্লাহ্ নির্ধারিত 'হক'। তিনি নিজেই ঘোষণা করেছেন ঃ

وَفِىْٓ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّآئِلِ وَالْمَحْرُوْمِ -

এবং তাদের ধন-সম্পদে সুনির্দিষ্ট ও সুপ্রতিষ্ঠিত হক্ রয়েছে প্রার্থী ও বঞ্চিত লোকের জন্য। (সূরা যারিয়াত ঃ ১৯)

তাদের 'ধন-সম্পদে' বলে 'মুত্তাকীন' লোকদের ধন-সম্পদের কথা বোঝানো হয়েছে; যারা কেবল নিজেদের ওপরই নয়, নিজেদের ধন-সম্পদের ওপরও আল্লাহ্‌র হক্ রয়েছে বলে মেনে নিয়েছে। আর এ হক্ নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে নিঃস্ব দরিদ্রদের জন্যে। তাদেরকে দু পর্যায়ে ফেলা যায়। প্রথম, যারা দরিদ্র হওয়ার কারণে চাইতে প্রস্তুত হয় আর দ্বিতীয়, যারা দরিদ্র হওয়া সত্ত্বেও চাইতে রাজি হয় না। এ উভয় শ্রেণীর লোকদের জন্যে হক্ নির্দিষ্ট হয়েছে আল্লাহ্‌রই দেওয়া ধনীদের ধন-সম্পদে। এ হক্ অস্বীকার করার অধিকার যেমন কারুরই নেই, তেমনি এ

www.amarboi.org

হক্ দিয়ে কারোর প্রতি দয়া অনুগ্রহ দেখানোর অধিকারও নেই কারোর– এটা পাওনাদারদের প্রাপ্য দিয়ে দেওয়া মাত্র। আর তা যেহেতু রাষ্ট্রীয় বায়তুল মাল-এর মাধ্যমে দরিদ্রদের মধ্যে বণ্টিত হবে, তাই তা ব্যক্তিগতভাবে কারোর প্রতি কারোর অনুগ্রহ বলেও বিবেচিত হতে পারবে না।

সেই সাথে নবী মুহাম্মাদ (স)-ও বলে দিয়েছেন ঃ

لَاتَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِىٍّ وَّلَا لِذِىْ مُرَّةٍ سَوِيٍّ -

ধনী লোকদের জন্যে যাকাত হালাল নয়, হালাল নয় কর্মক্ষম সুস্থ দেহসম্পন্ন লোকদের জন্যেও।

ফলে নিতান্তই নিঃস্ব দরিদ্র লোকদের ছাড়া অন্য কারোর পক্ষেই যাকাত-এর অংশ পাওয়ার সুযোগ নেই, তেমনি কর্মক্ষম সুস্থ দেহসম্পন্ন ব্যক্তিদের পক্ষেও যাকাত খেয়ে বেকার নিষ্কর্মা হয়ে বসে জীবন কাটানোরও কোনো সুযোগ হতে পারে না।

যাকাত রাষ্ট্রীয় ব্যাপার

যাকাত আদায় ও বণ্টন ইসলামী রাষ্ট্রের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য। এ কথা যেমন সূরা আল-হজ্জ এর পূর্বোদ্ধৃত ৪১ নম্বরের আয়াতে اَلَّذِيْنَ اِنْ مَّكَّنّٰهُمْ فِى الْاَرْضِ اَقَامُو الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ দ্বারা স্পষ্ট ঘোষিত হয়েছে, তেমনি যাকাত বণ্টনের আল্লাহ নির্ধারিত আটটি খাতের মধ্যে তৃতীয় পর্যায়ে উদ্ধৃত وَالْعَامِلِيْنَ عَلَيْهَا 'এবং সেজন্য নিয়োজিত কর্মচারীগণ'– শামিল থাকায় নিঃসন্দেহে সমর্থিত। কেননা যাকাত আদায় ও বণ্টনে কর্মচারী নিয়োগ করা একটা সরকারের পক্ষেই সম্ভব। 'যাকাত' দিতে অস্বীকার করা হলে তার বিরুদ্ধে জিহাদ করার দায়িত্ব সরকারকেই পালন করতে হয়।

এ থেকে দুটি কথা প্রমাণিত হচ্ছে। একটি হচ্ছে, যাকাত নামাযের ন্যায় একটি সামষ্টিক ব্যবস্থা, সামষ্টিক ভাবেই তা আদায় ও বণ্টন করতে হবে। আর দ্বিতীয় হচ্ছে, যাকাত দ্বীন-ইসলামের পূর্ণাঙ্গ বিধানের একটি অপরিহার্য 'রুকন'[১]

---

১. নবী করীম (স) এরশাদ করেছেন ঃ

بُنِىَ الْاِسْلَامُ عَلٰى خَمْسٍ : شَهَادَةُ اَنْ لَااِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدً رَسُوْلُ اللّٰهِ وَاِقَامِ الصَّلٰوةِ وَاِيْتَاءِ الزَّكٰوةِ وَحَجِّ الْبَيْتِ وَصَوْمِ رَامَضَانَ - (بخارى ومسلم)

দ্বীন-ইসলাম পাঁচটি জিনিসের ওপর ভিত্তিশীল ঃ আল্লাহ ছাড়া মাবুদ নেই, মুহাম্মাদ আল্লাহ্‌র রাসূল– এর সাক্ষ্যদান, নামায কায়েম করা, যাকাত দান করা, আল্লাহ্‌র ঘরের হজ্জ করা এবং রমযান মাসের রোযা থাকা। (বুখারী, মুসলিম)

www.amarboi.org

আর যাকাত দ্বীন-ইসলামের পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নের অন্তর্ভুক্ত কাজ হিসেবে যাকাত ব্যবস্থাও কার্যকর করে তুলতে হবে। যেখানে ইসলাম পূর্ণাঙ্গ দ্বীন হিসেবে বাস্তবায়িত নয়, যেখানে যাকাত-এর পরিপন্থী সুদী ব্যবস্থা কার্যকর, ঘুষ-রিশ্‌ওয়াতের প্রাবল্য, জিনা ও মদ্যপান ব্যাপক, সেখানে যাকাত ব্যবস্থা কার্যকর হতে পারে না। যে সরকার আল্লাহ্‌র সার্বভৌমত্বের ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়, কুরআন ও সুন্নাহ্‌র মৌল আইনের উৎসরূপে স্বীকৃত নয়, যেখানে নামায কায়েমের পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থা চালু হয়নি, সেখানে যাকাত-ব্যবস্থা যেমন কার্যকর হতে পারে না, তেমনি এরূপ সরকারের যাকাত আদায় ও বন্টনের দায়িত্ব গ্রহণেরও কোনো অধিকার নেই।

এর দুটি কারণ। একটি সূরা আল-হজ্জ-এর সেই আয়াতটির পূর্ববর্তী আয়াত, তাতে বলা হয়েছে ঃ আল্লাহ্‌র সাহায্যকর্ম করে যারা আল্লাহ্‌র সাহায্য প্রাপ্ত হয়, আল্লাহ্ তাদেরকেই রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অতিষ্ঠিত করেন এবং তারাই নামায কায়েম করে ও যাকাত আদায়-বন্টনের কাজ করে– তার অধিকার পায়। আল্লাহ্‌র নিকট থেকে এ অধিকার কেবল তাদের পক্ষে পাওয়াই সম্ভব যারা আল্লাহ্‌র সার্বভৌমত্ব ভিত্তিক সরকার প্রতিষ্ঠিত করবে।

আর দ্বিতীয় বিজ্ঞানসম্মত যে কারণটি তা হচ্ছে, একটি 'সিস্টেম' (system)। তার আনুসঙ্গিক সকল জরুরি ব্যবস্থাপনা সহ-ই বাস্তবায়িত হতে পারে। কোনো জিনিসকে তার 'সমগ্র' থেকে বিচ্ছিন্ন করে একটি অংশ মাত্র হিসেবে কার্যকর করা যেমন সম্ভব নয়, তেমনি বিজ্ঞানসম্মত কাজও নয়।[১]

যাকাত-এর দার্শনিক পটভূমি

আল্লাহ্ তা'আলা দুনিয়ার মানুষের জন্যে যে দ্বীন বা পূর্ণাঙ্গ জীবন-বিধান নাযিল করেছেন, তার আদর্শগত ও কর্মগত পাঁচটি স্তম্ভ রয়েছে। তার প্রথম হচ্ছে ঃ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ'র সাক্ষ্য দান। 'সাক্ষ্য দান' বা 'শাহাদত' অর্থ এ ঘোষণাকে অন্তর দিয়ে পরম সত্যরূপে বিশ্বাস করা, মুখে উদাত্ত কণ্ঠে উচ্চারণ ও ঘোষণা করা এবং তদনুযায়ী স্বীয় জীবনের সমস্ত তৎপরতা নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করা। বস্তুত এ সাক্ষ্যদান-ই ইসলামের ভিত্তিস্থানীয়। অপর চারটিও বিভিন্ন দিক দিয়ে মৌলিক এবং অনুরূপ ভিত্তিস্থানীয়। 'নামায' হচ্ছে দৈহিক আনুষ্ঠানিক ইবাদতের দিক দিয়ে আদর্শগত ও কর্মগত ভিত্তি। আল্লাহ্ তা'আলাই হচ্ছেন যাবতীয় 'ইবাদত' পাওয়ার একমাত্র

1. International Encyclopeadia of Social Science : Macmellan.

www.amarboi.org

অধিকারী। তিনিই আমাদের আদেশ করেছেন, আমরা যেন দো'আ-যিকর-কুরআন পাঠ-তসবীহ্-তমজীদ ও ইস্তিগফার ইত্যাদির মাধ্যমে তাঁর ইবাদত করি। আর এ সবই নামায-এর মধ্যে সমন্বিত। ফলে নামায কায়েম করা না হলে আল্লাহ্র ইবাদত হয়না। কেননা এ 'নামায'কে কেন্দ্র করেই আল্লাহ্র ইবাদত পর্যায়ের যাবতীয় কার্যাদি আবর্তিত হচ্ছে।

আর ধন-সম্পদের দিক দিয়ে ইসলামের আদর্শগত ও কর্মগত ভিত্তি হচ্ছে যাকাত। কেননা ইসলামের দৃষ্টিতে যাবতীয় ধন-সম্পদের প্রকৃত ও একচ্ছত্র মালিক হচ্ছেন আল্লাহ তা'আলা। মানুষ হচ্ছে এ ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলার খলীফা।[১] ফলে মানুষের কর্তব্য হচ্ছে, তা অর্জন ও গ্রহণ করবে আল্লাহ্র নির্দেশিত পন্থায়, ব্যয় ও ব্যবহারও করবে কেবলমাত্র তাঁরই দেখানো পথে ও খাতে। এ সব ক্ষেত্রেই ধন-মালের আদর্শগত ও কর্মগত ভিত্তি হচ্ছে যাকাতা। কাজেই যে লোক রীতিমতো যাকাত দিয়ে আল্লাহ্র এই মালিকত্বকে স্বীকার ও কার্যকর না করবে, সে অন্যান্য ক্ষেত্রেও আল্লাহ তা'আলার কর্তৃত্ব মেনে নিতে স্বভাবতই অস্বীকারকারী হবে; বরং হচ্ছে বলে মনে করতে হবে।

'নামায' হচ্ছে মহান আল্লাহ্র সাথে সম্পর্ক স্থাপন ও সংরক্ষণের প্রথম ও প্রধান প্রক্রিয়া। এরই মাধ্যমে বান্দাহ্র মন ও মনন, চিন্তা-বিশ্বাস-ভক্তি-শ্রদ্ধা ভীতি-বিনয়-কুরবানী এবং স্বীয় রূহ ও দেহের পূর্ণ মাত্রার সমর্পনের এক তুলনাহীন অনুষ্ঠান।

আর যাকাত হচ্ছে ব্যক্তির আয়ত্তাধীন সম্পদ-সম্পত্তির ওপর আল্লাহ্র একচ্ছত্র মালিকত্ব স্বীকারের বাস্তব অনুষ্ঠান। নিয়মিত 'যাকাত' আদায় করেই এ কথার বাস্তব স্বীকৃতি দেওয়া সম্ভব যে, যাবতীয় ধন-সম্পত্তির এবং ব্যক্তি নিজের গোটা সত্তারও প্রকৃত মালিক আল্লাহ্ তা'আলা।[২] ধন-সম্পত্তিতে যাকাত হচ্ছে আল্লাহ্র সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হক (যদিও যাকাতই একমাত্র ও সর্বশেষ ব্যবস্থা নয়)। তাই রাসূলে করীম (স) বলেছেন ঃ الصدقة برهان। –'যাকাত এক অকাট্য প্রমাণ।' প্রমাণ ঈমানদার হওয়ার, মুমিন হওয়ার।

এই কারণে যাকাত ইসলামের একটি অন্যতম 'রুকন' গণ্য হয়েছে। তা ফরয করা হয়েছে মানুষের অন্তর-এর পবিত্রতা বিধান এবং ফরয করা দায়িত্ব পালনের

---

১. সূরা আল হাদীদ-এর ৭ আয়াত وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه –এবং তোমরা ব্যয় করো সেই ধন-সম্পদ থেকে, যাতে তিনি তোমাদেরকে খলীফা নিযুক্ত করেছেন।

২. সূরা তওবার ১১১ আয়াত ঃ ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموا لهم بان لهم الجنة। –'নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা ক্রয় করে নিয়েছেন মুমিনদের সত্তা ও তাদের যাবতীয় ধন মাল-এর বিনিময়ে যে তাদের জন্যে জান্নাত রয়েছে।'

www.amarboi.org

অনুভূতি সৃষ্টির উদ্দেশ্যে। আত্মপ্রেম ও লোভ-কার্পণ্যের প্রকৃতিগত ভাবধারা দূর করে মন-মানসিকতাকে পবিত্র, পরিচ্ছন্ন, নির্মল ও স্বচ্ছ করে তোলাই আল্লাহ্র ইচ্ছা। কেননা ধন-মাল মানুষের অত্যন্ত প্রিয়, মালিকত্ব লাভের জন্য মানুষ পাগল পারা। এরূপ অবস্থায় মানুষ যখন স্বআয়ত্তাধীন মাথার ঘাম পায়ে ফেলে উপার্জিত ধন-মাল থেকে দরিদ্র অভাবগ্রস্থ লোকদেরকে দেয় কেবলমাত্র আল্লাহ্র হুকুম পালনার্থে, তখন মানুষের স্বার্থন্ধতা ও কার্পণ্য-কলুষতা দূর হয়ে যায় এবং তথায় ঐকান্তিকভাবে জেগে ওঠে আল্লাহ্নুগত্যের পরিচ্ছন্ন ভাবধারা।

এই যাকাত ব্যক্তির ধন-মালের পবিত্রতা বিধান করে তার ওপর আরোপিত অন্য লোকদের প্রাপ্য আদায় করে। কেননা আল্লাহ্র বান্দাহ্ হালাল রিযিক পেতে চায়। কিন্তু তার ধন-মালে অন্য লোকদের প্রাপ্য থেকে গেলে– তা দিয়ে না দিলে– সে মাল কখনোই হালাল ও পবিত্র হতে পারে না।

যাকাত সমাজ সমষ্টির জন্য ধার্যকৃত হক্ ব্যক্তির স্কন্ধে চেপে রয়েছে তার মাল থেকে আদায় করার জন্য। তা থেকে তার নিজের প্রয়োজন পূরণ করবে, সমাজের অন্যান্য দরিদ্র-অভাবগ্রস্থ্ লোকদেরও প্রয়োজন পূরণ করবে। ইসলাম প্রধানতঃ এভাবেই তার ফর্মূলা বা মৌলনীতি– ধন-মাল যেন কেবল তোমাদের ধনীলোকদের মধ্যেই আবর্তিত হতে না থাকে– কার্যকর করে। কেননা ইসলাম মানুষের দারিদ্র্য ও অভাবগ্রস্থতা পছন্দ করে না। প্রত্যেক ব্যক্তিই যাতে করে তার প্রয়োজন পূরণের ব্যবস্থা করতে পারে, তার নিশ্চয়তা বিধান করতে ইসলাম বদ্ধপরিকর। ব্যক্তি তা পাবে হয় নিজের উপার্জন ও আয়ত্তাধীন ধন-মাল থেকে, অথবা পাবে সমাজ সমষ্টির ধন-মাল থেকে, যেন তাতে কোনো ব্যত্যয় না ঘটে।

এ কারণে যাকাত ব্যক্তির অনুগ্রহের ব্যাপার বানানো হয়নি। কেননা সেরূপ অবস্থায় ব্যক্তি ভুলে গেলে বা দায়িত্ব এড়াতে চাইলে সমাজের দরিদ্র অভাবগ্রস্থ লোকেরা অন্যায়ভাবে কষ্ট ভোগ করতে বাধ্য হবে। এই কারণে ইসলাম যাকাতকে একটি সামষ্টিক– তথা রাষ্ট্রীয় কর্তব্য করে দিয়েছে। ব্যক্তি ভুলে গেলে বা কর্তব্যে অবহেলা দেখালে রাষ্ট্র সরকার তা আদায় করে ছাড়বে। কুরআন মজীদে রাষ্ট্র প্রধান হিসেবে রাসূলে করীম (স)-কে এই কারণেই স্পষ্ট ভাষায় নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ঃ

خُذْمِنْ اَمْوَا لِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُ هُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا - (التوبه : ١٠٣)

হে নবী! তুমি ধনীদের ধন-মাল থেকে যাকাত নিয়ে নাও। তা নিয়ে তুমি তাদের পবিত্র করবে এবং তদ্দ্বারা তাদের পরিচ্ছন্ন পরিশুদ্ধ করবে।

www.amarboi.org

ইজ্জুদ্দীন বলীক লিখেছেন ঃ এক ব্যক্তির দখলভুক্ত ধন-সম্পদের যখন একটি বছর পূর্ণ হয় এবং তার নিজের যাবতীয় প্রয়োজন পূরণের পরও উদ্বৃত্ত থাকে, তার ওপর একটা নির্দিষ্ট পরিমাণের মাল বের করে দেওয়া ফরয হয়। এই বের করাকে 'যাকাত' বলা হয়। এ কথাটি নগদ সম্পদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। তাতে প্রতি এক শতে আড়াই টাকা হিসেবে দিতে হবে। কর্মে অক্ষম লোকদের প্রয়োজন পূরণের জন্যে তা থেকে খাদ্য ও আশ্রয় ইত্যাদির ব্যবস্থাই বিধেয়, যার ফলে সামাজিক ন্যায়পরায়ণতা বাস্তবায়িত হবে, জাতীয় জীবনের মান হবে পার্থক্যহীন। আর 'যাকাত' সম্পর্কিত চিন্তার ভিত্তি হচ্ছে, সব মানুষই কাজ করতে পারে না, কর্মক্ষম সব মানুষও সব সময় কাজ পায় না। আর যারা কাজ পায়, তারাও কাজের বিনিময়ে পাওয়া মজুরির দ্বারা নিজেদের প্রয়োজন পুরামাত্রায় পূরণ করে জীবন ধারণ করতে পারে না। এরূপ অবস্থায় লোকদের নিকট উদ্বৃত্ত থাকা সম্পদ দিয়ে সেই লোকদের জরুরি ব্যয়াদি সম্পন্ন করা এ লোকদের একটা সুপরিজ্ঞাত হক্। সূরা মায়ারিজ এর ২৪ ও ২৫ আয়াতে সে কথাই বলা হয়েছে। যে ব্যক্তিই নির্দিষ্ট হিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হবে, তাকেই তা দিতে হবে। সে তা দিতে অস্বীকৃত হলে সরকার বল প্রয়োগের সাহায্যে তার নিকট থেকে তা গ্রহণ করবে।

ধনী লোকদের জন্যে ফরয হচ্ছে, তাদের নিজেদের স্থানের সব ফকীর-মিসকীনের প্রয়োজন পূরণের দায়িত্ব পালন করা। 'যাকাত' পরিমাণ দ্বারা সে প্রয়োজন পুরণ না হলে এবং মুসলিম জনগণের নিকট থেকে নেওয়া আরও ধন-সম্পদেও তা অপূরণ থেকে গেলে সকলকে সমান মানে জীবন-রক্ষা পরিমাণ খাদ্য খেয়ে ও পোশাক পরে বাঁচতে বাধ্য করতে হবে।

(منهاج الصالحين ص ٤٩٦ - ٥٩٧ - ٤٩٩)

ইসলামের দৃষ্টিতে যাবতীয় ধন-সম্পদ-সম্পত্তির প্রকৃত মালিক, স্বত্বাধিকারী ও ব্যয়ব্যবহারের বিধানদাতা একমাত্র আল্লাহ্। মানুষ যখন আল্লাহ্র প্রতি ঈমান আনে, তখন তার অর্থ হয়, তার গোটা সত্তা– শক্তি-সামর্থ্য, প্রতিভা-সম্পদ– সব কিছুই আল্লাহ্ নিকট কুরবানীকৃত, যদিও তা বান্দাহ্র নিজের আয়ত্তেই রয়ে গেছে। এক্ষণে তার কর্তব্য হচ্ছে সে নিজেকে এ সবরে 'মালিক' মনে করবে না, নিজেকে মনে করবে আল্লাহ্র মালিকানার আমানতদার ও রক্ষণাবেক্ষণকারী মাত্র। এখন তার কর্তব্য হচ্ছে, কেবলমাত্র আল্লাহ্র দেওয়া বিধান অনুযায়ী সে সবের ব্যয়-ব্যবহার ও প্রয়োগ বিনিয়োগ যথাযথভাবে করে যাওয়া ও তাতে নিজস্ব ইচ্ছা-বাসনা ও স্বার্থবোধ দ্বারা আদৌ চালিত না হওয়া। আর এটাই হচ্ছে মানুষের আসল পরীক্ষা। এ যে অত্যন্ত কঠিন পরীক্ষা এবং তাতে উত্তীর্ণ হওয়া যে খুবই দুষ্কর, তাতে সন্দেহ নেই। ধন-সম্পদ নিজের আয়ত্তে, অথচ বলা হচ্ছে যে– তুমি এ সবের মালিক নও, নিজের ইচ্ছামতো ব্যয়-ব্যবহার করতে পারো না। যদিও

www.amarboi.org

এ ঘোষণা শোনা ও মেনে নেওয়াই হচ্ছে আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমানের আসল দাবি ও তাৎপর্য– যে সত্যিকার ঈমানদার। যার মনে আল্লাহ্‌র ভয় আছে, কেবল তার পক্ষেই এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া সম্ভব।

আল্লাহ তা'আলা যাবতীয় সম্পদ-সম্পত্তির একচ্ছত্র স্বত্বাধিকারী হয়েও সব কিছু মানুষের হাতে রেখে দিয়েছেন। আর সেই সাথে দিয়েছেন ব্যয়-ব্যবহার ও প্রয়োগ-বিনিময়ের সর্বাত্মক ও পূর্ণাঙ্গ বিধান। অতঃপর এ বিধানই এক্ষেত্রে একমাত্র নিয়ামক ও নিয়ন্ত্রক। অর্থনৈতিক যাবতীয় তৎপরতা সে বিধান অনুযায়ী চলতে হবে। তার মূলে থাকবে আল্লাহ্‌র ভয় যেন তাঁর বিধান এক বিন্দুও লংঘিত না হয় এবং একমাত্র লক্ষ্যরূপে থাকবে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জন, যেন নিজের ইচ্ছা বা সন্তুষ্টি এক্ষেত্রে কখনোই প্রদান ও প্রবল হয়ে উঠতে না পারে।

সমস্ত মানুষই আল্লাহ্‌র পরিবার।[১] নির্বিশেষে সকল প্রাণী ও জীবের যাবতীয় প্রয়োজন পূরণের দায়িত্ব তিনি নিজেই গ্রহণ করেছেন। সে কারণে তিনি এক দিকে মানুষকে দিয়েছেন কর্মক্ষমতা ও উৎপাদন উদ্ভাবন ও উপার্জনের শক্তি ও প্রতিভা। আর অপর দিকে গোটা বিশ্ব-প্রকৃতিকে বানিয়েছেন রিযিকের অফুরন্ত ভাণ্ডার। মানুষ স্বীয় শক্তি-সামর্থ্য ও প্রতিভার প্রয়োগ করে উৎপাদন ও উপার্জন করবে। তার ফসল থেকে নিজের ও তার পরিবারভুক্ত লোকদের প্রয়োজন পূরণ করবে। উপার্জনে অক্ষম বা প্রয়োজন পরিমাণ উপার্জনে অসমর্থ লোকদের প্রয়োজন পূরণ করার দায়িত্বও তাদেরই ওপর অর্পিত। আর এজন্য এক স্থায়ী ব্যবস্থা হিসেবে 'যাকাত'কে বিধিবদ্ধ করা হয়েছে। এর মাধ্যমে মানুষ একই সাথে আল্লাহ্‌র বন্দেগী ও হক্ আদায়ের কাজ এবং দরিদ্র জনগণের প্রতি মানবিক কর্তব্য পালন করতে পারে। 'যাকাত' দানে এক দিকে দাতার নফ্স পবিত্র এ পরিশুদ্ধ হতে পারে। অপর দিকে সে দুঃখী নিঃস্ব মানুষের জন্যে নিজেকে দায়িত্বশীল মনে করতে পারে। বস্তুত 'যাকাত' কোনো সরকার কর্তৃক ধার্যকৃত কোনো 'কর' বা ট্যাক্স নয়। 'যাকাত'-এর ভাবধারায় একবিন্দু 'কর'-ও পাওয়া যাবে না। যাকাত একটি 'ইবাদত'। কর কোনো দিক দিয়েই ইবাদতের পর্যায়ে পড়ে না।[২]

---

১. রাসূল করীম (স) বলেছেন ঃ اَلْخَلْقُ عِيَالُ اللهِ –'সমগ্র সৃষ্টি আল্লাহ্‌র পরিবার।'

২. 'যাকাত' আল্লাহ্ ও বান্দাহ্‌র মধ্যকার সম্পর্ক সঠিক রূপে স্থাপন করে। তাকে সুদৃঢ় করে বান্দাহ্‌র বন্দেগীর ও আল্লাহ্‌র মালিকত্ব ও মা'বুদিয়াত স্বীকৃত ও প্রতিষ্ঠিত হয়। 'কর' সেরূপ নয়। কর আরোপ সরকারের প্রতি বিদ্রোহ জাগায়। আর 'যাকাত' আল্লাহ্‌র প্রতি অকৃত্রিম নিষ্ঠা ও আনুগত্যের পবিত্র ভাবধারার সৃষ্টি করে।

www.amarboi.org

আল্লামা আলাউদ্দীন আলী ইবনে মুহাম্মাদ আল-বাগদাদী লিখেছেন ঃ

ধনশালী লোকদের ওপর যাকাত ফরয হওয়া এবং দরিদ্রদের মধ্যে তা বন্টন বিতরণের বিধান করার মূলে কয়েকটি কারণ নিহিত রয়েছে। প্রথম, ধন-মাল স্বাভাবতঃ অত্যন্ত প্রিয়, কেননা শক্তি-সামর্থ্য ও ক্ষমতা ব্যক্তির পূর্ণত্বের গুণাবলীর অন্যতম। তা মানুষের নিকট স্বতঃই লোভনীয়, আকর্ষণীয়। ধন-মাল হচ্ছে সেই শক্তি-ক্ষমতা লাভের প্রধানতম উপায়। আর এই ধন-মাল মানুষের নিকট প্রিয়তর জিনিস। মানুষের অন্তর যখন এই ধন-মালের প্রেমে মশগুল হয়ে যায় তখন তা একদিকে আল্লাহ্‌র মহাব্বত শূন্য হয়ে পড়ে, অপর দিকে আল্লাহ্‌র নৈকট্য বিধানকারী ইবাদত-বন্দেগীর প্রতিও অমনোযোগী ও অনাগ্রহী হয়ে পড়ে। এই প্রেক্ষিতে মহান আল্লাহ্‌র সূক্ষ্ম বিবেচনা সেই ধন-মালে যাকাত ফরয করার প্রয়োজন মনে করল, যা বান্দাহ ও আল্লাহ্‌র মধ্যে দূরত্ব সৃষ্টির সমূহ কারণ হয়ে দেখা দিয়েছে। ফলে এই যাকাত আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের প্রধান মাধ্যম হয়ে দাঁড়াতে পারছে।

দ্বিতীয় কারণ, ধন-মালের আধিক্য ও প্রাচুর্য ব্যক্তির হৃদয়-মনকে প্রস্তরবৎ নির্মম কঠিন বানিয়ে দেয়। দুনিয়া প্রেম মানুষকে পাগল করে তোলে। দুনিয়ার স্বাদ-আস্বাদনে নিয়ত মশগুল হয়ে থাকতে ও লালসা চরিতার্থ করতে উদ্বুদ্ধ করে। এই প্রেক্ষিতে আল্লাহ যাকাত ফরয করেছেন, তাতে কিছু না কিছু পরিমাণ ধন-মাল হ্রাস পায়। তাতে মানব মনের নির্দয়তা কমে আসবে বলে আশা করা যায়।

যাকাত ফরয হওয়ার তৃতীয় কারণ, মুমিন বান্দাহ্‌র হৃদয়-মনকে পরীক্ষা করা। কেননা দৈহিক ইবাদত বান্দাহ্‌র দেহের ওপর যতই কষ্টকর, যাকাত দেওয়ার জন্যে হিসাব করে ধন-মালের অংশ বের করা ও দিয়ে দেওয়া বান্দাহর মনের পক্ষে অত্যন্ত দুঃসহ ও অধিকতর কষ্টদায়ক। এ রূপ ব্যক্তির ধন-মালে যাকাত ফরয করে আল্লাহ তার মনকে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জন ও সে জন্য মানসিক কষ্ট ভোগ করতে অভ্যস্ত করাই হচ্ছে আল্লাহ্‌র ইচ্ছা। তাতে কে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি চায়, কে চায়না, কে আল্লাহ্‌র নির্দেশ পালনের জন্য প্রস্তুত, কে নয়, তা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। সমাজের সমক্ষে প্রত্যেকেই স্বীয় চরিত্রে প্রতিভাত হয়ে ওঠে।

চতুর্থ কারণ হচ্ছে, আসল কথা, যাবতীয় ধন-মাল ও অর্থ-সম্পদের আসল মালিক যেহেতু আল্লাহ, ধনীরা হচ্ছে আল্লাহ নিয়োজিত খাজাঞ্চি (ক্যাশিয়ার) মাত্র। আর দরিদ্র্য ব্যক্তিরা– যারা যাকাত পাওয়ার অধিকারী– হচ্ছে আল্লাহ্‌র পরিবার। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর খাজাঞ্চিদের (ধনীদের) নির্দেশ দিয়েছেন, তাদের নিকট রক্ষিত ধন-মালের আল্লাহ নির্ধারিত হার অনুযায়ী অংশ তাঁর (আল্লাহ) পরিবারের লোকদের দিয়ে দেওয়ার জন্য আল্লাহ্‌র খাজাঞ্চিরা– ধনীরা আল্লাহ্‌র নির্দেশ অনুযায়ী তাদের নিকট রক্ষিত আল্লাহর মাল দিলে তার অন্তর আল্লাহর

www.amarboi.org

অনুগত প্রমাণিত হতে পারবে, অর্পিত দায়িত্ব পালনকারী রূপে আল্লাহ্‌র নিকট থেকে শুভ ফল লাভ করার অধিকারী হবে। আর যারা আল্লাহ্‌র নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করবেনা, তারা আল্লাহ্‌র না-ফরমানরূপে চিহ্নিত হবে এবং সেজন্য তারা কঠোর-কঠিন শাস্তির যোগ্য সাব্যস্ত হবে। এই পর্যায়ে হাদীস বর্ণিত হয়েছে, হযরত আবূ মূসা আল-আশয়ারী (রা) বর্ণনা করেছেন, রাসূল করীম (স) বলেছেন ঃ

اِنَّ لْخَازِنَ الْمُسْلِمَ الْاَمِيْنَ الَّذِىْ يَنْفِذُ دَرُبَّمَا قَالَ يَعْطِىْ مَا اُمِرَبِهِ فَيُعْطِيْهِ كَامِلاً مُوَفَّرًا طَيِّبَةٌ بِهِ نَفْسُهُ فَيَدْ فَعُهُ اِلَى الَّذِىْ اَمِرَلَهُ بِهِ اَحَدُ الْمُتَصَدِّقِيْنَ -

মুসলিম আমানতদার খাজাঞ্চি হচ্ছে সে, যে কার্যকর করে বা (কখনও বলেছেন) দেয় যা দিতে তাকে আদেশ করা হয়েছে, তখন সে পূর্ণ মাত্রায় দিয়ে দেয় একটু কমতি ছাড়া, দেয় মনের সন্তুষ্টি সহকারে, তখন সে তা দেয় যাকে দেওয়ার জন্যে একজন যাকাত দানকারী ব্যক্তি আদিষ্ট হয়েছে।

পঞ্চম কারণ, ধনীদের নিকট রক্ষিত ধন-মালের প্রতি দরিদ্রদের মন থাকে (তাদের অভাব ও প্রয়োজনের কারণেও), তাই আল্লাহ্ তাদের অন্তরের সান্ত্বনা (ও তাদের অভাব মোচন ও প্রয়োজন পূরণ) স্বরূপ সেই মালের একটা অংশ তাদের জন্য নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন।

আর ষষ্ঠ কারণ হলো, ব্যক্তির মৌলিক প্রয়োজনের অতিরিক্ত ও উদ্বৃত্ত ধন-মাল আটক করে রাখা হলে তা বেকার পড়ে থাকে। যে উদ্দেশ্যে আল্লাহ্ ধন-মাল সৃষ্টি করেছেন, সে উদ্দেশ্য পূরণে নিয়োগ হতে পারে না। এই কারণে দরিদ্রদের যাকাত দিতে বলা হয়েছে। ফলে তা মানুষের প্রয়োজন পূরণে ব্যবহৃত হতে পারে। সম্পূর্ণ বেকার পড়ে থাকা থেকে রক্ষা পায়।

অর্থনৈতিক দৃষ্টিতে যাকাত-এর মূল্যায়ন

'যাকাত' ইসলামের দ্বীনী ব্যবস্থার একটা অন্যতম প্রধান অংশ। কিন্তু তা সত্ত্বেও তার অর্থনৈতিক মূল্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অর্থনৈতিক দৃষ্টিতে ধন-সম্পদের পুঞ্জীভূতকরণ একটি বড় অপরাধ। তার ব্যাপক ব্যয়-ব্যবহার ও বিনিয়োগই হচ্ছে তার জন্যে স্বাভাবিক ব্যবস্থা। 'যাকাত' এ ব্যবস্থার বাস্তব সাংগঠনিক পদ্ধতি। 'যাকাত' সম্পদ পুঞ্জীভূতকরণের প্রধান প্রতিরোধক। জাতীয় কল্যাণে তা বিনিয়োগ করা না হলে যাকাত পুঁজিকে খেয়ে নিঃশেষ করে দেবে। ফলে 'যাকাত' মূলধনকে দ্রবীভূত, সচল-সক্রিয় ও মুনাফা আহরণে বিনিয়োগকৃত বানায়। আর মূলধনের চিরন্তন আবর্তন মানবদেহে রক্তের অব্যাহত চলাচলের ন্যায় সমাজদেহে সুস্থতা

www.amarboi.org

ও সচ্ছলতার বিধায়ক। মূলধনের মুনাফা লাভের নিজস্ব কোনো ক্ষমতা নেই। সে ক্ষমতা কার্যকর হয় কেবলমাত্র বিনিয়োগের মাধ্যমে। আর বিনিয়োগের ব্যাপকতা বেকারত্ব দূরীকরণের প্রধান হাতিয়ার এবং তা-ই নিয়ে আসে সার্বিক স্বাচ্ছন্দ্য ও সচ্ছলতা; যদিও বিনিয়োগে ক্ষতির আশংকাও নগণ্য নয়। মূলধন পর্যায়ে ইসলামের এ দৃষ্টিকোণ পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্র উভয় থেকেই স্বতন্ত্র ও ভিন্নতর। পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্র উভয়ই পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থা। পার্থক্য শুধু এতটুকু যে, পুঁজি-বাদে ব্যক্তিগত পুঁজির প্রাধান্য আর সমাজতন্ত্রে রাষ্ট্রীয় পুঁজিতন্ত্রের সর্বগ্রাসিতা। এই পর্যায়ে কুরআন মজীদের দুটি আয়াত স্মরণীয়। সূরা তওবার ৩৪ নম্বর আয়াত।

وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنْفِقُوْنَهَا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ۝

আর যারাই স্বর্ণ ও রৌপ্য (নগদ সম্পদ) পুঞ্জীভূত করে রাখে এবং তা আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় ও বিনিয়োগ করে না, তাদের মহাপীড়াদায়ক আযাবের সুসংবাদ দাও।

আর দ্বিতীয় আয়াত সূরা আল-হাশরের ঃ

كَىْ لاَ يَكُوْنَ دُوْلَةً م بَيْنَ الْاَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ -

ধন-সম্পদ যথাযথভাবে বণ্টন করতে হবে যেন তা তোমাদের ধনী লোকদের মধ্যে সীমিত ও আবর্তিত সম্পদে পরিণত হয়ে না থাকে। (আয়াত ঃ ৭)

এ দুটি আয়াতই সম্পদ বিতরণ, মূলধনের বিস্তার সাধন এবং ব্যাপকভাবে জনগণের মধ্যে আবর্তিত করার মৌলনীতি রূপে গণ্য।

দারিদ্র্য সমস্যার সমাধানে যাকাত-এর ভূমিকা

দারিদ্র্য সমস্যার সমাধানে 'যাকাত'-এর ভূমিকা ও অবদান বিশেষভাবে বিবেচ্য ও আলোচ্য। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি সাধনে যে-কোনো কালে যে-কোনো সমাজে যে কোনো ধরনের কলা-কৌশল অবলম্বিত হোক না কেন, তা সাধারণ মানুষের দারিদ্র্য সমস্যার সমাধানে কখনোই সফল হতে পারবে না। বিশেষ করে মুসলমান জনগণের দারিদ্র্য সমস্যার কোনো সমাধানই আজ পর্যন্ত অন্য কোনো আদর্শ বা প্রক্রিয়া দ্বারাই করা সম্ভব হয়নি। পুঁজিবাদী অর্থনীতি অনুসরণ করেও নয়, সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেও নয়। বর্তমান অর্থনীতির ক্ষেত্রে জাতীয় সম্পদে বেশি বেশি প্রবৃদ্ধি অর্জনকেই এ সমস্যার panacea– 'সর্বরোগ নিবারক' বলে মনে করা হচ্ছে। বিশ্বব্যাংক ও 'ইনস্টিটিউট অব ডেভেলপমেন্ট এ্যাণ্ড এ্যাকাডেমিক

www.amarboi.org

ইনস্টিটিউশন'গুলো নীতিগত ও বাস্তবতার দৃষ্টিতে দারিদ্র্য সমস্যার সমাধান করার জন্যে বিস্তারিত আলোচনা করে খুব বেশি বেশি অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি সহ বহু ধরনের ও রকমের কর্মকৌশল গ্রহণের প্রস্তাব উপস্থাপিত করেছে। কিন্তু তার সবগুলোই ব্যর্থ ও অর্থহীন প্রমাণিত হয়েছে।

বস্তুত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি জনগণকে খুব সামান্য ফায়দা-ই দিতে পারে বা দিয়েছে। উন্নয়নশীল দেশগুলোতে তার ফলে গড়পড়তা হিসেবে মাথাপিছু আয় ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে– তা অস্বীকার করা হচ্ছে না। বিগত দশ বছরে তা শতকরা পঞ্চাশ ভাগেরও বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু সেই সাথে বিভিন্ন ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর মধ্যে এবং ধনী ও দরিদ্রের মধ্যেকার পার্থক্য পূর্বের তুলনায় অনেক অনেক বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে। উক্ত মতের লোকেরা তা স্বীকার না করলেও তা এক বাস্তব সত্য।

এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও তার বিপুল মুনাফা সত্ত্বেও আয়ের ভারসাম্যপূর্ণ বন্টনের (Balanced distribution of wealth) ব্যাপারে কোনো অবদানই রাখতে পারেনি। বরং সত্যি কথা হচ্ছে, এ সবের ফল বিপরীত হয়েছে। এতে বিরাট জাতীয় আয় খুবই অল্পসংখ্যক লোকের মুষ্ঠির মধ্যে কেন্দ্রীভূত হয়ে পড়েছে।[১]

এ ধরনের প্রবৃদ্ধি দারিদ্র্য সমস্যাকে আরও জটিল ও দুঃসমাধ্য বানিয়ে দিয়েছে। কেননা যে সব ব্যবস্থাপনা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি সৃষ্টি করে, তা-ই অর্থনৈতিক এককেন্দ্রিকতা (Concentration) বৃদ্ধি করে এবং সাধারণ মানুষের দারিদ্র্য ও আর্থিক চরম দুরবস্থাকে সুদৃঢ় করে– ললাট-লিখন বানিয়ে দেয়। একথা অর্থনীতিবিদদের ভালো করেই জানা আছে। তাই এ কথায় কোনোই সন্দেহ থাকতে পারে না যে, জাতীয় পর্যায়ে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সাথে দারিদ্র্য সমস্যার সমাধানের দূরতম কোনো সম্পর্ক নেই। দারিদ্র্য সমস্যার কোনো সমাধানই এসব উপায়ে কোনোদিনই পাওয়া যাবে না। সে জন্যে ভিন্নতর পন্থা উদ্ভাবন বা গ্রহণ একান্তই অপরিহার্য।

দারিদ্র্য সমস্যার সমাধানের লক্ষ্যে আরও যে সব উপায় অবলম্বিত হয়েছে। তার মধ্যে G.N.P. Maximization ও এর ফলে employment বেশিকরণ বেশি বেশি ঋণ বিতরণ, ভোগ্যপণ্যের মূল্যহ্রাস করণ, রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের

---

১. বাংলাদেশের মত পৃথিবীর দরিদ্রতম দেশসমূহের নিম্নস্তরে অবস্থিত দেশেরও বিগত দশ বছরে বহু সংখ্যক লোক কোটি কোটি টাকার মালিক হয়ে বসেছে। আর অপর দিকে রয়েছে কোটি কোটি না খাওয়া বস্ত্রহীন আশ্রয়হীন লোক। একথা চিন্তা করলেও কলিজা কেঁপে ওঠে।

www.amarboi.org

মাধ্যমে কৃষি জমি ও শিল্প কারখানা দরিদ্র শ্রেণীর নিকট হস্তান্তরকরণ ইত্যাদি। কিন্তু এর কোনো একটিও কার্যত সফল হয়নি।

আমাদের বিবেচনায় এ উদ্দেশ্যে 'যাকাত'ই হচ্ছে সর্বোত্তম ব্যবস্থা। পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্র– দুটি প্রান্তিক পর্যায়ের শোষণ ও বঞ্চনামূলক অর্থ ব্যবস্থার মাঝখানে ইসলাম মধ্যপথ ও বাস্তববাদী সমাধান পেশ করেছে। ইসলাম উদ্বৃত্ত অর্থ ও সম্পদের অধিকারী প্রত্যেক বক্তির ওপরই যাকাত ধার্য করেছে। তা ফরয, একান্তই বাধ্যতামূলক। দারিদ্র্য সমস্যার সমাধানে এ 'যাকাত'-এর ভূমিকা অত্যন্ত বিস্ময়কর। এরই ফলে উদ্বৃত্ত সম্পদের একটা বিরাট অংশ প্রতি বছর নিয়মিতভাবে সরাসরি দরিদ্রজনদের হাতে চলে যায়। এর মাধ্যমে দরিদ্র অক্ষম অভাবগ্রস্থ লোকদের পূর্ণ অর্থনৈতিক নিরাপত্তা দানের ব্যবস্থা করা যায়। সে সাথে তাদের জীবনমান উন্নীত করা এবং সর্বপ্রকার শোষণ থেকে তাদের মুক্ত করাও সম্ভবপর। এর ফলে সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। ফলে কৃষি ও শিল্পে নতুন জীবনের সঞ্চার হওয়া অবশ্যম্ভাবী হয়। আর সাধারণ জাতীয় অর্থনীতিতে কৃষি ও শিল্পে নিত্য-নতুন তৎপরতাই তো কাম্য হয়ে থাকে। এরূপ অবস্থায় নিত্য-নৈমিত্তিক কাজে ব্যয় করার জন্যে স্বতন্ত্রভাবে সুদভিত্তিক ঋণ দেওয়ার কোনো প্রয়োজনই থাকবে না। বরং ঋণগ্রস্থ লোকেরা যাকাত-এর অংশ পেয়ে ঋণ ফেরত দিতে সক্ষম হবে। অতঃপর এ অর্থ শিল্প বা কৃষির উৎপাদনে ও উন্নয়নে মূলধন হিসাবে বিনিয়োগ করা সম্ভব হবে।

জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা ও 'যাকাত'

এ প্রেক্ষিতে জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নও বিবেচ্য। অর্থনৈতিক উন্নয়ন অবশ্যই কাম্য। কিন্তু তা কখনোই বিচ্ছিন্ন ও একক বা একদেশদর্শীভাবে হতে পারে না। সে সাথে মানুষের সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সব দিকের উন্নয়নও অবশ্যই সামনে রাখতে হবে। আধুনিক পুঁজিবাদী ও সমাজতান্ত্রিক সমাজে একদেশদর্শী উন্নয়ন প্রচেষ্টা সর্বতোভাবে ব্যর্থ হয়েছে। মনুষকে বাদ দিয়ে মানুষের অর্থনৈতিক উন্নয়ন চাওয়া হয়েছে। ফলে অর্থনৈতিক চাক্‌চিক্য যত না দেখা গেছে, মানুষের তথা মনুষ্যত্বের পতন হয়েছে তার তুলনায় অনেক বেশি ও দ্রুতগতিতে। আর মনুষ্যত্বের পতন অর্থনৈতিক উন্নয়নকেও নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। দুর্নীতি তথা আত্মসাত ও চুরি-ডাকাতির মাধ্যমে শত শত নয় হাজার হাজার কোটি টাকা হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার ব্যাপারটি আমাদের দেশে তো পান্তা ভাতের ন্যায় স্বাভাবিক হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ সব দেখে-ও কি শাসন কর্তৃপক্ষের বোধগম্য হবে

www.amarboi.org

না যে, অর্থনৈতিক উন্নতি আর দুর্নীতি শোষণমুক্তি ওভাবে কখনোই সম্ভব হবে না, যেভাবে করার কথা জোরগলায় বলা হচ্ছে। যেটাকে অর্থনীতি বলা হচ্ছে, তা আসলে নিছক অর্থনীতি নয়, মানবনীতির সাথে তা রক্তমাংসের মতো ওতোপ্রোত জড়িত; মানুষ থেকে তাকে কখনোই বিচ্ছিন্ন করা যেতে পারে না। তাই সার্বিক ও সর্বাত্মক উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ একান্তই অপরিহার্য। ইসলামে অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূলে নিহিত রয়েছে ব্যক্তি ও সমষ্টির উন্নয়ন। ইট পুড়িয়ে পাকা না করা হলে তা দিয়ে পাকা প্রাসাদ নির্মাণ করা যায় না। এটা বিজ্ঞান সম্মত কথা যেমন ইসলামেরও নীতি তাই। ব্যক্তি ও সমষ্টির উন্নয়নের ইসলামী ভিত্তি হচ্ছে চারটি ঃ তওহীদ, রবুবিয়াত, খিলাফত ও তায্‌কীয়া। এ চারটি মৌল নীতির ওপর ভিত্তি করে যে উন্নয়ন প্রচেষ্টা চালানো হবে, তা সব দিক দিয়ে একসাথে ও ভারসাম্যপূর্ণ ভাবে মানুষের উন্নয়ন সাধন করবে।

আর এ চারটির মধ্যে প্রথম ও প্রধান হচ্ছে তায্‌কীয়া অর্থাৎ যাকাত। এ উন্নয়ন প্রকল্প মূল্যমানভিত্তিক এবং মানুষই হচ্ছে এ উন্নয়ন প্রক্রিয়ার কেন্দ্রবিন্দু।

www.amarboi.org

ইসলামী অর্থনীতিতে 'ওশর' ও 'খারাজ'

ওশর শব্দের ব্যাখ্যা

عشر (ওশরুন) عشي — ('আশীরুন) ঃ কোনো জিনিসকে সমান দশটি ভাগে বিভক্ত করা হলে তার একটি ভাগকে عشر 'ওশর' বলা হয়। অর্থাৎ এক-দশমাংশ। এরই সমার্থবোধক শব্দ معشار কুরআন মজীদে ব্যবহৃত হয়েছে। বলা হয়েছে وَمَا بَلَغُوْا مِعْشَارَ مَآ اٰتَيْنٰهُمْ (سبا : ٤٥) 'আমরা যা কিছু ওদেরকে দিয়েছি, তার দশ ভাগের এক ভাগ পর্যন্তও ওরা পৌঁছায় নাই।'

'লিসানুল আরব' গ্রন্থে বলা হয়েছে ঃ عشر القوم বা عشر القوم এর অর্থ اخذ عشر اموالهم 'তাদের ধন-মালের এক-দশমাংশ নিয়ে নেওয়া।

প্রাচীন আরবে জালিম শাসকরা জনগণের নিকট থেকে যে সব অত্যাচারমূলক 'কর' আদায় করত, তাকে সাধারণত عشور (আশূর) বলা হতো। একটি হাদীসে বলা হয়েছে اَلْحمدوا الله اذ رفع عنكم العشور 'তোমরা আল্লাহ্র হাম্‌দ করো। কেননা তিনি তোমাদের ওপর থেকে অত্যাচারমূলক কর আশূর দেওয়ার বাধ্যবাধকতা দূর করে দিয়েছেন।'

'আশূর' বলতে কি বোঝায়, তার ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে ঃ ماكانت الملوك تاخذه منهم 'অত্যাচারী রাজা-বাদশাহগণ লোকদের নিকট থেকে যা জোরপূর্বক আদায় করে নিত, তা-ই 'আশূর'।

এ জন্যে রাসূলে করীম (স) বলেছিলেন ঃ

اذ لقيتم عاشرا فاقتلوه اى ان وجتم من ياخذ العشر على ماكان ياخذ اهل الجاهلية مقيما على دينه فاقتلوه لكفره -

'তোমরা যদি 'আশূর' আদায়কারী লোক পাও, তবে তাকে হত্যা করো।' অর্থাৎ জাহিলিয়াতের যুগে জনগণের নিকট থেকে যে অত্যাচারমূলক কর আদায় করা হতো, এখনো (এই ইসলামী যুগেও) যদি কেউ নিজের পূর্বকালীন ধর্মের অনুসারী থেকে তোমাদের কাছে সেরূপ কর-এর দাবি করে, তাহলে

www.amarboi.org

তাকে হত্যা করো। কেননা সে তার কাফেরী ধর্মের অনুসারী হয়ে আছে এবং অত্যাচারমূলক 'কর' আদায় করতে চাচ্ছে।[১]

এ থেকে সুস্পষ্ট হয় যে, দ্বীন-ইসলাম মানুষকে যেমন জাহিলী ধর্মমত শির্‌ক ও কুফর থেকে মুক্তি দিয়েছে, তেমনি অত্যাচারমূলক বিবিধ প্রকারের কর-এর দুর্বহ চাপ থেকেও নিষ্কৃতি দিয়েছে। ইসলামী যুগে অত্যাচারমূলক কর আদায়ের কোনো অবকাশ থাকতে পারে না। যদি কেউ তা করতে ইচ্ছা করে, তা হলে তার মৃত্যুদণ্ড হওয়াই ইসলামী আইনের দাবি।

কিন্তু তাই বলে ইসলামী রাষ্ট্রে কোনোরূপ 'কর' আদায় করা হবে না, তা নয়। কর নিশ্চয়ই আদায় করা হবে। তবে তা অবশ্যই অত্যাচারমূলক হবে না। 'ওশর' বা 'খারাজ' ইসলামী রাষ্ট্র-সরকার কর্তৃক ধার্যকৃত ভূমিকর। এ দুটি শব্দ ইসলামী শরীয়তের দুটি পরিভাষা বিশেষ। মুসলিম নাগরিকদের জমির ফসলের ওপর ভূমি-কর হিসাবে 'ওশর' ধার্য হয়। 'ওশর' ধার্য হওয়ার জন্যে জমি-মালিকের মুসলিম হওয়া জরুরী শর্ত। অমুসলিম ব্যক্তির জমির ফসলে তা প্রথমেই ধার্য হতে পারে না। মুসলিম ব্যক্তির জমির ফসলে তা ধার্য হয় আল্লাহ্‌র হক্ হিসেবে। এজন্যে তাতে ইবাদতের ভাবধারা নিহিত। আর সরকার কর্তৃক তা কার্যকর হয় বলে তা এক হিসেবে ভূমি কর।[২]

কুরআনে ঘোষিত আল্লাহ্‌র হক্

কুরআন মজীদ আল্লাহ তা'আলার কালাম। বিশ্বমানবের জন্যে তাঁরই দেওয়া পূর্ণাঙ্গ বিধান। কুরআন যে রাষ্ট্র ব্যবস্থা উপস্থাপিত করেছে, তাতে যেমন সার্বভৌমত্ব রাষ্ট্রীয় সর্বোচ্চ নিরংকুশ কর্তৃত্ব একমাত্র আল্লাহ্‌র জন্যেই নির্দিষ্ট, সংরক্ষিত; তেমনি দুনিয়ার যাবতীয় বিত্ত-সম্পত্তিরও প্রকৃত মালিক একমাত্র আল্লাহ্‌ই। অতঃপর মানুষের আয়ত্তাধীন বিত্তসম্পত্তি ও ধন-সম্পদের ওপর কেবলমাত্র আল্লাহ্‌র 'হক্'ই ধার্য হতে পারে এবং আল্লাহ্‌র বিধান মতোই সম্পত্তি দখলদার ও অন্যান্যের 'হক' ধার্য হবে।

দুনিয়ার সমস্ত বিত্ত-সম্পত্তি যে মৌলিকভাবে একমাত্র আল্লাহ্‌র মালিকানাধীন, কুরআন মজীদে তা নানাভাবে ও নানা ব্যাখ্যায় অত্যন্ত বলিষ্ঠভাবে ঘোষণা করা হয়েছে। একটি আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

---

১. দায়েরাতুল মা'আরিফ (উর্দূ) ১৩ শ খণ্ড, পৃ. ৩৪৭

২. অদায়েওস্‌সানায়েও, আল-কাসানী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৪

www.amarboi.org

وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ -

জমিন ও আসমানের (অর্থাৎ সমগ্র বিশ্বলোকের) মালিকানা একমাত্র আল্লাহ্‌রই। এই আল্লাহ্‌ই সর্ব জিনিসের ওপর মহাশক্তিমান। (সূরা আলে ইমরান ঃ ১৮৯)

ইরশাদ হয়েছে ঃ

اللّٰهُمَّ مٰلِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِى الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ

হে আমাদের আল্লাহ! তুমিই সমস্ত রাজ্য-সাম্রাজ্যের একমাত্র মালিক। তুমি যাকে চাও, রাজ্য (বা মালিকানা) দান করো। আর যার কাছ থেকে ইচ্ছা, তুমিই তা কেড়ে নাও। (সূরা আলে-ইমরান ঃ ২৬)

অতএব দুনিয়ার যাবতীয় ধন-সম্পত্তি ও রাজ্য-শাসনদণ্ডের ওপর একমাত্র নিরংকুশ মালিক আল্লাহ্‌রই মালিকত্ব ও কর্তৃত্ব চলবে; অন্য কারুরই নয়। আর আল্লাহ্ তাঁর এই যে অধিকার সবকিছুর ওপর প্রবর্তিত করেছেন, যে জিনিসের ওপর আল্লাহ্‌র যে হক্‌ই তিনি নিজে ধার্য করেছেন, তাতে একবিন্দু অযৌক্তিকতা বা জুলুমের স্থান নেই। কেননা ঃ

وَاَنَّ اللّٰهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْدِ

এবং আল্লাহ তাঁর বান্দার ওপর নিশ্চয়ই জুলুমকার নন।

(সূরা আলে ইমরান ঃ ১৮২)

অতঃপর আমরা দেখব, আল্লাহ্ তা'আলার হক্ সম্পর্কে বিশেষ করে আল্লাহ্‌র দেওয়া বিত্ত-সম্পত্তি ও বিত্ত-সম্পত্তিজাত ধন-সম্পদ সম্পর্কে কুরআন মজীদ আমাদের জন্য কি বিধান দিচ্ছে?

এ পর্যায়ে সর্বপ্রথম আমরা পড়ব সূরা আল-বাকারার ২৬৭ আয়াত। এরশাদ হয়েছে ঃ

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْاۤ اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّاۤ اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ وَلَاتَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَلَسْتُمْ بِاٰخِذِيْهِ اِلَّاۤ اَنْ تُغْمِضُوْا فِيْهِ وَاعْلَمُوْاۤ اَنَّ اللّٰهَ غَنِىٌّ حَمِيْدٌ ۝

হে ঈমানদার লোকেরা! তোমাদের পবিত্র উপার্জন থেকে ব্যয় করো এবং তোমাদের জন্য জমি থেকে আমরা যা কিছু উৎপাদন করি, তা থেকে ব্যয় করো এবং তোমাদের এই ব্যয়করণে তার মধ্য থেকে নিকৃষ্ট জিনিসের দিকে

www.amarboi.org

লক্ষ্য নিবদ্ধ করো না; কেননা অবস্থা এই যে, তোমরা নিজেরাই তার প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন ছাড়া তা কখনোই গ্রহণ করবে না। তোমরা অবশ্যই জানবে, আল্লাহ্ স্বতঃই অভাবমুক্ত, প্রশংসিত।

আয়াতটির মোটামুটি বক্তব্য হচ্ছে, ঈমানদার লোকদের উপার্জন অবশ্যই পবিত্র এবং হালাল হতে হবে। সে উপার্জন দু' প্রকারের। এক; দৈহিক শ্রম, ব্যবসা-বাণিজ্য ও অন্যান্য উপায়ে যা কিছু উপার্জন করে। আর দ্বিতীয় হচ্ছে, আল্লাহ্ জমির ফসল হিসাবে যা কিছু দান করেন। জমির ফসল লাভেও মানুষের শ্রম অপরিহার্য– এতে সন্দেহ নেই। কিন্তু তা শুধু শ্রম নিয়োগ করেই লাভ করা যায় না। এমনও হতে পারে যে, মানুষ হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করে জমিতে বীজ বপন করল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ফসল ফলল না অথবা ফসল ফলল; কিন্তু তা পোকায় খেয়ে ফেলল কিংবা বন্যায় ভেসে গেল। বীজ দীর্ণ করে অংকুরোদ্গম হওয়া ও ফসল ধরা একান্তভাবে আল্লাহ্র কুদরত ও মেহেরবানীর ব্যাপার। সেজন্যে এ আয়াতে জমির ফসলকে বিশেষভাবে 'আল্লাহ্র উৎপাদন' বলা হয়েছে। এ দু' প্রকারের উৎপাদন থেকেই আল্লাহ্র নির্দেশ অনুযায়ী ব্যয় করতে হবে ঈমানদার ব্যক্তিদেরকে।

উপার্জন হালাল হতে হবে এবং হালাল উপার্জন থেকেই আল্লাহ্র নির্দেশ মতো ব্যয় করতে হবে। এ পর্যায়ে রাসূলে করীম (স) এরশাদ করেছেন ঃ

বান্দা হারাম মাল উপার্জন করে তা থেকে যেন ব্যয়-সদকা না করে; কেননা তা কবুল করা হবে না। তা ব্যয় করলে তাতে কোনো বরকত হবে না। এ ধরনের উপার্জন যদি কেউ রেখে যায়, তা হলে তা তার জাহান্নামের পাথেয় হবে। মন্দ মন্দ দ্বারা নিশ্চিহ্ন হয় না, মন্দ নিশ্চিহ্ন হয় ভালো দ্বারা। খারাপ খারাপ জিনিসকে ধুয়ে-মুছে নেয় না। [আহমদ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে]

আয়াতটির প্রথম অংশের দ্বারাই মানুষের যাবতীয় উপার্জনের ওপর 'যাকাত' ফরয প্রমাণিত হয়েছে। কেবল পালিত চতুষ্পদ জন্তু ও নগদ সম্পদেই 'যাকাত' ফরয নয়, ভূ-সম্পত্তির ফসল ও পণ্যদ্রব্যের ওপরও যাকাত ফরয। এ মতে বিশেষজ্ঞদের ইজমা হয়েছে।

আর আয়াতের وممـا اخرجنـا لكم من الارض 'তোমাদের জন্যে জমি থেকে যা কিছু উৎপাদন করেছি'– এ অংশ থেকে জমির ফসলের যাকাত অন্য কথায়'ওশর' দেওয়া ফরয প্রমাণিত হয়েছে। আল্লাহ্র নির্দেশ অনুযায়ী এ 'ওশর' দিতে হবে এবং ওশর বাবদ খারাপ ও নিকৃষ্ট ফসল দেওয়া যাবে না।

www.amarboi.org

এ পর্যায়ে আমরা সূরা 'আল-আন্'আম-এর ১৪২ নম্বর আয়াতটিও পাঠ করা জরুরি মনে করছি। এরশাদ হয়েছে ঃ

وَهُوَ الَّذِىٓ اَنْشَاَ جَنّٰتٍ مَّعْرُوْشٰتٍ وَّغَيْرَ مَعْرُوْشٰتٍ وَّالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا اُكُلُهٗ وَالزَّيْتُوْنَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَّغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوْا مِنْ ثَمَرِهٖٓ اِذَآ اَثْمَرَ وَاٰتُوْا حَقَّهٗ يَوْمَ حَصَادِهٖ

তিনি আল্লাহ্-ই। যিনি নানা প্রকারের লতা-গুল্ম, যা ঝাঁকা দিয়ে উঁচুতে তুলে রাখা হয় এবং যার জন্যে তা করতে হয় না, যা নিজ কাণ্ডের ওপর দাঁড়ায় এইরূপ বৃক্ষরাজি সংলগ্ন বাগান রচনা করেছেন; যিনি খেজুর গাছ ও ক্ষেতে ফসল ফলিয়েছেন, যা থেকে নানা প্রকারের খাদ্য লাভ করা যায়; যিনি যয়তুন ও আনারের গাছ সৃষ্টি করেছেন যা বাহ্যিকভাবে পরস্পর সদৃশ হলেও ভিন্ন স্বাদসম্পন্ন। তোমরা এসবের ফল থেকে খাদ্য হিসেবে কিছু গ্রহণ করো যখন তাতে ফল ও ফসল ধরবে। আর তা কাটাই-মাড়াই করার দিন তার ওপর ধার্য আল্লাহ্র 'হক্' দিয়ে দাও। তোমরা অবশ্যই সীমালংঘন করবে না; কেননা আল্লাহ সীমালংঘনকারীদের মোটেই পছন্দ করেন না– ভালোবাসেন না।

আয়াতটির প্রথম অংশের তাফসীরে হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-এর ব্যাখ্যা উদ্ধৃত করে বলা হয়েছে ঃ লতা-গুল্ম দু' ধরনের। এক ধরনের লতা-গুল্মের 'বাউলী' দিতে হয়, নতুবা ফল ধরে না। আর যেগুলোতে বাউলী দিতে হয় না, নিজ কাণ্ডের ওপর দাঁড়াতে পারে, তাও লতা-গুল্ম পর্যায়েরই। প্রথম ধরনের লতা-গুল্মের দৃষ্টান্ত হচ্ছে কদু-কুমড়া-সীম, ঝিংগে-কাকই, আঙুর ইত্যাদি সবজী ও ফলের ধারক। আর দ্বিতীয় প্রকারের দৃষ্টান্ত ধান-গম-ভুট্টা ইত্যাদি গাছ। এ ছাড়া শক্ত ফলের গাছ রয়েছে, যেমন খেজুর, আনার, যয়তুন আর আমাদের দেশের নারকেল, সুপারী, কলা, আম, কাঁঠাল ইত্যাদি বৃক্ষরাজি।

এসব লতা-গুল্ম ও গাছপালার ফল সম্পর্কে আল্লাহ্র দুটি নির্দেশ। একটি হচ্ছে, তোমরা এসব থেকে নিজেদের খাদ্য প্রয়োজন পূরণ করবে। আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে, তা কাটাই-মাড়াইর দিনই তা থেকে আল্লাহ্র 'হক্' দিয়ে দিতে হবে। অন্য কথায় আল্লাহ্ সৃষ্ট এসব ধরনের ফল ও ফসলের ওপর যেমন মানুষের 'হক্' রয়েছে, তেমনি রয়েছে আল্লাহ্রও 'হক্'। মানুষের 'হক্' তা থেকে তাদের খাদ্য প্রয়োজন পূরণ করার, তা আয়াতে সুস্পষ্ট; কিন্তু তাতে আল্লাহ্র 'হক্' কি?

www.amarboi.org

ইবনে জারীর তাবারী লিখেছেন, আল্লাহ্‌র 'হক্‌' হচ্ছে ফরয যাকাত। হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা)) বলেছেন ঃ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ -'এবং তা কাটাই-মাড়াইর দিন আল্লাহ্‌র 'হক্‌' দিয়ে দাও' বলে আল্লাহ ফরয যাকাত দিয়ে দেবার আদেশ করেছেন। অন্য কথায় হযরত ইবনে আব্বাস ও আনাস ইবনে মালিক (রা) উভয়ই এ আয়াতের ভিত্তিতে ফল ও ফসলের যাকাত দেওয়া ফরয হয়েছে বলে বুঝতে পেরেছেন।[১] এ যাকাতের অপর নাম 'ওশর'।

উপমহাদেশের প্রখ্যাত আরবী মুফাস্‌সির সানাউল্লাহ পানিপত্তী (র) লিখেছেন ঃ ইবনে আব্বাস, তায়ূস, হাসান বসরী, জাবির ইবনে যায়দ ও সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব বলেছেন ঃ এ আদেশের লক্ষ্য ফরয যাকাত, আর তা হচ্ছে 'ওশর' ও অর্ধ-'ওশর'। কুরআনে। اتوا 'দাও' বলে যে নির্দেশ উদ্ধৃত হয়েছে, তা সুস্পষ্টরূপে 'ফরয' প্রমাণ করে। আর আয়াতে যে 'হক্‌' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে, তা ফরয প্রমাণ করার উদ্দেশ্যেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে।[২] আয়াতের শেষে যে 'ইস্‌রাফ' করতে নিষেধ করা হয়েছে, তার অর্থঃ 'বেহুদা খরচ বা অপব্যয় করো না' এবং শাসন কর্তৃপক্ষকে বলা হয়েছে ঃ 'তোমরা জনগণের নিকট থেকে তোমাদের ন্যায্য হক্‌ বা প্রাপ্যের অধিক নিও না; অথবা তোমরা 'হক্‌' ব্যতীত কিছুই নেবে না, পাওয়ার যোগ্য ব্যক্তি ছাড়া কাউকে কিছু দেবে না।[৩] অর্থাৎ যে যা পাওয়ার অধিকারী, তাকে তা-ই দেবে।

আল্লামা কুরতুবী كلوا من ثمره اذا ثمر واتوا حقه يوم حصاده -'তোমরা তার ফল থেকে খাও যখন তাতে ফল ধারণ করবে এবং দাও তার হক্‌ তা কাটাই-মাড়াইর দিন'- আয়াতের তাফসীরে লিখেছেন ঃ

এ আয়াতের শব্দ 'খাও' এবং 'দাও' এ দুটি উদ্ধৃত হয়েছে দুটিই আদেশ। কিন্তু প্রথম আদেশটি মুবাহ প্রমাণ করে। অর্থাৎ তার ফল খাওয়া মানুষের জন্যে মুবাহ। খেতেই হবে, এমন কথা নয়; খাওয়া ওয়াজিব বা ফরয নয়। আর দ্বিতীয় আদেশটি ফরয প্রমাণ করে। অর্থাৎ তার 'হক্‌' আদায় করে দেওয়া ফরয। আর একই আয়াতে একটি মুবাহ ও অপরটি ফরয প্রমাণকারী আদেশ বেমানান নয়।

অতঃপর দ্বিতীয় আয়াতের তাফসীর পর্যায়ে লিখেছেন ঃ 'হক্‌' বলতে এখানে কি বোঝানো হয়েছে, সে বিষয়ে বিভিন্ন মত রয়েছে। আনাস ইবনে মালিক,

১. তাফসীর-ই-ইবনে কাসীর, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৮১ (১৯৮৪ সংস্করণ)
২. তাফসীর-ই-আল-মাজহারী, ৩য় খণ্ড (নদওয়াতুল মুসান্নিফীন প্রকাশিত)
৩. তাফসীর-ই-ফতহুল কাদীর (শাওকানী) ২য় খণ্ড, পৃ. ১৬০

www.amarboi.org

ইবনে আব্বাস, তায়ূস, হাসান বসরী, ইবনে যায়দ, ইবনুল হানফীয়া, দহাক ও সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব প্রমুখ বলেছেন ঃ هى الزكوة المفروضة –তা হচ্ছে ফরয যাকাত 'ওশর ও অর্ধ-ওশর।

ইবনে ওহ্হাব ইবনুল কাসেম ইমাম মালিক থেকে এ আয়াতটির এই তাফসীরই বর্ণনা করেছেন। ইমাম শাফিয়ীর কোনো কোনো সঙ্গিরও এই মত বর্ণিত হয়েছে। ইমাম আবূ হানিফাও এ আয়াতের ভিত্তিতেই ফসলের 'ওশর' যাকাত হিসেবে দেওয়া ফরয বলে মত প্রকাশ করেছেন।[১] আল্লামা আবূ বকর আল জাস্সাস লিখেছেন ঃ وَاٰتُوا حَقَّهٗ يَوْمَ حَصَادِهٖ বলে ওশর দিতেই আদেশ করা হয়েছে এবং তা জমির সমস্ত উৎপাদনেরই দেওয়া ওয়াজিব (ফরয)। কেননা আয়াতে সমস্ত কৃষি উৎপন্নের (الزرع) কথা সাধারণভাবে বলা হয়েছে। তবে তার মধ্যে কোনো উৎপাদন সম্পর্কে আলাদা বিধান ঘোষিত হলে ভিন্ন কথা[২] কেউ কেউ 'ওশর' নয়, অন্য কিছু এবং তা দেওয়া মুস্তাহাব বলেও মত দিয়েছেন। কিন্তু তা আদৌ গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। রাসূলে করীম (স)-এর কথা ও কাজেই তা করা অবশ্য দেয় প্রমাণ করেছে। এতদ্ব্যতীত জমির সেচ ব্যবস্থার পার্থক্যের দরুন ওশর বা অর্ধ-ওশর দেওয়া ফরয হওয়ার ব্যাপারে সমস্ত ফিক্হবিদই সম্পূর্ণ একমত– ইজমা হয়েছে'।[৩]

অতএব ওশর দেওয়া যে ফরয, তাতে কোনো সন্দেহ থাকতে পারে না।

দার্শনিক পটভূমি

কুরআন মজীদের উদ্ধৃত আয়াতসমূহ সম্পর্কে অন্যান্য জরুরী আলোচনার পূর্বে ইসলামী অর্থনীতির প্রকৃতি পর্যায়ে একটি জরুরি কথা সুস্পষ্ট করে বলার প্রয়োজন রয়েছে।

লক্ষ্যণীয় যে, দুটি আয়াতেরই পটভূমি ও প্রতিপাদ্য হচ্ছে, মহান আল্লাহ্র অস্তিত্ব ও তওহীদ। আর সাধারণভাবেই বলা যায়, জনগণের আর্থ-সামাজিক আচার-আচরণের যুক্তি জনগণের ধর্মতাত্ত্বিক বিশ্বাসের গভীরে নিহিত রয়েছে। মানুষের বাহ্যিক আচার-আচরণ ও জীবনধারার তাৎপর্য তাদের ধর্মতাত্ত্বিক বিশ্বাসের মধ্যেই সন্ধান করতে হবে। বিশেষ করে ইসলামী জীবন বিধান সম্পূর্ণরূপেই ইসলামের Metaphysical Conception-এর ওপর ভিত্তিশীল

---

১. তাফসীর-ই-আল-কাসেমী– মাহাসীনিত তাভীল, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ২২৩০-২২৩১

২. احكام القران ج ٢ ص ١٢

৩. তাফসীর-ই-আল-কাসেমী– মাহাসীনিত তাভীল, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ২২৩০-২২৩১

www.amarboi.org

এবং তা থেকেই তা উৎসারিত। এতে কোনোই সন্দেহ নেই, যেমন ইসলামের মৌল বিশ্বাস হচ্ছে, সমগ্র সৃষ্টিলোকের স্রষ্টা হচ্ছে একমাত্র আল্লাহ তা'আলা; তিনিই মানুষকে সৃষ্টি করেছেন, এ দুনিয়ায় মানুষকে আল্লাহ্র খলীফা হওয়ার মর্যাদা দিয়েছেন এবং দিয়েছেন একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাসী লোকদের কর্তব্য হচ্ছে, আল্লাহ্কেই যাবতীয় ধন-সম্পদ, উৎপাদন-উপায় এর মালিক এবং উৎপাদনকে আল্লাহ্র একক মালিকানা সম্পদ বলে বিশ্বাস করতে হবে। মানুষ আল্লাহ্র খলীফা হিসেবেই আল্লাহ্র দেওয়া ধন-সম্পদ, উৎপাদন-উপায় ও উৎপাদনে আমানতদার মাত্র। মানুষের এ আমানতদারীর ঐকান্তিক দাবি হচ্ছে, ধন-সম্পদ উৎপাদন-উপায় ও উৎপাদনের আসল মালিক সেগুলো সম্পর্কে যে নির্দেশ ও বিধানই দিয়েছেন, মানুষ তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করবে– পালন করবে আল্লাহ্র নিরংকুশ মালিকানার প্রতি ঐকান্তিক বিশ্বাস হৃদয়-মনে দৃঢ়মূল করে রেখে।

কুরআনের সম্বোধন (Approach) ও নির্দেশসমূহ এ দৃষ্টিকোণেই বিবেচ্য ও গ্রহণীয়।

দ্বিতীয়ত, আল্লাহ্র বিধান পূর্ণাঙ্গ, মানব জীবনের কোনো একটি দিকও এ বিধানের বাইরে থেকে যায়নি। মানুষের রাজনীতি, সমাজনীতি ও অর্থনীতি এই মৌল পূর্ণাঙ্গ বিধানেরই বিভিন্ন দিক মাত্র এবং প্রত্যেকটি দিকই তার মূলের সাথে পূর্ণভাবে সম্পৃক্ত, যেমন একটি তাযা বৃক্ষের প্রত্যেকটি শাখা ও পত্র-পল্লব বৃক্ষের কাণ্ডের মাধ্যমে মূল শিকড় থেকে রস গ্রহণ করে, অনুরূপ ইসলামী বিধানের প্রত্যেকটি শাখায়ও সেই মৌল বিশ্বাসের বাস্তব প্রতিফলন হওয়া একান্তই অপরিহার্য। যে শাখাটি সেই মূল থেকে রস নিচ্ছে না, তা সেই বৃক্ষ-বিধান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে শুকিয়ে ঝরে পড়ে যেতে বাধ্য।

উদ্ধৃত আয়াতদ্বয়ে মানুষের উপার্জন ও ভূমির উৎপাদন থেকে আল্লাহ্ যে ব্যয়-বিনিয়োগের নির্দেশ দিয়েছেন এবং তা থেকে আল্লাহ্র 'হক্' দিয়ে দেওয়ার আদেশ করেছেন, তা এই দার্শনিক ব্যাখ্যার প্রেক্ষিতেই বুঝতে হবে। দুনিয়ার প্রচলিত ও মানব রচিত অন্যান্য রাষ্ট্রনীতি, সমাজনীতি ও অর্থনীতিতে এই তাৎপর্য বাহ্যত পরিলক্ষিত না হলেও ইসলামী অর্থনীতিতে এই তাৎপর্য পূর্ণ মাত্রায় দৃষ্টিগ্রাহ্য। কোনো অবস্থায়ই সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্নভাবে ইসলামী অর্থনীতির ব্যাখ্যা দেওয়া যেতে পারে না।

আয়াতটি মক্কী না মাদানী ?

প্রথমে উদ্ধৃত সূরা আল-বাকারার আয়াতটি মদীনায় অবতীর্ণ, এ নিয়ে কোনো বিতর্ক নেই। কিন্তু পরে উদ্ধৃত সূরা আল-আন'আম-এর আয়াতটি যাতে জমির

www.amarboi.org

ফল ও ফসল থেকে খাদ্য গ্রহণ করা এবং আল্লাহ্র হক্স্বরূপ ওশর বা অর্ধ-ওশর দেওয়া ফরয প্রমাণিত হয়েছে– মক্কায় নাযিল হয়েছিল, না মদীনায় ? কেননা গোটা সূরা মক্কী বলেই পরিচিত। অথচ মক্কায় অবস্থানকালে আল্লাহ্র হক্ দেওয়ার আদেশ বাস্তবায়িত হওয়া সম্ভব ছিল না বলে আদেশটি যুক্তিযুক্ত মনে হচ্ছে না বিশেষত এজন্য যে, মক্কায় তো যাকাত ফরয হওয়ার বিধান নাযিল হয় নি, তা নাযিল হয়েছে মদীনায়।

এ পর্যায়ে তাফসীরের কিতাবসমূহে উল্লেখ রয়েছে, 'ইক্‌রামা ও 'আতা তাবেয়ী হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-এর এ কথাটি বর্ণনা করেছেন ঃ افزلت سورة الانعام بمكة –'সূরা আল-আন'আম মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছিল।

সে সাথে এই কথারও উল্লেখ দেখা যায়, আবূ সালেহ হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-এর এ কথাটি বর্ণনা করেছেন ঃ نزلت جملة واحدة সূরাটি সম্পূর্ণ (বারে বারে বা খন্ড খন্ডরূপে নাযিল হয় নি) একবারেই নাযিল হয়েছে। তা রাত্রিবেলা নাযিল হয়েছিল এবং সে রাতেই তা লিপিবদ্ধ করে রাখা হয়েছিল বলেও উল্লেখ করা হয়েছে। তবে তাফসীরকারকগণ লিখেছেন, এ সূরার ২০, ২১, ২২, ৯১, ১১৪ ও ১৫২ এই মোট ছয়টি আয়াত পরে মদীনায় নাযিল হয়েছ।[১]

ইমাম বায়হাকী বলেছেন ঃ মক্কায় নাযিল হওয়া কোনো কোনো সূরায় পরে মদীনায় অবতীর্ণ কিছু কিছু আয়াত শামিল রয়েছে ও সে সূরার সাথে মিলিয়ে দেওয়া হয়েছে। অনুরূপভাবে ইবনুল হিসার(ابن الحصار) বলেছেন ঃ মক্কী ও মাদানী প্রত্যেক পর্যায়ের সূরায় কিছু সংখ্যক ব্যতিক্রমী আয়াত রয়েছে।

বায়হাকী ও ইবনুল হিসার দুজনই বলেছেন ঃ কিছু লোক পূর্ববর্তীদের কাছ থেকে পাওয়া কোনো বর্ণনা বা হাদীস ছাড়াই নিছক ইজতিহাদ দ্বারা এ ব্যতিক্রমী আয়াত চিহ্নিত করতে চেষ্টা করেছেন। পরে তা নিয়ে বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। অথচ এটা কোনো হাদীস থেকে সহীহ প্রমাণিত হয়নি। বিশেষ করে এ সূরাটি একবারে সম্পূর্ণ মক্কায় নাযিল বলে যে দাবি করা হয়েছে, তা আদৌ সহীহ নয়।

কিন্তু ইমাম সুয়ূতী এ কথার প্রতিবাদ করে বলেছেন ঃ সূরা 'আল-আন'আম'-এর ব্যতিক্রমী আয়াতসমূহ (অর্থাৎ পরে মদীনায় অবতীর্ণ ও এ সূরায় শামিল করা আয়াতসমূহ) হযরত ইবনে আব্বাস (রা) কর্তৃক চিহ্নিত হয়েছে। আবুশ শায়খ কালবী থেকে উদ্ধৃত করেছেন যে, কতিপয় আয়াত ছাড়া সূরা 'আল-আন'আম' সম্পূর্ণ মক্কায় নাযিল হয়েছে।[২]

---

১. আল-জামে লি-আহকামিল কুরআন, ৭ম খণ্ড, পৃ. ৯৯-১০০

২. আল-মালিয়াতুল আম্মাতুল ইসলামীয়া, পৃ. ২৭৬

www.amarboi.org

আমাদের উপরোদ্ধৃত সূরা আল-আন'আম-এর আয়াতটি সেই ব্যতিক্রমী আয়াত এবং তা মদীনায় অবতীর্ণ হয়েছিল। গ্রন্থনার সময় আল্লাহ্র নির্দেশক্রমেই এবং যে-কোনো কারণেই হোক, তা এই সূরাটির মধ্যে শামিল করে দেওয়া হয়েছে।

এই প্রেক্ষিতে বলা যায়, সূরা 'আল-বাকারা'র উদ্ধৃত আয়াতটি এবং সূরা 'আল-আন'আম'-এর উদ্ধৃত আয়াত এ দুটোই মদীনায় অবতীর্ণ; তবে আগে ও পারে। এর প্রথমটিতে ঈমানদার লোকদের হালাল উপার্জিত সম্পদ থেকে 'যাকাত' দেওয়ার নির্দেশের সাথে সাথে জমির ফল-ফসল থেকেও আল্লাহ্র নির্দেশ অনুযায়ী 'ইনফাক' করার সাধারণ নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং দ্বিতীয় আয়াতটিতে জমির ফল-ফসল থেকে আল্লাহ্র 'হক্' স্বরূপ 'ওশর' দেওয়ার আদেশ করা হয়েছে তার সময় নির্ধারণসহ (অর্থাৎ কখন সে 'ওশর' দিতে হবে তা এ আয়াতে বলা হয়েছে)।

আয়াতটি মুহ্কাম না মনসূখ ?

ইমাম ফখরুদ্দীন আর-রাযী লিখেছেন ঃ আল্লাহ তা'আলা আয়াতে উল্লেখিত লতা-গুল্ম বৃক্ষ আদি সৃষ্টি রূপে উল্লেখ করে এ সবের মূখ্য উদ্দেশ্য ব্যক্ত করেছেন দুটি কথা দ্বারা। একটি ঃ তোমরা এ সবের ফল-ফসল দ্বারা নিজেদের খাদ্য-প্রয়োজন পূরণ করো। আর দ্বিতীয়টিঃ তা থেকে আল্লাহ্র হক্ দিয়ে দাও, যা সে সবের ওপর স্বতঃই ধার্য হয়।

'খাও' বা 'খাদ্য-প্রয়োজন পূরণ কর' বলার অর্থ হচ্ছে, তা খাওয়া তোমাদের জন্যে হালাল মুবাহ। 'আল্লাহ্র হক্ দাও' বলার পূর্বেই 'তা থেকে তোমরা খাও' বলে আল্লাহ্ বোঝাতে চেয়েছেন যে, আল্লাহ্র 'হক্' দিয়ে দেওয়ার পূর্বেই তা থেকে প্রয়োজন মতো খেলে কোনো দোষ হবে না।[১]

'আতা বলেছেন, সূরাটি মক্কী; তখনো যাকাত ফরয হয়নি। তাই আলোচ্য আয়াতটি যদি মক্কী হয়, তা হলে তার অর্থ হবে ঃ তোমরা যখন ফল পাড়ো বা ফসল কাটো, তখন উপস্থিত মিসকীন লোকদেরকে তা থেকে কিছু না কিছু দিয়ে দেবে। মুজাহিদও তাই বলেছেন। নাফে' ও ইবরাহীম নখ্ঈ প্রমুখ মনীষিগণ বলেছেন ঃ ফল ও ফসল থেকে আল্লাহ্র 'হক্' দিয়ে দেওয়ার এই আদেশ 'মুহক্াম'– স্থায়ী এবং এখনো কার্যকর; তা মনসূখ হয়নি।

মুফাস্সির ইবনে জরীর ইবনে আব্বাস, মুহাম্মদ ইবনুল হানফীয়া, ইবরাহীম নখ্ঈ, হাসান বসরী, সুদ্দী ও আতীয়া আল-আউফী প্রমুখের বক্তব্য উদ্ধৃত করে

---

১. তাফসীর-ই-কবীর (আর-রাযী)

www.amarboi.org

বলেছেন ঃ আল্লাহ্‌র 'হক্' দিয়ে দেওয়ার এই হুকুম পালন করা মক্কী জীবনে এ আয়াত নাযিল হওয়ার সময় থেকেই মোটামুটিভাবে ফরয ছিল। পরে আল্লাহ ওশর বা অর্ধ-ওশর ফরয করে দিয়ে পূর্বের হুকুম মনসূখ করেছেন। ইবনে জারীর তাবারী এ মতটিই পছন্দ করেছেন। কিন্তু ইমাম ইবনে কাসীর লিখেছেনঃ আয়াতটিকে মনসূখ বলা ঠিক নয়। কেননা আয়াতের যে হুকুম রয়েছে তা তো মূলত ফরয ছিল, কিন্তু পূর্বে তা সুস্পষ্ট ছিল না। পরে বিষয়টি বিস্তারিত করে বলা হয়েছে এবং আল্লাহ্‌র 'হক্' বাবদ দেওয়া পরিমাণটি নির্দিষ্ট করে বলে দেওয়া হয়েছে আর তা হিজরতের দ্বিতীয় বছর কার্যকর হয়েছে।[১]

আনাস, ইবনে আব্বাস ও সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব থেকে অপর একটি বর্ণনায় বলা হয়েছে, আলোচ্য আয়াতটি মদীনায় অবতীর্ণ। এ সূরায় অনুরূপ অন্যান্য আয়াতের সাথে এটিকে মিলিয়ে রাখা হয়েছে। এতে যে 'হক্' দিতে বলা হয়েছে, তা যাকাত হিসেবে ফরয করা হয়েছে।[২] অতএব আয়াতটির মনসূখ হওয়ার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। মক্কার পরিবর্তে মদীনার পরিবেশ পরিস্থিতির সাথে এ আয়াতটির হুকুম পালনের সঙ্গতি রয়েছে। কেননা তখন মদীনায় পূর্ণাঙ্গ ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম হয়ে গেছে এবং যাকাত আদায় ও বন্টন করা সে রাষ্ট্রের কর্তব্য বলে রীতিমত ঘোষিত হয়েছে।

'আল-ইক্‌লীল' গ্রন্থে বলা হয়েছে, উদ্ধৃত আয়াতটির ভিত্তিতেই যাবতীয় কৃষি-ফসল ও ফলের যাকাত অর্থাৎ 'ওশর' ফরয হওয়ার কথা প্রমাণিত হয়েছে। কেননা কুরআনের শব্দ حصاد 'কাটাই-মাড়াই' কেবলমাত্র ফল ও ফসলের ক্ষেত্রেই ব্যবহারযোগ্য।[৩]

প্রসঙ্গত আরো একটি প্রশ্ন উঠেছে। কুরআনের আয়াতে কতিপয় ফল ও কয়েকটি গাছের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। প্রশ্ন হচ্ছে, যাকাত ও ওশর যা-ই দেবার, তা কি শুধু ঐ কয়টি জিনিসে, না অন্যান্য অনুল্লিখিত ফল ও ফসলেও তা দিতে হবে?

এ প্রশ্নের জবাব হলো, আয়াতে যে সব ফল ও ফসলের উল্লেখ করা হয়েছে, তা আসলে দৃষ্টান্তস্বরূপ। বিশেষ করে এ জন্যে যে, তদানীন্তন আরবে প্রধানত এগুলোই জমিতে উৎপাদিত হতো, সে কারণেই এর উল্লেখ হয়েছে। কিন্তু সে কয়টির উল্লেখ করে যে হুকুমটি দেওয়া হয়েছে, তা মাত্র এ কয়টির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। কেবল ঐ কয়টির যাকাত-ওশর দিলেই আল্লাহ্‌র হক্ দেওয়ার

১. তাফসীর-ই-ইবনে কাসীর, ২য় খন্ড পৃ. ১৮২
২. তাফসীর-ই-আল-কাসেমী মাহাসীনিত তাভীল, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ২৫২৬
৩. ঐ পৃ. ২৫২৭

www.amarboi.org

আদেশ সম্পূর্ণরূপে পালিত হবে না; বরং এ নির্দেশ ব্যাপক, সর্ব প্রকারের ফল ও ফসলেরই যাকাত-ওশর দিতে হবে এবং এ হুকুম স্থায়ী।[১]

ইমাম ইবনে কাসীর লিখেছেন ঃ আলী ইবনে আবূ তালহা হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে উদ্ধৃত করেছেন ঃ 'কাটাই-মাড়াই'য়ের দিন তা থেকে আল্লাহ্র হক্ দিয়ে দাও'– বলে ফরয যাকাত স্বরূপ ওশর দিতে বলা হয়েছে আর তা দিতে হবে তা কাটাই-মাড়াই সম্পন্ন হয়ে যাওয়ার পর, তার পরিমাপ ও পরিমাণ জেনে নেওয়ার পর। কেননা তা হলেই তো প্রাপ্ত ফল ও ফসলের আল্লাহ্র 'এক-দশমাংশ হক্' নির্ধারণ ও চিহ্নিতকরণ সম্ভবপর। হযরত ইবনে উমর (রা) বলেছেনঃ লোকেরা এ নির্দেশ পেয়ে নগদ ও অন্যান্য সম্পদের যাকাত ছাড়াও অপর একটি হক্ আদায় করত। সে হক্টি হচ্ছে এই ওশর ও অর্ধ-ওশর। অবশ্য রাসূলের সাহাবীগণ ওশর যাকাত ছাড়াও বহুভাবে দান-সদ্কা করতেন। 'আতা ইবনে রিবাহ্ এ আয়াতের ভিত্তিতে বলেছেন ঃ কাটাই-মাড়াইর সময় যতটা সম্ভব হতো, জনগণ তা তো দিতেনই, কিন্তু সেই দেওয়া দ্বারা ওশর-যাকাত আদায় হয়ে গেছে বলে কখনোই মনে করতেন না। অন্যান্য সূত্রে বলা হয়েছে ঃ পরে যখন ওশর বা অর্ধ-ওশর সুনির্ধারিতভাবে ফরযরূপে ধার্য হয়ে গেল, তখন কাটাই-মাড়াইকালে ছিঁটে ফোঁটা দেওয়া আর ফরয থাকল না। ইবনে জারীর তাবারী হযরত ইবনে আব্বাস, মুহাম্মদ ইবনুল হানফীয়া, ইবরাহীম নখঈ, হাসান, সুদ্দী ও আতীয়া আল-আউফী প্রমুখের এই মতের উল্লেখ করেছেন।[২]

সাঈদ ইবনুল যুবায়র আলোচ্য আয়াতটিকে মক্কী মনে করে বলেছেন ঃ ইসলামের শুরুতে মক্কী জীবনে ফল ও ফসল কাটাই-মাড়াইর দিন ছিঁটে ফোঁটা বা মুঠি মুঠি দিয়ে আল্লাহ্র হক্ আদায় করা হতো। কিন্তু পরে মদীনার জীবনে ওশর ফরযরূপে ধার্য হয়ে ঐ ছিঁটে-ফোটা দেওয়ার রীতি মনসূখ করে দিয়েছে।[৩]

আর সূরা বাকারার আয়াতের ومما اخرجنا لكم من الارض 'এবং আমরা জমি থেকে তোমাদের জন্যে যা উৎপাদন করেছি' তা থেকেই 'ইনফাক' (ব্যয় ও বিনিয়োগ) করার যে আদেশ দেওয়া হয়েছে, তা সর্বসম্মতভাবেই মদীনায় অবতীর্ণ আয়াত এবং তা থেকেও জমির উৎপন্ন ফল ও ফসলের 'ওশর' বা অর্ধ-ওশর দেওয়া ফরযই প্রমাণিত হয়েছে। 'সূরা আল-আন'আম'-এর আয়াতটিকে মক্কী ধরা হলে সূরা আল-বাকারার আয়াতটিকে মনে করতে হবে মক্কায় দেওয়া পূর্বের নির্দেশই মদীনার জীবনে দেওয়া তাগিদ এবং দ্বিতীয় হুকুমটি প্রথমটির পরিপূরক।

---

১. তাফসীর-ই-আল-কাসেমী মাহাসীনিত তাভীল, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ২৫২৭
২. তাফসীর-ই-ইবনে কাসীর, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৮২
৩. তাফসীর-ই-আল-মাজহারী, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৩২

www.amarboi.org

জমির সব রকমের উৎপাদনেরই কি এই 'হক্' ধার্য হবে ?

উপরিউক্ত দুটি আয়াতই সুস্পষ্ট ভাষায় বলে দিয়েছে যে, জমিতে যা কিছুই উৎপন্ন হয় এবং যে ফল ও ফসলই কাটাই-মাড়াই হয়, তা থেকেই আল্লাহ্‌র নির্দেশ মতো ব্যয় করা এবং তা থেকেই আল্লাহ্‌র 'হক্' দিয়ে দেওয়া ফরযরূপেই কর্তব্য। সূরা আল-আন'আম-এর আয়াতের সূচনায় দু'প্রকারের লতা-গুল্ম ও অসদৃশ জয়তুন-আনার সমন্বিত বাগান রচনার কথা বলে আল্লাহ্‌র কুদরত ও তাঁর অপরিসীম দয়া-অনুগ্রহের কথা উল্লেখ করে তাঁর তাওহীদ প্রমাণ করার পর জমির উৎপাদন থেকে আল্লাহ্‌র 'হক্' দিয়ে দেবার আদেশ করা হয়েছে। আর সূরা আল-বাকারার আয়াতে জমির সর্বপ্রকারের ফল ও ফসলকে একমাত্র আল্লাহ্‌র উৎপাদন বলে দাবি করে তা থেকে 'ইন্‌ফাক' করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

এখানে তিনটি প্রশ্ন প্রসঙ্গত উদিত হয়। একটি হচ্ছে, জমির সর্বপ্রকারের উৎপাদন ফল ও ফসলেই কি আল্লাহ্‌র 'হক্' রয়েছে এবং তা কি অবশ্যই দিয়ে দিতে হবে ? উৎপাদনের বিভিন্ন রকমের মধ্যে কি কোনো পার্থক্য নেই ?

দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে, কত পরিমাণের উৎপাদন থেকে আল্লাহ্‌র হক্ কত পরিমাণে দিতে হবে ? শরীয়তে কি এর কোনো পরিমাণ নির্ধারিত আছে ?

আর তৃতীয় প্রশ্ন হচ্ছে, উৎপাদনশীল সব জমিও তো একই রকমের নয়। কোনো কোনো জমিতে ফল ও ফসল ফলাতে স্বতন্ত্রভাবে পানি সেচের প্রয়োজন হয় না; কিন্তু অপর কোনো কোনো জমিতে স্বতন্ত্র ব্যবস্থাধীন পানি সেচের ব্যবস্থা না হলে কোনো ফল বা ফসলই জন্মানো সম্ভব হয় না। আর সে জন্যে অতিরিক্ত ব্যয় ও শ্রম বিনিয়োগ করতে হয়। এরূপ অবস্থায় তাতে আল্লাহ্‌র 'হক্' ধার্য হওয়ার দিক দিয়ে পরিমাণে কি কোনো তারতম্য হবে ?

প্রথম প্রশ্নের জবাবে বলা যায়, জমিতে সাধারণ ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে যে ঘাস ও আগাছা-পরগাছার উদ্ভূত হয়, তাতে আল্লাহ্‌র 'হক্' হিসেবে কিছুই ধার্য হয় না বলে জমহুর ফিক্‌হবিদগণ মত দিয়েছেন। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য যাবতীয় উৎপাদন পর্যায়ে ফিক্‌হবিদগণের বিভিন্ন মত রয়েছে ঃ

ইমাম আবূ হানীফা (র) উপরোদ্ধৃত আয়াতদ্বয়ের সাধারণ বক্তব্যের ভিত্তিতে মত দিয়েছেন যে, জমিতে যে সব ফল-ফসল ও শাক-সব্জীর উৎপাদন হয়, তার সবকিছুতেই আল্লাহ্ 'হক্' এবং সে সব কিছু থেকেই আল্লাহ্‌র নির্দেশ মতোই 'ইনফাক' করতে হবে (অর্থাৎ ওশর দিতে হবে)।

www.amarboi.org

ইমাম আবূ হানীফার এ মতের প্রথম ভিত্তি হচ্ছে কুরআনের উভয় আয়াতের সাধারণ ও নিঃশর্ত নির্দেশ। কেননা তাতে জমির প্রকারভেদ বা ফসলের রকমারির মধ্যে কোনোরূপ পার্থক্যই করা হয়নি। তা ছাড়া দ্বিতীয় ভিত্তি হচ্ছে রাসূলে করীম (স)-এর হাদীস। তিনি ইরশাদ করেছেন ঃ فيما سقت السماء العشر (আকাশের বর্ষণে যে জমি সিক্ত হয় এবং ফলও উৎপাদন করে, তাতেই 'ওশর' ধার্য হবে।

উদ্ধৃত আয়াত ও হাদীসের সাধারণ বা নিঃশর্ত বক্তব্যের কারণে ইমাম আবূ হানীফা (র) বলেছেন, 'জমি যা কিছুই উৎপাদন করে, যা ফলিয়ে জমির প্রবৃদ্ধি লাভ উদ্দেশ্য হয় এবং বাগনসমূহে যা কিছু উৎপন্ন হয়, তার সবকিছুতেই 'ওশর' ফরয; তার কোনো স্থায়ী অর্থাৎ টিকে থাকা ফল হোক আর না-ই হোক। গম, বালি, কিসমিস ও খেজুর প্রভৃতি স্থায়ী থাকা ফল-ফসল, আর কাঁচা শাক-সবজী, কাঁচা ফল– যেমন পেঁপে, কচু, কুমড়া, শসা, ঝিংগা ইত্যাদি, নল-খাগড়া, ইক্ষু, বাঁশ ইত্যাদি সব কিছুতেই 'ওশর' ধার্য হবে।

কিন্তু ইমাম মালিক ও ইমাম শাফিয়ী (র) বলেছেন ঃ

لا زكواة الا فيما يقتات به كالرطب والعنب والحنطة والشعير والحمص و الارز ونحوها لاغير -

খেজুর, আঙুর, গম, বালি, মটর কলাই (বিভিন্ন প্রকারের ডাল) চাল ও অন্যান্য যা কিছু খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করা হয়, কেবল তাতেই ওশর-যাকাত ফরয। এগুলো ছাড়া অন্য কিছুতেই 'ওশর ফরয নয়।'

ইমাম আবূ ইউসুফ, ইমাম মুহাম্মদ ও ইমাম আহমদ ইবনে হা'ল (র) প্রমুখ বলেছেন ঃ

يجب فيما يبقى فى ايدى الناس مما يكال او يزان

যে সব ফসল পাত্র দ্বারা মাপা হয় কিংবা পাল্লা দিয়ে ওযন করা হয়– যা লোকদের হাতে সংরক্ষিত করা হয়, তার সব কিছুতেই 'ওশর' যাকাত ফরয।

এ মত অনুযায়ী তৈলবীজ (সেস্যামি) বাদাম, হিজল, পেস্তা, জাফরান, জিরা, ধনিয়া, মরিচ, পিঁয়াজ, রাসুন, জইবীজ ইত্যাদি সব কিছুতেই আল্লাহ্র হক্ ওশর ধার্য হবে। কিন্তু শাক-সব্জী ও লাউ জাতীয় ফল-ফসলে ওশর দিতে হবে না। উক্ত তিনজন মনীষী বলেছেন ঃ রাসূল করীম (স) এ সব জিনিসকে ওশর অর্ধ-ওশর

www.amarboi.org

ধার্য হওয়ার আওতার বাইরে রেখেছেন। কেননা এগুলো যেমন সংরক্ষিত করা হয় না, তেমনি সাধারণত ওযন করা বা পাত্র দিয়ে মাপাও হয় না।

হযরত মুযায ইবনে জাবাল (রা) সম্পর্কে তিরমিযী গ্রন্থে উক্ত হয়েছে ঃ

انه كتب الى النبى صلى اللّٰه عليه وسلم يسئله عن الخضروات وهى البقول فقال ليس فيها شىء

হযরত মুয়ায (রা) নবী করীম (স)-এর নিকট পত্র লিখে শাক-সব্জী ও লতা-গুল্মের ফল ও ঔষধির 'ওশর' দিতে হবে কি না জানতে চেয়েছিলেন। জবাবে তিনি জানিয়েছিলেন যে, এ সব কিছুই ধার্য হয়নি।

হাদীসটি ঈসা ইবনে তালহা কর্তৃক বর্ণিত এবং এর একজন বর্ণনাকারী হাসান। হাদীসবিদদের মতে তিনি যয়ীফ। শু'বাও তাঁকে যয়ীফ বলেছেন। আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক তাঁকে বর্ণনাকারী হিসাবে গ্রহণ করেন নি। ইমাম তিরমিযী (র) নিজেই বলেছেন ঃ

اسناد هذا الحديث ليس بصحيح ولا يصح عن رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه وسلم فى هذا الباب شىء وانما يرى هذا الحديث عن موسى ابن طلحة عن النبى صلى اللّٰه عليه وسلم مرسلا -

এই বর্ণনাটির সনদ সহীহ্ নয়। আর আসলে এ পর্যায়ে রাসূলে করীম (স) থেকে কোনো সহীহ ধারায় বর্ণনা পাওয়া যায়নি। উপরন্তু এ বর্ণনাটি মূসা ইবনে তালহার সূত্রে নবী করীম (স) থেকে 'মুরসাল' (সাহাবীর নাম উল্লেখ না করে, কোনো তাবেয়ী কর্তৃক রাসূলের কথা বর্ণিত হওয়া) হিসেবেই বর্ণিত হয়েছে।

ইমাম দারে কুত্নীও বর্ণনাটিকে 'মুরসাল' বলেছেন। ইমাম বায়হাকী এ হাদীসটি উদ্ধৃত করে বলেছেন ঃ 'হযরত মুয়ায (রা) কর্তৃক লিখিত চিঠিটি আমাদের নিকট রয়েছে।' ইমাম হাকিমও এ বর্ণনাটি উদ্ধৃত করেছেন এবং বলেছেন ঃ

موسى ابن طلحة تابعى كبير لاينكر انه لقى معاذا -

মূসা ইবনে তালহা একজন অতি বড় সম্মানিত তাবেয়ী। তিনি যে হযরত মুয়ায (রা)-এর সাক্ষাত পেয়েছেন, তা কোনোক্রমেই অস্বীকার করা যায় না।

www.amarboi.org

প্রখ্যাত হাদীসবিদ ইবনে আবদুল বার এ কথা অগ্রাহ্য করেছেন। এ সব কারণে শাক-সব্জি লতাগুল্ম জাতীয় ফসলে ওশর ধার্য না হওয়ার কথা প্রমাণিত হয় না এবং তাতে ইমাম আবূ হানিফার মতেরই সমর্থন সূচিত হয়।

কিন্তু ইমাম দারে কুত্‌নী মূসা ইবনে তালহার সূত্রে তাঁর পিতা বিশিষ্ট সাহাবী হযরত তালহা (রা) থেকে কয়েকটি 'মরফু' হাদীস হিসাবে এ কথাটিও উদ্ধৃত করেছেন ঃ ليس فى الخضروا صدقة –'শাক-সব্জী পর্যায়ের ফসলাদিতে ওশর-যাকাত ধার্য হবে না।' এ প্রেক্ষিতে ইমাম আবূ হানীফার মত এ হাদীসের বিপরীত ও এর সাথে সাংঘর্ষিক বলে মনে হয়।

কিন্তু ইমাম দারে কুত্‌নী যে কয়টি আলাদা-আলাদা সনদসূত্রে এ বর্ণনাটি মূসা ইবনে তালহা থেকে উদ্ধৃত করেছেন, তার সব কয়টি সনদেই যয়ীফ বর্ণনাকারী রয়েছেন। কিন্তু হানাফী মযহাবের প্রখ্যাত ইমাম আবূ ইউসূফ মূসা ইবনে তালহার নিজের মত সম্পর্কে লিখেছেন ঃ

انه كان لايرى صدقة الا فى الحنطة والشعير والنحل والكرم والزبيب –

'মূসা ইবনে তালহা নিজে গম, বালি, খেজুর, সাজানো পরিবেষ্টিত বাগানের ফল-পাকড় এবং কিসমিস, মনাক্কা ইত্যাদি পর্যায়ের ফসল ছাড়া অন্য কিছুর ওপর ওশর ধার্য হয় না বলে মনে করতেন।

এতে শাক-সব্জী ও লতা-গুল্মের ফসলের উল্লেখ নেই। কাজেই এগুলোর ওপর ওশর ধার্য না হওয়া সম্পর্কে তাঁর বর্ণনাকে নেহাত অ-সহীহ বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-ও উল্লেখ করেছেন যে, নবী করীম (স) হযরত মুয়ায (রা)-কে জবাবে যে চিঠি লিখেছিলেন, তা তাঁর নিকট সংরক্ষিত হয়েছে বলে মূসা ইবনে তালহা দাবি করেছেন।[১]

আর সত্যি কথা হচ্ছে, মূসা ইবনে তালহা (তাবেয়ী) সাহাবীর নাম উল্লেখ না করে যে 'মুরসাল' হাদীস বর্ণনা করেছেন, তা সহীহ। ইমাম তিরমিযীও অনুরূপ মতই প্রকাশ করেছেন। মুরসাল বর্ণনাও যে শরীয়তের দলীল হতে পারে, তা প্রায় সর্বসম্মত। বিশেষ করে যদি আরো বেশ কয়েকটি সূত্রে বর্ণিত কথা তা সমর্থন করে। অবশ্য হযরত আলী (রা) বর্ণিত মরফু হাদীসও এই মুরসাল বর্ণনারই সমর্থন করেছে। হযরত আয়েশা (রা) বর্ণিত হাদীস ইমাম দারে কুত্‌নী এই ভাষায় উদ্ধৃত করেছেন ঃ ليس فيما انبتت الارض من الخضرة زكوة –'জমি যে

১. হাদীসটি সহীহ। আবদুল্লাহ ইবনে উমর, জাবির ইবনে আবদুল্লাহ, মুয়ায ইবনে জাবাল ও আবূ হুরায়রা (রা) প্রমুখ সাহাবী কর্তৃক বর্ণিত।

www.amarboi.org

সব শাক-সব্জী উৎপাদন করে, তাতে ওশর-যাকাত ধার্য হবে না।' ইমাম দারে কুত্নীর অপর একটি বর্ণনায় মুহাম্মাদ ইবনে জাহাশের এই কথাটি এসেছে। রাসূলে করীম (স) হযরত মুয়ায (রা)-কে ইয়ামেনে পাঠাবার সময় (অথবা তাঁর ইয়ামেনে থাকা অবস্থায়) এ নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, প্রতি চল্লিশ দীনার থেকে যাকাত বাবত এক দীনার গ্রহণ করবে। আর وليس فى الخضروات صدقة –'শাক-সব্জী জাতীয় ফল-ফসলে কোনো ওশর হবে না।[১]

ইমাম দারে কুত্নী উদ্ধৃত হাদীসের সনদ ইমাম বুখারী, মুসলিম ও নাসাঈ প্রমুখ সর্বজনমান্য হাদীস বিশারদগণের মানদণ্ডে উত্তীর্ণ হয় না, এ কথা ঠিক; কিন্তু তাই বলে তা সহীহ্ নয়, এমন কথাও বলা যায় না। তবু এ ছাড়াও বেশ কয়েকটি হাদীস রয়েছে যাতে খেজুর, কিসমিস, গম ও বার্লি এ কয়টি জিনিস বাদে অন্যান্য সব ফসলের ওপর ওশর ধার্য না হওয়ার কথা বলা হয়েছে। হযরত আবূ মূসা আল-আশআরী (রা) ও হযরত মুয়ায (রা) এ দুজন সাহাবীকে রাসূলে করীম (স) ইয়েমেনে দ্বীন-ইসলাম প্রচার ও শিক্ষা দানের দায়িত্ব দিয়ে পাঠিয়েছিলেন। তখন তিনি তাঁদের বলেছিলেন ঃ لا تاخذوا الصدقة الامن هذه الاربعة –তোমরা এ চারটি ফসল ছাড়া অন্য কোনো ফসল থেকে সদকা-ওশর আদায় করবে না। ইমাম বায়হাকী বলেছেন ঃ এ হাদীসটির সব কজন বর্ণনাকারীই 'সিকাহ' বিশ্বাসভাজন এবং এর সনদ 'মুত্তাসিল', মাঝখানে কোনো বিচ্ছিন্নতা নেই।

তাবারানী হযরত উমর (রা) থেকে তাবেয়ী মূসা ইবনে তালহা বর্ণিত এ হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন ঃ

انما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكواة فى هذه الاربعة –

রাসূল করীম (স) উক্ত চার ধরনের ফসলের যাকাত-ওশর আদায়ের রীতি চালু করেছেন।

এ হাদীসটি দারে কুত্নী আমর ইবনে শু'আয়ব– তাঁর পিতা– তাঁর দাদা থেকে এবং আবূ ইউসুফ মূসা ইবনে তালহা উমর (রা) নবী করীম (স) সূত্রে উদ্ধৃত করেছেন। আর বায়হাকী শাবী থেকে উদ্ধৃত করেছেন ঃ রাসূলে করীম (স) ইয়ামনবাসিদের নিকট উক্ত চারটি জিনিসের যাকাত ওশর দেওয়ার কথা লিখে পাঠিয়েছিলেন। এ বর্ণনাটিতে উক্ত চারটি জিনিসের সাথে পঞ্চম ফসল হিসেবে الذرة। অর্থাৎ ভুট্টাকেও শামিল করা হয়েছে।[২]

---

১. তুহফাতুল ফুকাহা– সামারকান্দী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬৫৮

২. তাফসীর-ই-আল-মাজহারী, ১ম খন্ড, পৃ. ৩৮০-৩৮১

www.amarboi.org

এই দীর্ঘ আলোচনায় এ কথা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, শাক-সব্জী পর্যায়ের ফসলে 'ওশর' ধার্য না হওয়ার দলীল-ই অকাট্য। অথচ ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মত হচ্ছে ঃ শাক-সব্জী সহ জমির সকল প্রকার উৎপাদনেই 'ওশর' ধার্য হবে। মনে হয়, ইমাম আবূ হানীফার মত হাদীসে প্রমাণিত নীতির পরিপন্থী। কিন্তু এ কথা সত্য নয়। ইমাম আবূ হানীফা (র) হাদীসের ভিত্তিতেই তাঁর রায় ঘোষণা করেছেন। বহু সংখ্যক হাদীসেই বৃষ্টির পানি পেয়ে জমি যা কিছুই উৎপাদন করে, সাধারণভাবে তাতেই 'ওশর' ধার্য হওয়ার কথা বলা হয়েছে। এগুলোই তাঁর দলীল।

এ ক্ষেত্রে আমাদের বক্তব্য হচ্ছে, মূলত যাকাত ওশর উক্ত চার বা পাঁচ প্রকারের ফসলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। এসব হাদীসে সুস্পষ্টভাবে চারটি বা পাঁচটি জিনিসের উল্লেখ হলেও এগুলো যে নিতান্তই দৃষ্টান্তমূলক, তা এর পূর্বেও বলেছি। তাই হাদীসে উক্ত চারটি জিনিসের পূর্বে مـثـل শব্দটি উহ্য ধরতে হবে। এর অর্থ হবে ঃ এই ধরনের ফসলে ওশর ধার্য হবে এবং তা থেকে আল্লাহ্র 'হক্' আদায় করে দিতে হবে।' এ কারণে ইমাম মালিক ও ইমাম শাফিয়ী সাধারণ অবস্থায় খাদ্য হিসেবে গণ্য হওয়ার দিক দিয়ে সাদৃশ্যকে (مماثلت) ভিত্তি করে এ ধরনের সব ফল ও ফসলের ওপরই 'ওশর' ধার্য হওয়ার মত প্রকাশ করেছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই সাদৃশ্য (similarity) গণ্য হওয়া উচিত পরিমাপযোগ্যতা (measurement) ওযনতত্ত্ব (weight) ও সঞ্চয়যোগ্যতা ইত্যাদির দিকে দিয়ে। কেননা যাকাত ও 'ওশর' ধার্য হওয়ার ভিত্তি হচ্ছে সম্পদ দ্বারা আর্জিত সচ্ছলতা (غنا) খাদ্য বা রসদ হওয়ার (victuals) দিক দিয়ে নয়। অতএব জমিতে উৎপন্ন যে জিনিসই পরিমাপ করা যাবে (পাত্র বা গজ-ফিতে দিয়ে) বা ওযন করা যাবে (যে কোনো ওযন-যন্ত্র বা দাড়ি পাল্লা দিয়ে) সঞ্চয় করে রাখা যাবে এবং যা থেকেই অর্থ-সম্পদ আহরণ করা যাবে, তাতেই 'ওশর' ধার্য হবে। এটিই হচ্ছে সুচিন্তিত মত।

ফসলের যাকাত অর্থাৎ ওশর ধার্য হওয়ার জন্যে একটি বছরকাল মালিকানাধীন থাকার কোনো শর্ত নেই, যেমন নগদ সম্পদ বা অন্যান্য পণ্যে (Finiished goods) সে রূপ রয়েছে। এ মত সর্বসম্মত। কেননা পূর্ণ একটি বছর অতিবাহিত হওয়ার শর্ত তো শুধু জিনিসটির মধ্যে প্রবৃদ্ধি (Growth and Increase) লাভে সুযোগ দানের জন্যে করা হয়েছে। পক্ষান্তরে জমির ফল-ফসল তো স্বত্বঃই প্রবৃদ্ধিপ্রাপ্ত, প্রবৃদ্ধিই প্রবৃদ্ধি। অতএব তাতে 'ওশর' ফরয হওয়ার জন্যে এক বছর অতীত হওয়ার শর্ত না থাকাটাই স্বাভাবিক।

দ্বিতীয়ত জমির ফল-ফসলের 'ওশর' দেওয়া ফরয হওয়ার জন্যে ইমাম আবূ হানীফার মতে মালিকের পূর্ণ বয়স্ক ও সুস্থ বিবেক বুদ্ধি লোক হওয়ার কোনো

www.amarboi.org

শর্ত নেই। অর্থাৎ জমির মালিক শিশু, বালক, বালিকা বা পাগল হলেও তার জমির উৎপন্ন ফল-ফসল থেকে 'ওশর' অবশ্যই দিয়ে দিতে হবে; অন্য সব ধন-মালের যাকাত ফরয হওয়ার জন্যে অন্যান্য ফিক্হবিদের মতে যেমন এ দুটি শর্ত আরোপিত নয়।

ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর এই ভিন্নতর মতের কারণ হচ্ছে, ধন-মালের যাকাত হচ্ছে খালিস ইবাদত; তাতে নিয়তের প্রয়োজন, যা একজন পূর্ণ বয়স্ক ও সুস্থ বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন মালিকের পক্ষেই সম্ভব। কিন্তু 'ওশর' এক দিক দিয়ে 'ইবাদত বটে; তবে তাতে مؤنة 'খাদ্য সরবরাহের তাৎপর্য' নিহিত। 'ওশর' ইবাদত হওয়ার কারণে মালিকের শুধু মুসলিম হওয়ার শর্ত, এ কারণে কাফেরের নিকট থেকে 'ওশর' নেওয়া যাবে না।[১]

ওশর ধার্য হওয়ার জন্যে ফসলের 'নিসাব'-এর প্রশ্ন

এরপর দ্বিতীয় প্রশ্নটির জবাব দেওয়ার চেষ্টা করছি। তা হলো জমির ফল ও ফসলের ওপর 'ওশর' ফরয হওয়ার জন্যে উৎপন্ন ফসলের 'নিসাব' আছে কি, যে এত পরিমাণ ফসল উৎপন্ন হলে 'ওশর' ফরয হবে, আর এর কম হলে ওশর ফরয হবে না।

ইমাম আবূ হানীফা (র) উৎপন্ন ফসলের কোনো নিসাব (حـــق) স্বীকার করেন নি। তাঁর মত হলো, জমির ফসল যে পরিমাণই হোক কম বা বেশি, তার ওপরই 'ওশর' ধার্য হবে এবং আল্লাহ্র হক্ হিসেবেই তা দিয়ে দিতে হবে।

ইমাম আবূ হানীফার এ মতের প্রথম ভিত্তি সেই আয়াত, যা জমির ফসলে ওশর ফরয করেছে। সে আয়াতের বক্তব্য হলো, যা-ই এবং যে পরিমাণেই উৎপন্ন হোক-না কেন, তা থেকেই আল্লাহ্র 'হক্' দিয়ে দিতে হবে। এতে যেমন সব প্রকারের উৎপাদন শামিল রয়েছে, তেমিন উৎপন্ন ফল-ফসলের এমন কোনো পরিমাণের কথা বলা হয়নি, যে এতটা হলে তবেই তার ওপর আল্লাহ্র হক্ ওশর ধার্য হবে, নতুবা নয়। তাতে কোনো নিসাব বলা হয়নি, কোনো শর্তও আরোপ করা হয়নি।

এছাড়া কুরআনের আয়াতে ব্যবহৃত (حق) শব্দটিরও ব্যাখা দেওয়া হয় নি। অথচ তার ব্যাখ্যা না হলে এ ক্ষেত্রে কোনো চূড়ান্ত ও সুস্পষ্ট কথা বলা যেতে পারে না। হাদীসে সে ব্যাখ্যাই দেওয়া হয়েছে ওশর ফরয হওয়ার কথা বলে। অনুরূপভাবে 'যা আমরা তোমাদের জন্যে জমি থেকে বের করেছি বা উৎপন্ন করেছি' কথাটিও

---

১. সহীহ্ তিরমিযী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৯৩

www.amarboi.org

শর্তহীন এবং ব্যাখ্যাও নেই। রাসূলে করীম (স) এ দুটো কথারই ব্যাখ্যা দিয়েছেন হাদীসের মাধ্যমে এই কথা বলে ঃ فيما سقت السماء العشر –'যা কিছু বৃষ্টির পানিতে সিক্ত হয়, তাতেই ওশর' অর্থাৎ বৃষ্টির বর্ষণে জমিতে যে পরিমাণই ফলবে, তাতেই 'ওশর' ফরয হবে। এতে ফসলের কোনো পরিমাণের উল্লেখ নেই, যেমন নেই বিশেষ কোনো ধরনের ফসলের উল্লেখ।[১] ইমাম আবূ জাফর তাহাভী তাঁর হাদীস গ্রন্থে উপরিউক্ত হাদীস উদ্ধৃত করে লিখেছেন ঃ

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل فيما سقت السماء ما ذكر فيها ولم يقدر فى ذلك مقدارا ففى ذالك ما يدل على وجوب الزكواة فى كل ما خرج من الارض قل اوكثر

বৃষ্টিবর্ষণের ফলে জমিতে যে ফসল হয়, আল্লাহ্‌র রাসূল তাতেই ওশর ধার্য করেছেন। এতে কোনো পরিমাণের উল্লেখ নেই। এতে প্রমাণিত হয় যে, জমি যা-ই উৎপাদন করবে, কম বা বেশি, তাতেই ওশর যাকাত ফরয হবে।[২]

এই মতটি 'উর উবনে আবদুল আযীয, মুজাহিদ ও ইবরাহীম নখঈ (র) প্রমুখ মনীষী থেকেও বর্ণিত হয়েছে। আবদুর রায্‌যাক ও ইবনে আবূ শায়বা হাদীস গ্রন্থ প্রণেতাদ্বয় উক্ত তিনজন মনীষী থেকে এই মতটি উদ্ধৃত করেছেন سفيما انبتت من قليل اوكثير العشر –'জমি কম বা বেশি যে পরিমাণেরই ফল বা ফসল উৎপাদন করবে, তাতেই ওশর ধার্য হবে'।

ইমাম আবূ ইউসুফ আবূ হানীফা-হাম্মাদ ইবরাহীম নখঈ এই সূত্রে হাদীসটি তার গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন।[৩]

কিন্তু ইমাম মালিক, ইমাম শাফিয়ী, ইমাম আহমদ এবং হানাফী মাযহাবের দু'জন ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মাদ 'ওশর' ধার্য হওয়ার জন্যে ফসলের পরিমাণে নিসাব-এর শর্ত আরোপ করেছেন। লায়স ও ইবনে আবূ লায়লার সেই মত।[৪]

এই নিসাব পরিমাণ হচ্ছে পাঁচ 'অসাক্'– যেসব ফসল অসাক হিসেবে পরিমাপ করা হয়। আর যা 'অসাক্' হিসেবে পরিমাপ করা হয় না, তাতে পাঁচ প্যাকেট বা পাঁচ বস্তা গণ্য করা হবে ঃ তূলা পাঁচ বাণ্ডিল, প্রতিটি বাণ্ডিলে তিন শত মণ আর জাফরান পাঁচ মণ।

---

১. কিতাবুল খারাজ– আবূ ইউসূফ, পৃ. ৫৪
২. তাফসীর-ই-আল-মাজহারী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৮১
৩. ঐ পৃ. ৩৮২ ৪. ঐ পৃ. ৩৮৩

www.amarboi.org

এই মত জমহুর ফিক্‌হবিদদের। অর্থাৎ জমির ফসলের পরিমাণ কমপক্ষে পাঁচ অসাক্‌ হলেই 'ওশর' ফরয হবে, তার কমে হবে না। তাদের দলীল হচ্ছে, রাসূলে করীম (স)-এর হাদীস।

ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة

পাঁচ অসাক্‌-এর কম পরিমাণ ফসলে 'ওশর' ফরয নয়।

বুখারী ও মুসলিম উভয়ই হযরত আবূ সাঈদ খুদরী থেকে ইমাম মুসলিম স্বতন্ত্রভাবে হযরত জাবির থেকে, আহমদ ও দারে কুতনী হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে, বায়হাকী আমর ইবনে হাজম থেকে এবং স্বতন্ত্রভাবে দারে কুতনী হযরত আয়েশা (রা) থেকে এই একই হাদীস উদ্ধৃত করেছেন। হাদীসটির সূত্র সব দিক দিয়েই সহীহ। মনে রাখা আবশ্যক যে, এক অসাক্‌-এর পরিমাণ প্রায় ছয় মণ। আর পাঁচ অসাক হচ্ছে আটাশ থেকে ত্রিশ মণের কাছাকাছি।

ইমাম আবূ হানীফার পক্ষ থেকে এই দলীলের জবাবে একটি কথা বলা হয়েছে। তা হচ্ছে রাসূল করীম (স)-এর সমান গুরুত্বের দুটি কথার কোনো একটির ওপর সকলের মতের ঐক্য হলে সেটিই অগ্রাধিকার পাওয়ার যোগ্য সেটির ওপর, যে বিষয়ে বিভিন্ন মত রয়েছে। (এটা হাদীস ভিত্তিক ইজতিহাদের একটা নীতি)। আলোচ্য ক্ষেত্রে জমির ফল ও ফসলের ওপর 'ওশর' ফরয হওয়ার ব্যাপারে সকলে ঐকমত্য রয়েছে। কিন্তু তার নিসাব পরিমাণ নির্ধারণে মতদ্বৈধতা প্রকট। অতএব 'ওশর' ফরয হওয়ার কথাকে সর্বসম্মত মতরূপে মেনে নেওয়াই বাঞ্ছনীয়, 'নিসাব' নির্ধারণ নয়।[১]

ইমাম ইবনুল কাইয়্যেম উভয় মতের পর্যালোচনা করে বলেছেন ঃ ফল ও ফসলের নিসাব নির্ধারণে সহীহ হাদীসের অকাট্য দলীল রয়েছে এবং নিম্নতম পরিমাণ 'পাঁচ অসাক' নির্ধারিত হয়েছে। এই পর্যায়ে রাসূলে করীম (স)-এর যে সুস্পষ্ট বলিষ্ঠ হাদীস রয়েছে, তা কোনো ক্রমেই অমান্য করা যায় না। উভয় দিকেই রাসূলে করীম (স)-এর আনুগত্য ফরয। আর আসলে এ দুটি কথার মধ্যে কোনো মৌলিক বৈপরীত্য নেই। فيما سقت السماء العشر –'বৃষ্টির পানিতে সিক্ত জমির ফসলে ওশর'– এই কথাটি বলে রাসূল (স) জমির দুই ধরনের মধ্যে পার্থক্য করেছেন। দেখিয়েছেন, কোন জমিতে 'ওশর' ধার্য হবে আর কোন জমিতে অর্ধ-ওশর। ফরয পরিমাণে পার্থক্য করে তিনি জমির দুটি প্রকার তুলে ধরেছেন। কিন্তু এ হাদীসে নিসাব-এর পরিমাণ বলেননি। তা বলেছেন অপর এক হাদীসে, যা শরীয়তের দৃষ্টিতে শু' বা অকাট্য দলীল। তা হলেই সেই অকাট্য দলীলকে উপেক্ষা করা বা তদনুযায়ী আমল না করা কি করে যুক্তিযুক্ত হতে পারে?

১. আহকামুল কুরআন– জাসসাস, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৬

www.amarboi.org

ইবনে কুদামাহ বলেছেন ঃ পাঁচ অসাক-এর কম পরিমাণে ওশর নেই– এই হাদীসটি সর্বসম্মত। এ হাদীসটির ব্যাপারে কারুরই কোনো দিক দিয়েই কোনো প্রকারের আপত্তি নেই। কাজেই এ কথাটিকে অবশ্যই অগ্রাধিকার দিতে হবে এবং সাধারণভাবে বলা কথার ওপরে এই বিশেষ ও সুনির্দিষ্টভাবে (خاص) বলা কথাকে স্থান দিতে ও গ্রহণ করতে হবে। যাকাত ফরয হওয়ার অন্যান্য সব ক্ষেত্রেই একটা নিসাব সর্বসম্মতভাবেই যখন গ্রহণ করা হয়েছে, তখন জমির ফসলের ওপর আল্লাহ্‌র 'হক্' ফরয যাকাত ধার্য হওয়ার ক্ষেত্রে তা গ্রহণ করা হবে না কেন?

ফসলের ক্ষেত্রে এক বছরকাল অতিবাহিত হওয়ার শর্ত আরোপ করা হয়নি যেমন পূর্বে বলেছি। তা এজন্য যে, ফসল তো পরিপক্ক হওয়ার পরই তার কাটাই-মাড়াই (Harvest) করা হয়। এই কাটাই-মাড়াই হওয়ার পরই তার পরিমাপ বা ওযন করা হয়। আর তখনই তাতে ওশর বা অর্ধ-ওশর ফরয হয়ে যায়।[১]

সেচ অবস্থার পার্থক্যের কারণে 'ওশর'-এর পরিমাণে পার্থক্য

জমির ফসলের ওপরই আল্লাহ্‌র হক্ ধার্য হয়। কিন্তু জমিতে ফসল ফলাবার জন্যে সেচ ব্যবস্থা একান্তই অপরিহার্য। আর এই সেচ অবস্থার দিক দিয়ে জমিতে জমিতে পার্থক্য থাকা খুবই স্বাভাবিক। ইসলামী শরীয়তে এই পার্থক্য শুধু এদিক দিয়ে দেখানো ও স্বীকার করা হয়েছে যে, কোনো কোনো জমির স্বাভাবিক ও প্রাকৃতিক অবস্থার দরুন আপনা-আপনি সেচ প্রয়োজন পূরণ হয়ে থাকে। সেজন্য স্বতন্ত্রভাবে কোনো কার্যক্রম গ্রহণ করতে ও সেজন্য অর্থ ব্যয় বা কষ্ট স্বীকার করতে হয় না। আবার অনেক জমিই এমন যে, স্বাভাবিক অবস্থার ফলে সে জমির সেচ প্রয়োজন পূরণ হয় না। সেজন্য স্বতন্ত্রভাবে সেচ প্রক্রিয়া অবলম্বন করতে হয়।

শরীয়তের বিধানের এই উভয় প্রকারের জমির ফসলের আল্লাহ্‌র 'হক্' একই পরিমাণে ধার্য হয়নি, তা যুক্তিযুক্তও নয়। তাই প্রথম প্রকারের জমির ফসলে ওশর অর্থাৎ মোট ফসলের দশ ভাগের এক ভাগ আল্লাহ্‌র 'হক্' বাবত দেয় ধার্য হয়েছে এবং শেষোক্ত জমির ফসলে অর্ধ-ওশর অর্থাৎ মোট ফসলের বিশ ভাগের এক ভাগ ধার্য হয়েছে।

পূর্বে উত্থাপিত তৃতীয় প্রশ্নের এটাই জবাব।

এ পর্যায়ে রাসূলে করীম (স) থেকে বেশ কয়েকটি সূত্রে হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

---

১. শারহে মাআনিউল আ-সার, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৬৪ রাহমানীয়া দেওবন্দ প্রকাশিত

www.amarboi.org

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণিত হাদীস হচ্ছে ঃ

فيما سقت السماء والعيون العشر وفيما سقى بالنضح نصف العشر

যে জমি বৃষ্টি ও ঝর্ণা-খাল-নদীর পানিতে সিক্ত হয়, তার ফসলের 'ওশর' এক দশমাংশ ধার্য হবে। আর যে জমি সেচ-কর্মের সাহায্যে সিক্ত হয়, তার ফসল থেকে অর্ধ-ওশর– বিশ ভাগের এক ভাগ আল্লাহ্র 'হক্' হিসেবে দিতে হবে।

ইমাম বুখারী (র) ও ইমাম তিরমিযী (র) এ হাদীসটি নিজ নিজ গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন। 'ওশর' ধার্য হওয়ার মূল কারণ হচ্ছে, জমি তার ফসলের দিক দিয়ে প্রকৃতপক্ষেই প্রবৃদ্ধি ও উৎপাদন সম্পন্ন। এই কারণেই ফিক্হবিদগণের সিদ্ধান্ত হচ্ছে, জমির ফসলের ওপর কোনো বিপদ-আপত্তি হলে ও তা ধ্বংস হয়ে গেলে 'ওশর' দেওয়া ফরয হবে না। কেননা ওশর বা অর্ধ-ওশর, যাই হোক, তা তো উৎপন্ন ফসল থেকে দেওয়া হবে। কিন্তু সেই ফসলই যদি না থাকে, তা হলে 'ওশর' ধার্য হবে কিসের ওপর, আর তা দেওয়াই বা হবে কোত্থেকে ? অনুরূপভাবে জমি চাষাবাদ করে ফসল ফলাবার সামর্থ্য বা সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও যদি তা না করা হয় যে কোনো কারণেই হোক তা হলেও 'ওশর' দিতে হবে না।

কোনো মুসলমানের জমি যদি কেউ ভাড়ায় বা ধার বাবদ চাষাবাদ করে ফসল ফলায় তাহলে, ইমাম আবূ হানাফী (র)-এর মতে 'ওশর' দিতে হবে জমির মালিককে, যে তা কেরায়া বা ধার স্বরূপ অন্য এক লোককে দিয়েছে। আর ইমাম আবূ ইউসূফ ও ইমাম মুহাম্মাদের মতে সে-ই 'ওশর' দেবে, যে এই জমিতে ফসল ফলিয়েছে– জমি ভাড়ায় নিয়ে হোক, কিংবা ধার স্বরূপ নিয়ে হোক। ইমাম আবূ হানীফার মতে যুক্তি হচ্ছে, জমির মালিকই তা ফসল ফলাবার জন্যে দিয়েছে, ভাড়া বাবত সে নিশ্চয়ই কিছু নিয়েছে কিংবা ধার স্বরূপ দিয়ে থাকলেও তার বদান্যতার দাবিই হচ্ছে এই 'ওশর' বা অর্ধ-ওশরটা তারই দিয়ে দেওয়া। আর অন্য দু'জন ইমামের মতের যুক্তি হচ্ছে, ওশর বা অর্ধ-ওশর তো ফসলের ওপর ফরয হয়। আর এই ফসল যে ফলিয়েছে, জমি ভাড়ায় নিয়ে হোক, বা ধার স্বরূপ নিয়ে– কাজেই ওশর বা অর্ধ ওশর তারই ওপর বর্তাবে। অর্থাৎ যে লোক ফসল ফলিয়েছে, তারই তা দেওয়া কর্তব্য।[১]

ওশর কখন দিতে হবে

واتوا حقه يوم حصاده –'দাও তার হক্ তা কর্তনের দিন' হক্ আয়াতে হক্ অর্থাৎ ওশর দিয়ে দেওয়ার আদেশের সময়ের কথা বলা হয়নি, আয়াতে দিন হচ্ছে হক্-এর পাত্র। অর্থাৎ وَاتوا الحق الذى يجب يوم حصاده لعد اسنعة –ফরয হওয়ার হক্টি দিয়ে দাও ফসল পরিপক্ক হওয়ার পর তা কর্তনের দিন।

১. কিতাবুল খারাজ ঃ পৃ. ৫৩

www.amarboi.org

জমি দুই প্রকারের ঃ ওশরী ও খারাজী

ইসলামী শরীয়তের দৃষ্টিতে জমি দুই প্রকারের। এক প্রকারের জমির ফসলের ওপর ওশর ধার্য হয়, তাকে বলা হয় ওশরী জমি। আর এক প্রকারের জমির ওপর ওশর বা অর্ধ-ওশর ধার্য হয় না, ধার্য হয় খারাজ। তাকে বলা হয় খারাজী জমি।

ওশরী জমি ঃ আরব ভূ-খণ্ডের সব জমি, যে জমির মালিক স্বতঃ প্রণোদিত হয়ে ইসলাম কবুল করেছে, সেই জমি। আর যে জমি শক্তি প্রয়োগ ও যুদ্ধ করার ফলে মুসলমানদের হাতে এসেছে এবং গণীমত হিসেবে বিজয়ী মুসলিম বাহিনীর লোকদের মধ্যে বণ্টন করে দেওয়া হয়েছে।

এই সব জমিই ওশরী জমি। কেননা এর প্রত্যেক জমিই খাদ্য সরবরাহে مـــؤنـــة কোনো না কোনো অংশ গ্রহণ করে। কাজেই মুসলমানদের মালিকানাধীন জমির ফসলের শুরুতেই ওশর ধার্য হওয়ার উত্তম নীতি। কেননা ওশর দেওয়া ইবাদত পর্যায়েরই একটি কাজ বলে বিবেচিত। আর চতুর্থ পর্যায়ে রয়েছে, কোনো মুসলমান যখন তার ঘরবাড়িকে ফলদায়ক বাগানে পরিণত করে, তখন তাও ওশরী জমিতে পরিণত হয়। তার ওপর যখন প্রথমাবস্থায়ই কিছু একটা ধার্য করতে হয়, তখন ওশর ধার্য হওয়াই বাঞ্ছনীয় বিবেচিত হয়।

পঞ্চম পর্যায়ে মৃত অনাবাদি জমি যখন কোনো মুসলমান সরকারের অনুমতিক্রমে আবাদ ও চাষোপযোগী বানিয়ে নেয়, তখন তাও ওশরী জমি গণ্য হয়। যে জমি ওশরী জমির পানি দ্বারা সিক্ত– ওশরী জমির আশ-পাশের জমি, সেই জমিও ওশরী জমিরূপে গণ্য হবে।

মুসলমানগণ যুদ্ধ করে কিংবা সন্ধির ভিত্তিতে অমুসলিমদের যে এলাকা দখল করে নেয়, সেই এলকার জমি-জায়গা, তা পূর্ব মালিকদের দখলে থাকতে দেওয়ার শর্তে তার ওপর যা কিছু ধার্য করে দেয়, তাই খারাজ নামে অভিহিত।[১]

খারাজী জমি ঃ ইসলামী বাহিনীর হাতে সর্বপ্রথম ইরাকের সওয়াদ অঞ্চল বিজিত হলে সেই এলাকার সমস্ত জমি খারাজী জমি রূপে চিহ্নিত ও নির্ধারিত করা হয়; সে সব জমির পূর্ব মালিকদের নিকটই তা থাকতে দেওয়া হয়েছিল। সেখানকার লোকেরা ইসলাম কবুল করেনি বলে তাদের ওপর মাথাপিছু জিযিয়া ধার্য হয়েছিল এবং তাদের চাষাবাদাধীন জমির ওপর খারাজ ধার্য হয়েছিল। এই লোকদের নির্বাসিত করা হলে ও সেখানে অন্য লোকদের পুনর্বাসিত করা হলে তখনও সে জমি খারাজী জমি-ই থাকে এবং তার ওপর খারাজ ধার্য হয়। শরীয়ত মুতাবিক এটাই ছিল তখনকার ফয়সালা।

---

১. কিতাবুল খারাজ– ইমাম আবূ ইউসুফ, ২৩ পৃ.

www.amarboi.org

কিন্তু ইমাম আবূ ইউসূফের মতে 'খারাজ' ও 'ফাই' অভিন্ন। তিনি লিখেছেনঃ

فاما الفيء فهو الخراج عندنا 'ফাই' যা, তা-ই আমাদের মতে খারাজ।[১] ইমাম আবূ ইউসুফ তাঁর এ মতের সমর্থনে দলীল হিসেবে উল্লেখ করেছেন কুরআন মজীদের এই আয়াত ঃ

مَآ اَفَآءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مِنْ اَهْلِ الْقُرٰى فَلِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ لا كَيْ لَا يَكُوْنَ دُوْلَةًمْ بَيْنَ الْاَغْنِيَآءِ مِنْكُمْ -

আল্লাহ তাঁর রাসূলের নিকট গ্রামবাসিদের নিকট থেকে যা-ই ফিরিয়ে দেন, আল্লাহ, রাসূল, নিকট-আত্মীয়, ইয়াতীম, মিসকীন ও নিঃস্ব পথিকের জন্যে ..... যেন তোমাদের ধনীদের মধ্যেই ধন-সম্পদ সীমিতভাবে আবর্তিত হতে না থাকে। (সূরা হাশর ঃ ৭)

ইমাম আবূ ইউসুফ বলেছেন ঃ এ সব সম্পত্তি ইসলামী রাষ্ট্রের হাতে অর্পিত থাকে সর্বকালে মুসলমানদের তা থেকে উপকৃত হওয়ার জন্যে। ইরাক ও সিরিয়া মুসলিম কর্তৃত্বাধীন আসার পর কোনো কোনো সাহাবী গনীমতের মাল হিসেবে মুজাহিদদের মধ্যে তা বণ্টন করে দেওয়ার দাবি জানাতে থাকলে খলীফাতুল মুসলিমীন হযরত উমর (রা) এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্যে সাহাবীদের সাথে পরামর্শ করেন। তিনি উপরোদ্ধৃত আয়াত তিলাওয়াত করে তাঁর নিজের মত প্রকাশ করেন যে, এই গোটা এলাকার জমি বর্তমান ও অনাগত সর্বসাধারণ মুসলমানদের সামষ্টিক সম্পত্তি হিসেবে রাষ্ট্রের নিকট বর্তমান থাকা ও তা বণ্টন করে না দেওয়াই বাঞ্ছনীয়। তিনি বলেন, তা বণ্টন করে দিলে তার ওপর ব্যক্তি-মালিকানা স্থাপিত হবে ও বংশানুক্রমে সেই বংশসমূহের মধ্যে এর কল্যাণ সীমাবদ্ধ হয়ে থাকবে। ফলে পরবর্তী ও অনাগত মুসলমানদের জন্যে কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। আমি যদি বেঁচে থাকি, তা হলে সানয়ার পর্বতমালায় অবস্থানকারী রাখালও এই 'ফাই' থেকে তার নায্য অংশ পেতে থাকবে।[২]

ইমাম আবূ উবায়দ মনে করেন, বিজিত এলাকার অমুসলিমদের ওপর যে জিযিয়া ধার্য হয়, তাও 'ফাই' সম্পদ। তখন 'খারাজ' ধার্য হয় জমির মালিকদের ওপর জমি অনুপাতে। শেষ পর্যন্ত তাও বিজয়ী মুসলিমদের 'ফাই' রূপেই গণ্য হয়।[৩] আল্লামা নাসির ইবনে আবদুস সাইয়িদ 'আল-মাগরিব' গ্রন্থে লিখেছেন ঃ

---

১. কতাবুল খারাজ– ইমাম আবূ ইউসুফ, পৃ. ২৪
২. আল-ইসলাম– সাঈদ হাভী, ৩য় খণ্ড, ৫৮ পৃ.
৩. দুররুল মুখতার, ৩য় খণ্ড, ৩১৫ পৃ. কিতাবুল আমওয়াল, আবূ উবায়দ, ৮৬ পৃ.

www.amarboi.org

যুদ্ধাবস্থায় তরবারীর জোরে কাফেরদের নিকট থেকে যা পাওয়া যায়, তা গণীমত আর যুদ্ধের পর শান্তির সময় তাদের নিকট থেকে যা পাওয়া যায়– যেমন খারাজ, তা 'ফাই'। তা সর্বসাধারণ মুসলমানদের 'হক্'।[১]

এই প্রেক্ষিতে জমিকে তিনটি অবস্থায় বিভক্ত মনে করা যায় ঃ

১. যে জমির মালিক নিজেই ইসলাম গ্রহণ করেছে সে জমি তার মালিকের ভোগ দখলেই থাকবে। সে তার ফসল থেকে ওশর (বা অর্ধ-ওশর) দেবে।

২. যে জমির সুনির্দিষ্ট খারাজ দেওয়ার শর্তে অমুসলিমদের সাথে সন্ধির ফলে আয়ত্তে আসবে, তার ওপর সন্ধির শর্তানুযায়ী খারাজ ধার্য থাকবে। তার অধিক কিছু দিতে তাদেরকে বাধ্য করা যাবে না।

৩. আর যে জমি শক্তি প্রয়োগের ফলে عنوة দখলে আসবে, এই জমি সম্পর্কে মুসলমানদের মধ্যে মত-পার্থক্য রয়েছে ঃ

ক. কিছু সংখ্যকের মতে তা গণীমত হিসেবে পাঁচ ভাগের চার ভাগ বিজয়ীদের মধ্যে বণ্টন করে দিতে হবে। আর এক ভাগ– এক-পঞ্চমাংশ আল্লাহ্র ঘোষিত বণ্টন নীতি অনুযায়ী বিভক্ত হবে।

খ. অন্য কিছু লোকের মত হচ্ছে, এ সব জমি সম্পর্কে বিবেচনা করার ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের দায়িত্ব সম্পূর্ণরূপে ইসলামী রাষ্ট্রের সরকারের ওপর অর্পিত হবে। সরকার ইচ্ছা করলে তাকে 'ফাই' গণ্য করে সরকারী ব্যবস্থাধীন রেখে দেবে, বণ্টন করবে না। তা সর্বসাধারণ মুসলমানদের সামষ্টিক সম্পত্তি হিসেবে ওয়াকফ্ হয়ে থাকবে, যেমন হযরত উমর (রা) সওয়াদ এলাকার জমির ক্ষেত্রে গ্রহণ করেছিলেন।[২]

শরীকানা চাষাবাদে ওশর দেওয়ার দায়িত্ব

জমির মালিক নিজে জমি চাষ করে আবার অনেক সময় নিজে চাষ না করে অন্যকে চাষ করার জন্যে দেয়। এমতাবস্থায় ওশর দেওয়ার দায়িত্ব সম্পর্কে শরীয়তের বিধান জানা আবশ্যক।

জমির মালিক নিজে জমি চাষ করে ফসল ফলালে তার ওশর বা অর্ধ-ওশর সে নিজেই দেবে। কেননা জমি তার ফসলও তার নিজের। নিজে চাষ করলে অথবা নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় শ্রমিক নিযুক্ত করে তার দ্বারা চাষ করালে ফসল

---

১. তানযীমুল ইসলাম লিল-মুজতামা, আবূ জাহরা ১৫৯ পৃ.

২. বাদায়েওস্-সানায়েও, ২য় খণ্ড, ৫৪ পৃ.

www.amarboi.org

যেহেতু তারই হবে– সে ফসলে অন্য কারুর কোনো অংশ থাকবে না, তাই সে ফসলের ওশর দেওয়ার দায়িত্ব তাকেই পালন করতে হবে।

মালিক যদি অন্যকে ধার স্বরূপ চাষ করা ও ফসল ফলানোর জন্যে জমি দেয়, তার বিনিময়ে কিছুই গ্রহণ না করে, তাহলে যে লোক সে জমি চাষ করল ও ফসলের অধিকারী হলো, অন্য কাউকে সে ফসলের ভাগ দিতে হলো না এরূপ অবস্থায় সে ফসলের ওশর সেই ধার স্বরূপ– জমি– গ্রহণকারীকেই দিতে হবে। কেননা জমি চাষ করে সে-ই উপকৃত হয়েছে ও ফসল লাভ করেছে।

জমি চাষে যদি অন্য লোককে শরীক করা হয় ফসলের নির্দিষ্ট অংশ দেওয়ার ভিত্তিতে যেমন বর্গা চাষ, তাহলে উভয়ই ফসলের ভাগ পায় বলে উভয়কেই নিজ নিজ অংশ থেকে ওশর দিতে হবে– যদি সে ফসল নিসাব পরিমাণ হয়। সেই ভাগের জমির ফসল এবং সে জমি ছাড়া অপর কোনো জমির ফসল পাওয়ার ফলে কোনো এক পক্ষের মোট প্রাপ্ত ফসল নিসাব পরিমাণ হলে তার ওশর তাকেই দিতে হবে। ইমাম শাফিয়ী ও ইমাম আহমদের একটি মতে চাষের শরীক উভয় পক্ষই এক অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে গণ্য হবে, উভয়ের প্রাপ্ত মোট ফসল নিসাব পরিমাণ হলে সেই মোট ফসলের ওশর দিতে বাধ্য হবে এবং প্রত্যেকেই নিজের অংশ থেকে ওশরের অংশ দিয়ে দেবে।

জমি ইজারা দেওয়া হলে তার ফসলের ওশর কে দেবে, এ পর্যায়ে ইমামগণের মত বিভিন্ন। ইমাম আবূ হানীফার মতে জমির মালিকই ওশর দেওয়ার জন্যে দায়িত্বশীল হবে। কেননা তাঁর মতে, ওশর হচ্ছে প্রবৃদ্ধিশীল জমির ওপর ধার্য হক্; ফসলের হক্ নয়। আর এ অবস্থায় জমি তার মালিকেরই রয়ে গেছে, মালিকানা হস্তান্তরিত হয়নি। ওশর হচ্ছে জমির অবদান। কিন্তু ইমাম মালিক, ইমাম শাফিয়ী ও ইমাম আহমদ মনে করেন, ওশর ইজারা বাবত জমি গ্রহণকারীকে দিতে হবে, মালিককে নয়। কেননা এঁদের মতে ওশর হচ্ছে ফসলের ওপর ধার্য হক্। আর বর্ণিত অবস্থায় ফসলের মালিক হয় ইজারাদার। তা জমির ওপর ধার্য হক্ নয় বলে জমির মালিক ওশর দিতে বাধ্য নয়।

কোনো কোনো হাদীসবিদ ফকীহ্ আলিম মত দিয়েছেন যে, এরূপ অবস্থায় জমির মালিক ও ইজারাদার উভয়ই ওশর দিতে বাধ্য হবে। ইজারাদার দেবে তার প্রাপ্ত ফসল থেকে এবং মালিক দেবে ইজারাদান বাবত প্রাপ্ত সম্পদ থেকে।[১]

এই গ্রন্থকারের দৃষ্টিতে এ মতই অগ্রাধিকার পাওয়ার যোগ্য।

---

১. বাদায়েওস্-সানায়েও, ২য় খণ্ড, ৫৪ পৃ.

www.amarboi.org

ওশর ফরয হওয়ার শর্ত

ওশর ফরয হওয়ার জন্যে প্রথম শর্ত জমি-মালিকের মুসলিম হওয়া। তা আগেই বলা হয়েছে। কেননা তা আল্লাহ্‌র হক হিসেবে একটি ইবাদতের ব্যাপারও, যা কেবলমাত্র মুসলমানদের জন্যেই করণীয় হতে পারে।

শরীয়ত পালনের দায়িত্ব অর্পিত হওয়ার জন্যে সাধারণত পূর্ণ বয়স্ক ও সুস্থ জ্ঞান-বুদ্ধি থাকা শর্ত হয়ে থাকে। কিন্তু যাকাতের ন্যায় ওশর ফরয হওয়ার জন্যে এ দুটির শর্ত করা হয় নি, জমির মালিক না-বালেগ ও পাগল হলেও জমিতে ফসল হলে তা থেকে ওশর অবশ্যই আদায় করতে হবে। এ দুজনের অভিভাবকরাই দায়িত্বশীল হবে তা দেওয়ার জন্যে।[১]

অনুরূপভাবে জমির মালিক হওয়ার শর্ত নয়। তাই ওয়াক্‌ফকৃত জমি ফসলেও ওশর ধার্য হবে, যদিও তার মালিক কেউ নয়। উপরন্তু অপর কারুর জমি ধার স্বরূপ কিংবা ইজারা নগদ টাকার বিনিময়ে বা বর্গা স্বরূপ চাষ করলে ও ফসল ফলালে তা থেকেও ওশর দিতে হবে; দেবে সে– যে ফসল ফলিয়েছে। জমির মালিক তা দিতে বাধ্য হবে না।[২]

সরকারী খাজনা ওশর

আমরা দেখিয়েছি, ওশর ইবাদতের সাথে সাথে রাষ্ট্র-সরকার আরোপিত ভূমিকরও। তাই অ-ইসলামী সরকার কর্তৃক ধার্যকৃত খাজনা দিলে ওশর দেওয়ার দায়িত্ব এড়ানো যাবে না। সে খাজনা দিতে থাকলেও ওশরও দিতে হবে। কেউ যদি ব্যবসার লক্ষ্যে জমি ক্রয় করে এবং তাতে চাষ করে ও ফসল ফলায়, তা হলে সে ফসলের ওপর ওশর ধার্য হবে, ব্যবসায়ী যাকাত নয়। কেননা জমির আসল যাকাত-ই হচ্ছে ওশর, ব্যবসার নিয়তের দরুণ তার ওপর অপর কোনো যাকাত ধার্য হবে না। যেমন ব্যবসার উদ্দেশ্যে কেউ যদি গৃহপালিত পশু পালে, তাহলেও তার যাকাত-ই হবে, যা গৃহপালিত পশুর জন্যে নির্দিষ্ট রয়েছে, ব্যবসায়ী যাকাত নয়। যেমন আয়কর দিলে ওশর আদায় হয়ে যায় না।[৩]

কোনো জমিতে পানি সেচের প্রয়োজন কিছুটা বৃষ্টি থেকে এবং কিছুটা কূপ, নল, পাইপ বা অন্য কোনোভাবে পূরণ হয়, তাহলে বেশি পানি যেভাবে পাওয়া যায়, তার ভিত্তিতেই ওশর বা অর্ধ-ওশর ধার্য হবে। বেশির ভাগ পানি স্বাভাবিক প্রাকৃতিক

---

১. বাদায়েও, দুররুল মুখতার, জাওয়াহিরুল ফিক্‌হ, ২য় খণ্ড, ২৭২ পৃ.
২. বাদায়েওস্‌ সানায়েও, ২য় খণ্ড ৫২ পৃ. জাওয়াহিরুল ফিকহ, ২য় খণ্ড, ২৭৪ পৃ.
৩. ঐ, ২য় খণ্ড, ৬২ পৃ. ২য় খণ্ড, ১৭৪ পৃ.

www.amarboi.org

উপায়ে পাওয়া গেলে ওশর আর কৃত্রিম উপায়ে বেশির ভাগ পানি পাওয়া গেলে অর্ধ-ওশর ধার্য হবে। হানাফী ফিক্‌হ বিশেষজ্ঞ আল-কা-সানী লিখেছেন ঃ

ولو سقى الزرع فى بعض السنة سيحا وفى بعضها بالة يعتبر فى ذلك الغالب

ফসলে বছরের কিছু সময় যদি স্বাভাবিক সেচ হয় এবং অবশিষ্ট সময় কৃত্রিমভাবে যন্ত্রপাতির সাহায্যে হয়, তা হলে বেশির ভাগকে গণ্য করে ওশর পরিমাণ নির্ধারণ করা হবে।[১]

ওশরী ও খারাজী জমির পার্থক্য

ওশর ও খারাজ-এর মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। এ দুটি মৌলিকভাবেই দুটি ভিন্ন ভিন্ন হক্। ওশর-এ 'ইবাদতের তাৎপর্য ও ভাবধারা নিহিত'। আর খারাজ-এ রয়েছে কিছুটা শাস্তির দিক। ওশর জমি ফসলের সাথে সংশ্লিষ্ট। আর 'খারাজ' অমুসলিম যিম্মী নাগরিকদের ওপর মাথাপিছু ধার্য হওয়া কর। ওশর-এর ব্যয়ের খাত কুরআন ঘোষিত আটটি। আর খারাজ ব্যয় করতে হয় সাধারণ জনকল্যাণ ও উন্নয়নমূলক কাজে। তা ছাড়া 'ওশর' কুরআন ও হাদীসের সুস্পষ্ট ও অকাট্য দলীল দ্বারা প্রমাণিত। আর খারাজ-এর দলীল হচ্ছে ইজতিহাদ। ইজতিহাদ করেই খারাজ ধার্য করার রীতি চালু করা হয়েছে এবং তা সাধারণ জন-কল্যাণকর কাজের পরিকল্পনার ওপর ভিত্তিশীল।[২]

জমিতে বাস্তবত ফসল ফললেই তা থেকে ওশর দিতে হয়। কেননা ওশর ফসলের ওপর ধার্য, উৎপন্ন ফসলেরই অংশ। কিন্তু খারাজ সেরূপ নয়। খারাজী জমিতে ফসল হোক আর না-ই হোক, খারাজ অবশ্যই দিতে হবে। কিন্তু ফসল না ফললে বা ফলালে ওশর দিতে হয় না।[৩]

খারাজ-এর ইতিহাস

মদীনার ইসলামী রাষ্ট্রই সর্বপ্রথম ভূমিকর হিসেবে খারাজ ধার্য করেনি। প্রাচীন সভ্যতার ইতিহাসে উল্লেখিত হয়েছে, হযরত ইউসূফ (আ) এই কর ধার্য করেছিলেন। তখন মিসরে প্রচণ্ড ও সর্বগ্রাসী দুর্ভিক্ষ ও অনাহার চলছিল। ফলে জনগণ তাদের রক্ষিত স্বর্ণ-রৌপ্য ও পালিত পশু বিক্রয় করে দিতে বাধ্য হয়েছিল। সেসব বিক্রয় করার পর তাদের হাতে শুধু ক্ষেতের জমি অবশিষ্ট ছিল। শেষকালে তাও তারা খাদ্যের বিনিময়ে বিক্রয় করে দিতে বাধ্য হয়েছিল। এ

১. বাদায়েওস্ সানায়েও, ২য় খণ্ড ৫২ পৃ. জাওয়াহিরুল ফিকহ, ২য় খণ্ড, ২৭৪ পৃ.
২. আল-মালিয়াতুল আম্মাতুল ইসলামিয়া, ২৭৮ পৃ. ৩. ঐ

www.amarboi.org

সময় থেকে জমির মালিক হয় শাসকরা, আর তা চাষাবাদ ও ফসল ভোগ করত কৃষিজীবি খারাজ দেওয়ার বিনিময়ে। ঐতিহাসিকদের মতে প্রাচীন প্রত্যেকটি সভ্যতার আমলে রোমান ও পারস্য সাম্রাজ্যের অধীনও জমির মালিকানা রাজা-বাদশাহরাই ভোগ করেছেন।[১]

এ দুটি সভ্যতায় ভূমি-করই ছিল অর্থব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি

ইসলামের ইতিহাসে রাসূলে করীম (স) এবং প্রথম খলীফা হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর আমলে খারাজ চালু হয়নি। দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর ফারূক (রা)-এর সময়ই তা চালু হয়।

তাঁর সময়েই সিরিয়া, ইরাক ও মিসর যুদ্ধের ফলে ইসলামী রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হয়। তখন ইরাক বিজয়ী বাহিনী-প্রধান হযরত সা'আদ ইবনে আবূ ওক্কাস (রা), মিসর বিজয়ী সেনাপতি হযরত 'আম্‌র-ইবনুল 'আস (রা) এবং সিরিয়া বিজয়ী সেনাপতি হযরত আবূ উবায়দা ইবনুল জাররাহ্ (রা) মুজাহিদদের দাবি অনুযায়ী বিজিত এলাকার জমিগুলো গণীমতের মাল হিসেবে তাঁদের মধ্যে বণ্টন করে দেওয়ার আহ্বান জানিয়ে খলীফাতুল মুসলিমীনের কাছে পত্র পাঠালেন। তিনি সে পত্রের জবাবে মুজাহিদদের দাবি অস্বীকার করে শুধু অস্ত্রশস্ত্র, পোশাক-বর্ম ও অন্যান্য বহনযোগ্য দ্রব্যাদি বণ্টন করার এবং জমিসমূহ সেসবের পূর্বের মালিকদের নিকট থাকতে দিয়ে জমির ওপর খারাজ ধার্য করার নির্দেশ পাঠালেন।[২]

কিন্তু খলীফাতুল মুসলিমীনের উপরোক্ত নির্দেশ কয়েকজন বিশিষ্ট মুজাহিদ সাহাবীর মনে প্রচণ্ড ক্ষোভের সৃষ্টি করে। পরে এ বিষয়ে চূড়ান্ত ফয়সালা গ্রহণের জন্যে রাজধানী মদীনায় সাহাবীদের উপস্থিতিতে পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে উদ্বোধনী ভাষণে খলীফা বললেন, 'জমিগুলো বিজয়ী মুজাহিদদের মধ্যে বণ্টন করে দিলে তাতে স্থায়ী ও বংশানুক্রমিকভাবে মীরাসী আইন কার্যকর হতে থাকবে। তা হলে রাষ্ট্রের সাধারণ প্রয়োজন কি করে পূরণ করা হবে ? চতুর্দিকে সৈন্য সমাবেশ করার ব্যয়ভার কেমন করে বহন করা যাবে ? তোমরা কি ভেবে দেখেছ, এসব কাজের জন্যে লোক নিয়োগ করা হবে এবং তাতে খরচ সরকারকেই বহন করতে হবে ? সিরিয়া, জাযীরাতুল আরব, কুফা, বসরা, মিসর প্রভৃতি দেশ ও অঞ্চলসমূহ রক্ষার জন্যে সৈন্য মোতায়েন রাখা একান্তই প্রয়োজন। তা ছাড়া আরব ও ইসলামী রাষ্ট্রের অধীন বিশাল এলাকার পরবর্তী

---

১. তামাদ্দুন ই-ইসলামী,জরযীযায়দান, ১ম খণ্ড, ২০০ পৃ.

২. ঐ, ২৫ পৃ. কিতাবুল খারাজ, ২৪ পৃ.

www.amarboi.org

বংশধর, সম্ভ্রান্ত ও বিধবাদের প্রয়োজন পূরণের দায়িত্বও সরকারের ওপরই বর্তায়। ..... আসলে আমি যা দেখতে পাচ্ছি, তোমরা তা দেখ না। ..... এসব কারণে জমিগুলো পূর্ব-মালিকদের দখলে রেখে তার ওপর খারাজ ধার্য করাই উত্তম।[১]

হযরত উমর (রা) তাঁর মত প্রকাশকালে কুরআনের কয়েকটি আয়াতকে দলীল হিসেবে পেশ করলেন। একটি আয়াত এই ঃ

مَآ اَفَاءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مِنْ اَهْلِ الْقُرٰى فَلِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ لا كَىْ لَا يَكُوْنَ دُوْلَةًۢ بَيْنَ الْاَغْنِيَاۗءِ مِنْكُمْ ط وَمَآ اٰتٰكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ ق وَمَا نَهٰكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا ج وَاتَّقُوا اللّٰهَ ط اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ م ۝

আল্লাহ যা কিছু গ্রামবাসীদের থেকে তাঁর রাসূলকে ফিরিয়ে দিয়েছেন; তা আল্লাহ্‌র জন্যে রাসূলের জন্যে নিকটবর্তীদের জন্যে, ইয়াতীম-মিসকীন ও নিঃস্ব পথিকদের জন্যে, যেন ধন-সম্পদ কেবল তোমাদের ধনী লোকদের মধ্যেই আবর্তিত হতে না থাকে। আর রাসূল তোমাদেরকে যা দেবেন তা-ই তোমরা গ্রহণ করো। এবং যা থেকে তোমাদের নিষেধ করেন, তোমরা তা থেকে বিরত থাকো। আর আল্লাহ্‌কে ভয় করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ কঠিন আযাবদাতা। (সূরা হাশর ঃ ৭)

لِلْفُقَرَاۗءِ الْمُهٰجِرِيْنَ الَّذِيْنَ اُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَاَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانًا وَّيَنْصُرُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ط اُولٰۗئِكَ هُمُ الصّٰدِقُوْنَ ۝

যেসব লোক তাদের ঘর-বাড়ি ও ধন-মাল থেকে বহিষ্কৃত হয়েছে, সেই মুহাজীর ফকীরদের জন্যে। তারা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি পেতে চায় এবং তারা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের সাহায্য করে। বস্তুত তারাই সত্যবাদী সততাপন্থী। (সূরা হাশর ঃ ৮)

وَالَّذِيْنَ تَبَوَّؤُ الدَّارَ وَالْاِيْمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّوْنَ مَنْ هَاجَرَ اِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُوْنَ فِىْ صُدُوْرِهِمْ حَاجَةً مِّمَّآ اُوْتُوْا وَيُؤْثِرُوْنَ عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ط وَمَنْ يُّوْقَ شُحَّ نَفْسِهٖ فَاُولٰۗئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۝

---

১. আল মালিয়াতুল আম্মাতুল ইসলামিয়া, পৃ. ২৭৫-২৭৬ কিতাবুল খারাজ, আবূ ইউসূফ ৩২ পৃ.

www.amarboi.org

আর যারা তাদের পূর্বেই ঘর-বাড়ি ও ঈমানের আশ্রয় নিয়েছিল, তাদের নিকট হিজরত করে আসা লোকদেরকে তারা ভালোবাসে, তাদের যা দেওয়া হয়েছে, তারা নিজেদের মনে তা থেকে কিছু পাওয়ার প্রয়োজন বোধ করে না; বরং তাদেরকে তারা নিজেদের ওপর অগ্রাধিকার দেয় তাদের নিজেদের ক্ষুধা থাকা সত্ত্বেও। বস্তুত যে লোকেরা নিজের মনের লোভ সংবরণ করে, তারাই সফলকাম। (সূরা হাশর ঃ ৯)

وَالَّذِيْنَ جَاءُوْا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِاخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالْاِيْمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِيْ قُلُوْبِنَا غِلًّا لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا رَبَّنَا اِنَّكَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ۞

আর যারা তাদের পরে এসেছে, তারা বলে ঃ হে আমাদের রব্ব, আমাদের ক্ষমা করো, ক্ষমা করো আমাদের সেই ভাইদের যারা আমাদের পূর্বে ঈমান এনেছে এবং আমাদের অন্তরে ঈমানদারদের প্রতি কোনো বিদ্বেষ সৃষ্টি করো না। হে রব্ব, তুমি বড়ই অনুগ্রহশীল ও বড়ই দয়াবান। (সূরা হাশর ঃ ১০)

এ আয়াতসমূহ পরপর পেশ করে তিনি বললেন, 'এসব কয়টি আয়াতেই পরে আসা লোকদের অধিকারের কথা বলিষ্ঠভাবে বলা হয়েছে। কাজেই 'ফাই' সম্পদে বর্তমান ও ভবিষ্যত-এর সব মুসলমানকেই শরীক করতে হবে। তাহলে এ ক্ষেত্রকে কি করে বর্তমানের মুজাহিদদের মধ্যে বন্টন করে দিতে পারি ? পরে যারা আসবে, তাদেরকে বঞ্চিতই বা করতে পারি কি ভাবে ?

শুরুতেই তিনি বলেছিলেন, 'আমি আপনাদেরকে আমার ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে শরীক করতে যাচ্ছি। আমি তো আপনাদেরই একজন। আমার মতকেই আপনারা মেনে নেবেন, এমন কথা আমি বলছি না। আপনারা নিজেরাই প্রকৃত সত্য সম্পর্কে পূর্ণ অবহিত। যারা মনে করে যে, আমি তাদের প্রতি জুলুম করছি, তাদের কথাও আপনারা শুনেছেন। আমি জুলুম করা থেকে আল্লাহ্‌র নিকট পানাহ্ চাই। হ্যাঁ, আমি যদি তাদের কোনো জিনিস অন্য কাউকে দিয়ে থাকি, তা হলে অবশ্য আমি অন্যায়ই করেছি। কিন্তু এখানে তো সে রকম কোনো ব্যাপার নয়।

শেষে উপস্থিত সবাই একবাক্যে বলে উঠলেন, 'আপনার মতই ঠিক এবং আমরা সবাই আপনার কথার যৌক্তিকতা স্বীকার করছি।

এভাবে বিজিত অঞ্চলের জমি তার অমুসলিম পূর্ব-মালিকদের ভোগ দখলে রেখে দিয়ে তার ওপর খারাজ ধার্য করার রীতি চালু হয়ে গেল এবং তা রাষ্ট্রীয় বায়তুলমালের একটা আয়-উৎস হিসেবে নির্ধারিত হলো।[১]

---

১. কিতাবুল আমওয়াল, আবূ উবায়দ, বন্দ , ২৫৬, ৩৫ পৃ. আল-মালিয়াতুল আম্মাতুল ইসলামিয়া, পৃ. ২৭৫

www.amarboi.org

খারাজ-এর যৌক্তিকতা

পূর্বোদ্ধৃত বিস্তৃত আলোচনার প্রেক্ষিতে বিজিত জমির ওপর খারাজ ধার্য হওয়ার যৌক্তিকতা আমরা এভাবে বিশ্লেষণ করতে পারি ঃ

১. খারাজ ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় বায়তুলমালের একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ আয় উৎস। সেনাবাহিনী গড়ে তোলা, ইসলামের দুশমনদের দমন ও তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা প্রভৃতি ছাড়াও সামষ্টিক আইন-শৃংখলা রক্ষা ও নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দান পর্যায়ের যাবতীয় প্রশাসনিক ব্যয় বহন এই আয় দ্বারা সম্পন্ন করা।

২. তা হবে মুসলমানদের বংশ পরম্পরায় শক্তি বৃদ্ধির উৎস। যুগ যুগ ধরে তা মুসলমানদের জন্যে 'ফাই' সম্পদ হিসেবে ব্যবহৃত হতে থাকবে; অর্থনৈতিক শক্তিতে তারা তাদের শত্রুদের মুকাবিলায় বলীয়ান হয়ে থাকবে।[১]

৩. জমি বন্টন ও মুসলমানদের কৃষিকাজে মশগুল হওয়ার পরিমাণ জিহাদ পরিত্যক্ত হওয়া এবং তার ফলে মুসলিম উম্মতের দুর্বল হয়ে পড়া অবধারিত বিধায় শেষ পর্যন্ত সে জমি তাদের হাত ছাড়া হয়ে যাওয়ার আশংকা প্রতিরোধ।

৪. খারাজ ধার্য করার ফলে জমির মালিকানা বিক্ষিপ্ত হওয়ার পথ রুদ্ধ হয়ে যায়। তার মালিকানা বিক্ষিপ্ত করে দেওয়া হলে পরবর্তীকালের লোকদের জন্যে কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না।[২]

শক্তি প্রয়োগের ফলে অধিকৃত জমি সম্পর্কে চূড়ান্ত আলোচনা

শক্তি প্রয়োগের ফলে অধিকৃত জমি সম্পর্কে শাফিয়ী মাযহাবের মত হচ্ছে, তা গণীমত লাভকারী মুজাহিদদের মধ্যে বন্টন করা ওয়াজিব। এ মতের সমর্থনে কুরআন ও সুন্নাতের দলীল উদ্ধৃত হয়েছে। সূরা আনফাল-এর আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

وَاعْلَمُوْٓا اَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّنْ شَىْءٍ فَاَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهٗ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ

এবং তোমরা জানবে, যে জিনিস-ই তোমরা গনীমত হিসেবে পাও, তার এক-পঞ্চমাংশ আল্লাহ্‌র রাসূল, নিকটাত্মীয়, ইয়াতীম, মিসকীন ও নিঃস্ব পথিকদের জন্যে। (আয়াত ঃ ৪১)

---

১. কিতাবুল আমওয়াল, আবূ উবায়দ, বন্দ ১৪৯, পৃ. ৮২

২. কিতাবুল খারাজ, ইয়াহ্ইয়া ইবনে আদাম, পৃ. ৪৬

www.amarboi.org

এ আয়াত অনুযায়ী গণীমত হিসেবে লব্ধ সব মাল থেকেই এক-পঞ্চমাংশ রেখে অবশিষ্ট সব মুজাহিদদের মধ্যে বণ্টন করা ফরয প্রমাণিত হয়।

আর সুন্নাতের দলীল হচ্ছে, নবী করীম (স) যুদ্ধ করে খায়বর জয় করার পর সেখানকার জমি মুজাহিদদের মধ্যে বণ্টন করে দিয়েছিলেন। বনূ কুরাইজা গোত্রকে উচ্ছেদ ও নির্বাসিত করার পর সেখানকার জমিও তাই করেছিলেন। আর তা বণ্টন করা না হলে মুজাহিদদেরকে অন্য কোনো ভাবেই হোক সন্তুষ্ট করতে হবে– হুনায়ন যুদ্ধের পর তা-ই করেছিলেন।[১]

মালিকী মাযহাবের মত হচ্ছে, যুদ্ধ জয়ে অধিকৃত জমি বণ্টন করা হবে না। বরং তা সাধারণ মুসলমানদের জন্যে 'ওয়াক্‌ফ' হয়ে থাকবে। তা কারোর মালিকানাভূক্ত হবে না। তার খারাজ বাবদ লব্ধ সম্পদ মুসলমানদের কল্যাণে ব্যয় করতে হবে। তবে ইসলামী সরকার যদি কোনো সময় তা বণ্টন করে দেওয়ায় সার্বিক কল্যাণ মনে করে তবে তা করা নিষিদ্ধ নয়।[২]

এ মতের সমর্থনে উল্লেখিত হয়েছে যে, নবী করীম (স) জানতেন যে, সাহাবীগণ জমির ওপর খারাজ ধার্য করেছেন। তিনি তার বিপরীত কিছু করতে বলেননি বরং তা-ই বহাল থাকতে দিয়েছেন। হযরত উমর (রা) মিসর, সিরিয়া ও ইরাক জয় করার পর সমস্ত জমি ওয়াক্‌ফ করেছিলেন, তা-ও এ মতের একটি দলীল।

হানাফী এবং হাম্বলী মাযহারের প্রসিদ্ধ মত হচ্ছে, এ ক্ষেত্রে করণীয় নির্ধারণের পূর্ণ এখতিয়ার ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান অর্থাৎ সরকারের রয়েছে। তা বণ্টন করা যেতে পারে, মুসলমানদের জন্যে ওয়াক্‌ফ করেও রাখা যেতে পারে। এ পর্যায়ে সূরা আনফাল-এর পূর্বোদ্ধৃত আয়াতই হচ্ছে এ মতের কুরআনী দলীল। আর সুন্নাতের দলীল হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে, নবী করীম (স) খায়বরের জমির অর্ধেক বণ্টন করে দিয়েছেন। আর বাকী অর্ধেক সাধারণ মুসলমানের কল্যাণের কাজে ব্যয় করার লক্ষ্যে ওয়াক্‌ফ করে রেখে দিয়েছিলেন। এসব থেকে প্রমাণিত হয় যে, বণ্টন করা ও ওয়াকফ্ করে রাখা এ দুটির যে কোনো একটা পন্থা গ্রহণের অধিকার ইসলামী রাষ্ট্রপ্রধানের রয়েছে।[৩]

খারাজ হয় জমির পরিমাণ ও উৎপন্ন ফসলের প্রকারের দৃষ্টিতে ধার্য হবে, না হয় ধার্য হবে উৎপন্ন ফসলের অংশ গ্রহণের ভিত্তিতে।

---

১. আল-আহকামুস্-সুলতানিয়া, মাওয়ার্দী ১৫৬ পৃ.

২ বিদায়াতুল মুজতাহিদ, ইবনে রুশদ ১ম খণ্ড, ৩৮৬ পৃ.

৩. আল-মালিয়াতুল-আম্মাতুল ইসলামিয়া ৩৮০-৩৮১ পৃ.

www.amarboi.org

‘খারাজ’ কর-এর বিশেষত্ব

‘খারাজ’ কর-এর বিশেষত্ব পর্যায়ে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো লক্ষ্যণীয় ঃ

১. ‘খারাজ’ হচ্ছে কৃষি জমির আয়ের ওপর ধার্য প্রত্যক্ষ কর; তার মালিকানার ওপর ধার্য নয়। এ কারণে জমি অনুৎপাদনশীল হলে খারাজ মাফ করে দেওয়া হয়। আর জমি যতদিন পর্যন্ত অনুরূপ অবস্থায় থাকবে, ততদিন খারাজ দেওয়া হবে না।

কার্যত কৃষি জমির ওপরই কেবল খারাজ ধার্য হয় না, চাষযোগ্য ও ফসল দিতে সক্ষম জমির ওপরও তা ধার্য হয়, কার্যত চাষাবাদ করা না হলেও এমন কি তাতে কোনো আমদানী না হলেও। প্রখ্যাত ফিক্‌হবিদ আল-আশ্‌রাম ও মুহাম্মাদ ইবনে আবুল হার্‌ব-এর নিকট জিজ্ঞেস করা হয়েছিল ঃ এক ব্যক্তির দখলে খারাজী জমি রয়েছে; কিন্তু সে তা চাষাবাদ করছে না। এখন তার ওপর খারাজ ধার্য হবে কি না ? জবাবে তাঁরা উভয়ই বললেন, ‘নিশ্চয়ই। العامر والغامر –‘উৎপাদনকারী ও পরিত্যাগকারী উভয়ের ওপর সমানভাবে ধার্য হবে।[1] এর যুক্তি হলো জমি থেকে ফায়দা লাভ তো সম্ভব। তা সত্ত্বেও সে ফায়দা হারানো বা তা থেকে বঞ্চিত থাকা তার নিজের ত্রুটির দরুনই হচ্ছে। অতএব তার ত্রুটি বা অপরাধের কারণে খারাজ দেওয়ার বাধ্যবাধকতা বন্ধ হতে পারে না।

২. মূলত খারাজ এক সাম্বাৎসরিক কর বিশেষ। বছরে একবার মাত্র তা আদায় করা হয়।

৩. তা ব্যক্তিগতভাবে দেয় কর। এতে বিশেষভাবে লক্ষ্য নিবদ্ধ করা হয় ধনশালী ব্যক্তি এবং তার অর্থনৈতিক কেন্দ্রিকতার ওপর। প্রত্যেক জমির সম্ভাব্য উৎপাদনের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয় খারাজ ধার্য করার সময়। অবশ্য সরকার তার পরিমাণ কমও করতে পারে, পারে বেশি করে ধার্য করতেও। হযরত উমর (রা) জমিতে নিহিত উৎপাদন ক্ষমতার প্রতিই লক্ষ্য দিয়েছেন। অন্য কথায়, খারাজ-এর পরিমাণ নির্ধারণ সরকারের ইজতিহাদের মাধ্যমেই হয়ে থাকে। তাতে জমির অধিক উৎপাদন ক্ষমতা ও কম উৎপাদন ক্ষমতা এবং কৃষির প্রকার ভেদ, সেচ প্রয়োজন পূরণ ও পানি ধারণ ক্ষমতা এবং হাট-বাজার ও বন্দর-শহরের নৈকট্য ও দূরত্বও তাতে বিবেচ্য।

৪. আঞ্চলিক কর ধার্যকরণের ভিত্তিতেই তা ধার্য হয়ে থাকে একটি আয় উৎস হিসেবে ইসলামী রাষ্ট্রের অন্তুর্ভুক্ত ধন-মালের পাত্র মনে করে। ব্যক্তির অবস্থান বা তার নাগরিকত্বের কোনো গুরুত্ব দেওয়া হয় না। যেমন কোনো বিদেশী ব্যক্তি যদি ইসলামী রাষ্ট্রে আশ্রয় গ্রহণ করেও কোনো খারাজী জমি ক্রয় করে চাষাবাদ করে, তাহলে তার ওপর অবশ্যই খারাজ ধার্য হবে।

---

১. الاحكام السلطانية - ابو يعلى ص - ١٢٩

www.amarboi.org

খারাজ দিতে বাধ্য ব্যক্তিবর্গ

যার দখলে খারাজী জমি রয়েছে, সে-ই তার খারাজ দিতে বাধ্য। সে পুরুষ হোক, কি স্ত্রীলোক; অথবা বালক বা বালিকাই হোক। কেননা তা হচ্ছে প্রবৃদ্ধিসম্পন্ন জমির অবদান। প্রবৃদ্ধি লাভে এরা সকলেই সমান। হযরত উমর (রা) তা সাধারণভাবেই ধার্য করেছিলেন। কাউকেই তিনি খারাজ দেওয়ার বাধ্যবাধকতা থেকে বাদ দেন নি। এমন কি 'নহরে মালিক'-এর উপকূলবর্তী কৃষকদের ইসলাম কবুলের সংবাদ পেয়েও তিনি আদেশ পাঠিয়েছিলেন, 'ওদেরকে ওদের জমিতেই থাকতে দাও এবং তাদের নিকট থেকে খারাজ আদায় করতে থাকো'।

খারাজী জমির মালিক যদি তার জমি কাউকে মূল্যের বিনিময়ে বা ধারস্বরূপ বা ভাগ চাষ নিয়মে চাষ করতে দেয়, তাহলে হানাফী মাযহাব মতে তার খারাজ জমি দ্বমালিকই দেবে। আর খারাজী জমি কোনো মুসলমান ক্রয় করলে অথবা খারাজী জমির মালিক অমুসলিম যিম্মী ইসলাম কবুল করলে খারাজ কে দেবে, তা ইতিপূর্বে বলা হয়েছে।[১]

খারাজী জমির বিধান

যুদ্ধ ও শক্তি প্রয়োগের পর বিজিত এলাকার জমি কি করা হবে– তা মুজাহিদদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হবে, কিংবা সামষ্টিক সম্পত্তি হিসেবে তা সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন সংরক্ষিত হবে, এ বিষয়ে যেমন সাহাবীগণের ভিন্ন মত ছিল, তা সামষ্টিক সম্পত্তি হিসেবে সরকারের নিকট সংরক্ষিত রাখার ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়ে যাওয়ার পরও এ বিষয়ে মত-পার্থক্যের সৃষ্টি হয়েছে যে, সেই খারাজী জমি ক্রয় করা মুসলমানদের পক্ষে জায়েজ কি না। আর সেই খারাজী জমি যখন যিম্মীর নিকট থেকে মুসলমানদের নিকট হস্তান্তরিত হয়ে যাবে, তখন সে জমির 'খারাজ' দেওয়া হবে, না 'ওশর' দিতে হবে; কিংবা খারাজ ও 'ওশর' উভয়ই দিতে হবে ? এ পর্যায়ে মত যেমন বিভিন্ন, তেমিন প্রত্যেক মতের সমর্থনে আলাদা আলাদা দলীলও রয়েছে।

অধিকাংশ সাহাবার মত হচ্ছে, খারাজী জমি যিম্মীদের দখলেই থাকবে, তারাই তা চাষাবাদ করবে এবং তার খারাজ-ও তারাই দেবে। ক্রয় বা হিবা-দান-এর মাধ্যমে সে জমি মুসলমানদের দখলে যাওয়া উচিত নয়।

---

১. আল-আহকামুস্ সুলতানিয়া, আবু ইয়ালা, ১৬৯ পৃ.

www.amarboi.org

ইমাম আবূ উবায়দ খারাজী জমি ক্রয় করা অপছন্দনীয় হওয়া পর্যায়ে বহু সংখ্যক হাদীস ও সাহাবার উক্তি উদ্ধৃত করেছেন। তা থেকে স্পষ্ট হয় যে, খারাজী জমি মুসলমানদের হস্তগত হওয়া দুটি কারণে অবাঞ্ছনীয়।

একটি এই যে, সে জমি মূলত মুসলমানদের জন্যে 'ফাই'। মুসলমানরা তা ক্রয় করবে কেন ?

আর দ্বিতীয় কারণ, খারাজ দেওয়া ক্ষুদ্রত্ব স্বীকার করার শামিল। হযরত উমর (রা) মুসলমানদের লক্ষ্য করে বলেছিলেন ঃ

لَاتَشْتَرُوْا رَقِيْقَ اَهْلِ الذِّمَّةِ فَاِنَّهُمْ اَهْلُ خِرَاجٍ وَاَرْضُوْهُمْ فَلَا تَبْتَاعُوْهَا وَلَا يَقْرَبَنَّ اَحَدُكُمْ بِالصَّغَارِ بَعْدَ اِذْنَجَاهُ اللّٰهُ مِنْهُ -

তোমারা যিম্মীদের ক্রীতদাস ক্রয় করবে না। কেননা তারা তো খারাজ দিতে বাধ্য হওয়া লোক। আর তাদের জমি ক্ষেত, তাও তোমরা কিনবে না। তোমাদের কেউ যেন সেই ক্ষুদ্রত্বের নিকটবর্তী না হয়, যা থেকে আল্লাহ্ তাকে নিষ্কৃতি দিয়েছেন।[১]

হযরত উমর (রা)-এর এ কথাটির তাৎপর্য হচ্ছে, খারাজ তো যিম্মী লোকদের ওপর ধার্য হয়ে থাকে। সেই খারাজী জমি যদি যিম্মীদের হাত থেকে মুসলমানদের হাতে চলে আসে ও তাদেরকে তার খারাজ দিতে বাধ্য হতে হয়, তা হলে অবস্থা এই হবে যে, মুসলমানও যিম্মীদের ন্যায় খারাজ দিতে বাধ্য হচ্ছে। আর এই অবস্থাটাই ক্ষুদ্রত্বের অবস্থা, যা থেকে মুসলমানদের দূরেই থাকা উচিত।

কিন্তু তা সত্ত্বেও কয়েকজন সাহাবা ও তাবেয়ীন খারাজী জমি ক্রয় করা মুসলমানদের জন্যে জায়েয মনে করেছেন। তাঁরা হলেন ঃ হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা), মুহাম্মদ ইবনে শিরীন ও উমর ইবনে আবদুল আযীয।

যে জমি সন্ধির ফলে মুসলমানদের দখলিভুক্ত হয়েছে, ইমাম মালিকের মতে সেই জমি সন্ধিকারী অমুসলমানদের হাত থেকে বের হয়ে যাওয়া উচিত নয়। তিনি মনে করেন, সন্ধির ফলে যে জমি ক্রয় করা হয়েছে, তা তার অমুসলিম মালিকের হাতেই থাকা উচিত। কেননা তারা তো বহিরাক্রমণ থেকে নিজেদের ঘর-বাড়ি ও জমি-জায়গা রক্ষা করতে চেষ্টা করেছে, শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়ে বিজয়ী মুসলমানদের সাথে সন্ধি করেছে। এই সন্ধি ভঙ্গকারী কোনো কাজ হওয়া উচিত

১. কিতাবুল আমওয়াল, আবূ উবায়দ, ৫৫ পৃ.

www.amarboi.org

নয়। আর যে জমি যুদ্ধ জয়ের ফলে করায়ত্ত হবে, তা তো মুসলমানদের জন্যে 'ফাই; সম্পদ।[১]

হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীয (র) মনে করেন, আল্লাহ্র ঘোষণা (সূরা তাওবা ঃ ২৯) অনুযায়ী অমুসলিমদের ওপর যে জিযিয়া ধার্য হয়; তা ধার্য করা হয় মাথাপিছু ব্যক্তিগণের ওপর, তা জমির ওপর ধার্য হয় না।[২] অতএব তাদের জমি কিনলে ক্ষুদ্রত্ব গ্রহণ করা হয় না।

ফলে জমির খারাজ দেওয়ার কোনো ক্ষুদ্রত্ব নেই। অতএব তা ক্রয় করাও মুসলমানদের জন্যে অন্যায় কিছু নয়।

মুসলিমদের মালিকানায় খারাজী জমি

হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীয, ইমাম মালিক ইবনে আনাস ও ইমাম আওজায়ী (র) প্রমুখের মত হচ্ছে, মুসলমান খারাজী জমির মালিক হলে তাকে ওশর ও খারাজ উভয়ই দিতে হবে। কেননা ওশর মুসলিম হিসেবে দেয়, জমি যে রকমেরই হোক, ওশর দেওয়া মুসলিম হিসেবেই তার কর্তব্য। আর খারাজ তো জমির ওপর ধার্যকৃত। মুসলমানের মালিকানাভুক্ত হওয়ার পূর্বেই তা সেই জমির ওপর ধার্যকৃত হয়েছে। হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীয খলীফাতুল মুসলিমীন হিসেবে ফিলিস্তীনের গভর্নরকে লিখে পাঠিয়েছিলেন ঃ যার হাতে জমি আছে, তার নিকট থেকে জিযিয়া আদায় করো, তা জিযিয়া আদায় করে দেওয়া মুসলমানদের কর্তব্য। আর জিযিয়া নিয়ে নেয়ার পর অবশিষ্ট থেকে ওশর যাকাত গ্রহণ করবে। তিনি বলতেন, ওশর হচ্ছে ফসলের ওপর ধার্য হক্।[৩] তিনি এ-ও বলেছেন ঃ اَلْخَرَاجُ عَلَى الْاَرْضِ وَالْعُشْرُ عَلَى الْحَبِّ খারাজ জমির জন্যে দিতে হবে। আর ওশর ফসলের ওপর ধার্য হবে।[৪]

ইমাম আবূ উবায়দ বলেছেন ঃ ওশর ও খারাজ-এর মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। এই দুটি ভিন্ন ভিন্ন হক্। খারাজ যে কারণে ধার্য হয়, ওশর ধার্য হয় তা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নতর কারণে। খারাজ হচ্ছে যুদ্ধকারীদের জন্যে দান, তাদের সন্তানদের খাদ্য। আর ওশর-এর ব্যয় খাত হচ্ছে যাকাত ব্যয়ের কুরআন বর্ণিত আটটি খাত (সূরা তাওবা ঃ ৬০) লায়স ইবনে সায়াদী তাবিয়ী ফিকহ্বিদ ওশর দিতে থাকা অবস্থায় খারাজ দেওয়া কিংবা খারাজ দেওয়া অবস্থায় ওশর দেওয়া ফরয মনে করেন না।[৫]

---

১. ঐ, ৮৮ পৃ.,

২. ঐ, حتى يعطى الجزية عن يد وهم صاغرون 'যতক্ষণ না তারা নিজেদের বশ্যতার হাতে ছোট হয়ে জিযিয়া দেবে।

৩. কিতাবল আমওয়াল– আব উবায়দ. ৮৮ প.. ৪. ঐ. ৫. ঐ

www.amarboi.org

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলতেন ঃ

مَا اَحَبُّ اَنْ يَجْتَمِعَ عَلَى الْمُسْلِمِ صَدَقَةُ الْمُسْلِمِ وَجِزْيَةُ الْكَافِرِ -

মুসলিম ব্যক্তির ওপর সাদ্কা ওশর যাকাত ও কাফিরের দেয় জিযিয়া উভয় দেওয়া মুসলমানের কর্তব্য হওয়া আমি পছন্দ করি না।[১]

মুসলিম ব্যক্তি যদি কোনো অনাবাদী মৃত জমি পুনরুজ্জীবিত ও চাষাবাদযোগ্য করে তুলে এবং তা খারাজী জমির পানি দ্বারা সিক্ত হয়, তা হলে সে জমি-ও খারাজী জমি গণ্য হবে। কোনো অমুসলিম যিম্মী যদি সরকারের নিকট থেকে অনুমতি পেয়ে মৃত অনাবাদি জমি আবাদ করে অথবা মুসলিমদের সাথে মিলিত হয়ে যুদ্ধ করে ও সরকার গনীমত বাবদ প্রাপ্ত কোনো জমি তাকে দেয়, তা হলে সে জমিও খারাজী জমি হবে। যিম্মী নিজের ঘরবাড়ি বাগানে পরিণত করে তাতে ফল-ফসল জন্মালে তাও খারাজী হবে এবং তা থেকে খারাজ আদায় করা হবে।

অমুসলিম যিম্মীর মালিকানায় ওশরী জমি

যিম্মী যদি মুসলিম ব্যক্তির নিকট থেকে ওশরী জমি ক্রয় করে নেয়, তা হলে ইমাম আবূ হানীফার মতে সে জমিও খারাজী হয়ে যাবে এবং তা থেকে ওশরের পরিবর্তে খারাজ আদায় করা হবে। কিন্তু ইমাম আবূ ইউসূফের মতে সে জমির ওপর ওশর খারাজ উভয়ই ধার্য হবে। ইমাম মালিক ইবনে নাসেরের মতে তার ওপর কিছুই ধার্য হবে না। কেননা ওশর ধার্য হয় শুধু মুসলমানের ওপর, তার মালের যাকাত হিসেবে ও তাদের নিজেদের পবিত্রতা বিধানের লক্ষ্যে। পক্ষান্তরে মুশরিকদের ওপর তাদের জমি ও পালিত পশুর জন্যে যাকাত ধার্য হতে পারে না। তাঁর মত এ-ও যে, যে মুসলিম ব্যক্তি তার ওশরী জমি অমুসলিমের নিকট বিক্রয় করেছে, তাকেই বরং ওশর দিতে বাধ্য করতে হবে। কেননা সে তার জমি অমুসলিমের নিকট বিক্রয় করে ফরয যাকাত ওশর থেকে মুসলমানদের বঞ্চিত করেছে।[২]

এই পর্যায়ে ইমাম আবূ হানীফার মত অগ্রাধিকার পাওয়ার যোগ্য। কেননা ওশর খারাজ দুটোই জমির সরবরাহ (Provision)। অতএব যে জমির-মালিক ওশর দেওয়ার যোগ্য অর্থাৎ মুসলিম, তার ওপর ওশর ধার্য হবে, আর যে জমির মালিক তা নয় অর্থাৎ অমুসলিম, তার ওপর খারাজ ধার্য হবে। কিন্তু মুসলমান

---

১. কিতাবুল আমওয়াল—আবূ উবায়দ, ৮৮, ৮৯ পৃ. আল-ইসলাম, সাঈদ হাভী, ৩য় খণ্ড, ৬২ পৃ.

২. কিতাবুল আমওয়াল, ৮৯ পৃ. আল-ইসলাম, ৩য় খণ্ড, ৬২ পৃ.

www.amarboi.org

যদি যিম্মীর খারাজী জমি ক্রয় করে, তা হলে তা ওশরী হয়ে যাবে না। কেননা মুসলমানও মোটামুটি ভাবে এমন যে, তার ওপর খারাজ ধার্য হতে পারে।[১]

হানাফী ফিক্‌হবিদগণ বলেছেন ঃ যে জমি শক্তি প্রয়োগের ফলে মুসলমানদের দখলে আসে আর তার পুরানো দখলদাররাই তার ওপর বহাল থাকে কিংবা তাদের সাথে সন্ধি করা হয়, তা হলে তা খারাজী জমিই থাকবে।

এই খারাজ দুই প্রকারের ঃ ১. মুকাসিমা খারাজ ২. মুয়ায্‌যাফ খারাজ। মুকাসিমা খারাজ ফসলের ভাগ দেওয়ার ভিত্তিতে নেওয়া হয়। আর মুয়ায্‌যাফ খারাজ হচ্ছে বাৎসরিক নির্দিষ্ট পরিমাণ নগদ অর্থ দেওয়ার খারাজ।

খারজী জমির মালিক খারাজ নির্ধারিত হওয়ার পর ইসলাম কবুল করলেও তার নিকট থেকে পূর্বানুরূপ খারাজই নেয়া হবে, ওশর নয়।[২]

খারাজী বলে চিহ্নিত কোনো জমি যদি মুসলমানের মালিকানায় এসে যায়, তখন তিনটির মধ্যে যে-কোনো একটি ব্যবস্থা কার্যকর করতে হবে। হয় তার থেকে খারাজ নেওয়া বন্ধ করে ওশর নেওয়া শুরু করতে হবে, নতুবা শুধু খারাজ নেওয়া হবে, ওশর নয়। আর না হয়, ওশর ও খারাজ দুটোই তার নিকট থেকে আদায় করতে হবে। ওশর হবে ফসলের ওপর আর খারাজ নেয়া হবে জমি বাবদ।

এই শেষোক্ত মত জমহুর ফিক্‌হবিদদের। কিন্তু ইমাম আবূ হানীফার মত হচ্ছে, খারাজী জমির ওপর খারাজ স্থায়ীভাবে ধার্য থাকবে, কোনো মুসলমান তার মালিক হলেও তা প্রত্যাহৃত হবে না। আর একই জমির ওপর ওশর ও খারাজ উভয়ই ধার্য হতে পারে না। ঐতিহাসিক ভাবেও দেখা যায়, ইসলামী যুগে একই জমির ওপর ওশর ও খারাজ দুটোই কখনোই ধার্য হয়নি। সওয়াদ এলাকা জয় করার পর হযরত উমর (রা) লোকদের নিকট থেকে শুধু খারাজ নেওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন, ওশর নয় এবং তা সাহাবাগণের সাথে পরামর্শক্রমেই করেছিলেন।[৩] তারিক ইবনে শিহাব বলেছিলেন, বাগদাদের 'নহরে মালিক' এলাকার কৃষকরা যারা খারাজ দিয়ে যাচ্ছিল– ইসলাম কবুল করলে হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) আমাকের লিখেছিলেন ঃ

اَنْ اِدْفَعُوْا اِلَيْهَا اَرْضَهَا وَتُؤَدِّىْ عَنْهَا الْخِرَاجَ -

তুমি ওদের জমি ওদের মালিকানাধীনই থাকতে দাও এবং ওদের নিকট থেকে যথারীতি খারাজ-ই আদায় করতে থাক।[৪]

---

১. কিতাবুল আমওয়াল, ৮৯ পৃ.

২. তুহফাতুল ফুকাহা, ১ম খণ্ড, ২য় উপখণ্ড, ৬৫৬ পৃ. ৩. আল-ইসলাম, ৩য় খণ্ড, ৫৭ পৃ.

৪. Islamic study vol. XIX-1980, Dr. ziauddin.

www.amarboi.org

হাদীসের দলীল হিসেবে এই মতের সমর্থনে রাসূলে করীম (স)-এর কথা ঃ

فِيْمَا سَقَتِ السَّمَاءُ اَلْعُشْرُ وَفِيْمَا سَقَى بِالنَّاضِحِ نِصْفُ الْعُشْرِ -

বৃষ্টির পানিতে সিক্ত জমি থেকে ওশর ও স্বতন্ত্র সেচ ব্যবস্থাধীন জমি থেকে অর্ধ-ওশর আদায় করতে হবে।

এই হাদীস অনুযায়ী জমির ওপর সর্বসাকুল্যে যা ধার্য হতে পারে, তা এই। এর সাথে খারাজ ধার্য হওয়া জায়েজ হলে তা নিশ্চয়ই হাদীসে বলা হতো, অর্ধ-ওশরের কথা বলা হতো না।[১]

জমহুর ফিকহ্‌বিদের পক্ষ থেকে এই যুক্তি ও প্রমাণের জবাব দেওয়া হয়েছে। তার সার কথা হচ্ছে, উক্ত হাদীসটিতে খারাজ ধার্য হওয়ার কথা বলা হয়নি বলেই তা ধার্য হতে পারে না, এমন কথা যুক্তিযুক্ত নয়। কেননা সে কথা অন্য হাদীসে বলা হয়েছে। আর একই মুসলিম ব্যক্তির ওপর (তার খারাজী জমির মালিক হওয়ার কারণে) ওশর ও খারাজ দুটি ধার্য হতে পারে না– এই মর্মে যে বর্ণনাটির দোহাই দেওয়া হয়েছে, সে বর্ণনাটিই বাতিল। তা ইয়াহ্‌ইয়া ইবনে আম্বাসাতা আবূ হানীফা-মুহাম্মাদ-ইবরাহীম নুখঈ-আলকামা-হযরত ইবনে মাসউদ– এই সূত্রে ইবনে জাওযী ও ইবনে আদী কর্তৃক গ্রন্থে উদ্ধৃত হলেও তা মূলতঃ রাসূল করীম (স)-এর কোনো কথা নয়। প্রখ্যাত হাদীস বিশারদ আবূ হাতিম বলেছেন ঃ শেষের বর্ণনাকারী ইয়াহ্‌ইয়া ইবনে আমম্বাসাতা মিথ্যাবাদী, দাজ্জাল, 'ভূয়া হাদীস' রচনাকারী বলে পরিচিত। সে উক্ত বর্ণনা দুটি ইমাম আবূ হানীফার নামে মিছামিছি চালিয়ে দিয়েছে। অবশ্য তা ইবরাহীম নখঈর নিজের উক্তি হতে পারে। কিন্তু ইবরাহীম নখঈর নিজের কথা শরীয়তের দলীল হতে পারে না।[২]

ভূমিকর হিসেবে ওশর-এর অভিনবত্ব

ইসলামের পূর্বে আরব দেশে কোনো স্থানীয় বা কেন্দ্রীয় প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠিত বা কার্যকর ছিল না। জনগণের ওপর কোনো সুসংবদ্ধ রাজস্ব দেওয়ার বাধ্য-বাধকতাও ছিল না। হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর নেতৃত্বে মদীনাতেই সর্বপ্রথম সুসংগঠিত একটি রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। ব্যক্তি বা গোত্রসমূহ ইসলাম কবুল করার পরও নিজেদের দখলভূক্ত জমি-জায়গা যথারীতি ভোগ-দখল করতে থাকে। মদীনার উপকণ্ঠে বসবাসকারী বনু কুরাইজা, বনু নযীর ও বনু কাইনুকা

---

১. তাফসীরে আল-মাযহারী, ১ম খণ্ড, ৩৮৩ পৃ. কিতাবুল আমওয়াল, ১১৩ পৃ.

২. আল-আহকামুস-সুলতানীয়া, মাওয়াদী; ১৭১ পৃ.

www.amarboi.org

প্রভৃতি ইয়াহূদী গোত্রের সাথে প্রথম দিকে যে সন্ধি হয়েছিল, পরে তারাই সে সন্ধির শর্তসমূহ ভঙ্গ করে। এজন্য তারা উচ্ছেদকৃত ও নির্বাসিত হয়। সে সব জমি-জায়গার কিছু অংশ নিজের দখলে রেখে অবশিষ্ট সব জমি মহানবী (স) দরিদ্র সাহাবীগণের মধ্যে বণ্টন করে দেন এবং তাঁদের ওপর কুরআনের বিধান অনুযায়ী ওশর বা অর্ধ-ওশর দেওয়ার বাধ্যবাধকতা আরোপ করেন।

খায়বর বিজয়ের পরে সেখানকার বসবাসকারী ইয়াহূদীদের সাথে নবী করীম (স) যে সন্ধি করেন, তাতে তাদেরকেই তাদের জমি চাষাবাদের অধিকার দেন এবং মুকাসিমা ফসলের ভাগ দেওয়ার শর্ত কার্যকর করেন। ওয়াদিউল কুরা (وادى القرى) ও ফাদাক (فدك)-এর জমির ক্ষেত্রেও সেই নীতিই কার্যকর করা হয়। এই মুকাসিমা নীতিতে প্রাচীন আরবে জমি ভোগ দখল করা হতো। রাসূলে করীম (স)-ও এই নীতিটিকে চালু করলেন। কিন্তু ওশর মুসলমানদের ভূমিকর হিসেবে মহানবী (স) কুরআনের বিধান অনুযায়ী সর্বপ্রথম বারই ধার্য করলেন। ভূমিকর হিসেবে ওশর বা অনুরূপ কিছু ধার্য হওয়ার কোনো দৃষ্টান্ত ইতিহাসে খুঁজে পাওয়া যায় না এবং তা (ওশর) প্রাচীন আরবে অত্যাচারমূলক ধার্যকৃত 'কর' থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের, যেমন যাকাত ব্যবস্থারও কোনো দৃষ্টান্ত পূর্বের ইতিহাসে নেই।[১]

অর্থনৈতিক দৃষ্টিতে ওশর ও খারাজ

ওশর জমির ফসল থেকে দিতে হয়। আর খারাজ দিতে হয় জমি বাবত। জমি অর্থোৎপাদনের একটা বিরাট ও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উৎস। আর খাদ্য জমির ফল বা সফল উৎপাদনের ফলেই পাওয়া সম্ভব। ইসলাম ওশর ও খারাজ ধার্যের ব্যবস্থা করে জমির এই অর্থনৈতিক গুরুত্বেরই স্বীকৃতি দিয়েছে। জমির উৎপাদন থেকে ওশর দেওয়া হলে সে ফসল কেবল জমির মালিক একাই ভোগ করবে না, সমাজের দরিদ্র অভাবগ্রস্ত লোকেরা ওশর-যাকাত বণ্টন অংশ পেয়ে নিজেদের খাদ্য প্রয়োজন পূরণ করতে সক্ষম হবে। একই জমির ফসলে সমাজের প্রায় সব লোকই অংশীদার হবে।

আর জমির ওপর খারাজ ধার্য হলে সে জমির মালিক জমিকে কখনো অনাবাদী অনুৎপাদক বানিয়ে রাখবে না। এ দুটি ব্যবস্থার কারণে জমির ন্যায় প্রধান উৎপাদন-উৎস পুরোপুরি কাজে লাগানো হবে।

মূল আলোচনায় প্রমাণ করা হয়েছে যে, ওশর যাকাত পর্যায়ের আল্লাহ কর্তৃক ধার্যকৃত 'কর' বিশেষ। তার প্রাপক হচ্ছে সমাজের আট শ্রেণীর লোক, যাদের

১. আহকামেল আহ লিয্যিম্মাহ, ইবনুল কাইয়্যেম ১০৫ পৃ.

www.amarboi.org

মধ্যে যাকাত বিতরণের ঘোষণা আল্লাহ নিজেই দিয়েছেন। ফলে ওশর সাধারণ যাকাত-সম্পদের ন্যায় জনগণের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার একটা প্রধান ভিত্তিও। যে সমাজে রীতিমত ওশর আদায় ও বন্টন হবে, সেখানে একটি মানুষও না খেয়ে মারা যেতে পারে না। নাগরিকদের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা দান ইসলামের একটা গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য।

মুফতী মুহাম্মদ শফী (র) লিখেছেন ঃ ওশর যদি এক হিসেবে জমির যাকাত ও ইবাদত পর্যায়ের; কিন্তু তাতে আর একটি দিক রয়েছে, তা হচ্ছে, তা জমির করও। এই কারণে ধন-সম্পদের যাকাত ও ওশরের মধ্যে কিছুটা পার্থক্য আছে। স্বর্ণ-রৌপ্য ও নগদ সম্পদের যাকাত খালস ইবাদত। কিন্তু ওশর ইবাদত হওয়ার সাথে সাথে তা জমির করও। (তাই ওশরী জমির ওপর ওশর ছাড়া অন্য কোনো কর ধার্য হতে পারে না)।[১]

আর খারাজ হচ্ছে ইসলামী রাষ্ট্রের অন্যতম আয়-উৎস। তা সাধারণ জনকল্যাণে ব্যয় হবে। মূলত তা রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন জমি-ক্ষেতের ওপর সরকার কর্তৃত ধার্যকৃত অংশ। অন্য কথায়, খারাজ হচ্ছে জমির ওপর ধার্যকৃত কর; আর শরীয়তের পরিভাষায় মুসলমানদের সন্ধি কিংবা যুদ্ধজয় দ্বারা বিজিত অমুসলিম নাগরিকদের ব্যবহারাধীন জমির কর।

খারাজ জিযিয়া নয়। এ দুটির মধ্যে কয়েকটি দিক দিয়েই পার্থক্য রয়েছে, যদিও অপর কয়েকটি দিক দিয়ে উভয়ের মধ্যে মিলও রয়েছে।

এ উভয়ই অমুসলিম নাগরিকদের নিকট থেকে আদায় করা হয়। আর এ দুটির ব্যয়ের খাত অভিন্ন এবং তা হচ্ছে 'ফাই' সম্পদের খাত। তা আদায় করতে হয় বাৎসরিক হিসেবে পূর্ণ একটি বছর অতিবাহিত হওয়ার পর। বছর পূর্ণ হওয়ার আগে তা আদায় করা যায় না।

এ দুটির প্রামাণিক ভিত্তি এক নয়। খারাজ ধার্য হয় ইজতিহাদের ভিত্তিতে; কিন্তু জিযিয়া কররূপে ধার্য হয় কুরআন ও সুন্নাহ্র অকাট্য দলীলের ভিত্তিতে। অনুরূপভাবে খারাজ-এর কম বা বেশি পরিমাণ নির্ধারিত হয় ইজতিহাদের মাধ্যমে; কিন্তু জিযিয়ার কম-সে কম পরিমাণ নির্ধারণ হয় শরীয়ত দ্বারা। তবে বেশি পরিমাণ নির্ধারণ হয় ইজতিহাদের ভিত্তিতে।[২]

এই পর্যায়ের শেষ কথা হচ্ছে, অমুসলিম ও মুসলিম উভয়ের তরফ থেকে খারাজ নেওয়া যেতে পারে; কিন্তু জিজিয়া নেওয়া হয় শুধু মুসলিমদের নিকট থেকে। তবে তারা ইসলাম গ্রহণ করলে তা তাদের ওপর থেকে প্রত্যাহার করা হয়।

---

১. জাওয়াহিরুল ফিকহ, ২য় খণ্ড, ২৪৬ পৃ.

২. আল-মালিয়াতুল-আম্মাতুল ইসলামীয়া, ২৭৩-২৭৪ প.

www.amarboi.org

প্রথমটিকে 'খারাজুল অযীফা' বলা হয়। আর দ্বিতীয়টিকে বলা হয় খারাজুল মুকাসিমা। প্রথমটির দলীল হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে, হযরত উমর (রা) সওয়াদের জমি দখল করে তা তার ভোগ-দখলকারীদের কাছেই রেখে দিয়েছিলেন এবং জমির ব্যাপ্তির পরিমাণ অনুযায়ী ও তাতে সম্ভাব্য উৎপাদনের প্রকারভেদ অনুপাতে বিভিন্ন পরিমাণের খারাজ ধার্য করে দিয়েছিলেন। এই খারাজ ধার্য হওয়াটা জমি থেকে উপকৃত হওয়ার সম্ভাবনা অনুপাতে হয়ে থাকে। তা চাষাবাদ না করা হলেও তা দিতে হবে। অবশ্য বৃষ্টি-বাদল, বন্যা-স্রোত, পানিবন্দী বা প্রয়োজনীয় সেচ বন্ধ হওয়া ও এ ধরনের কোনো কারণে যদি জমি নষ্ট হয়ে যায়, যাতে জমি-মালিকের ইচ্ছার কোনো সম্পর্ক নেই, তা হলে খারাজ দেওয়া বাধ্যতামূলক হবে না।[১]

আর 'খারাজুল মুকাসিমা' উৎপন্ন ফসলের এক-পঞ্চমাংশ বা এক-ষষ্ঠাংশ কিংবা এভাবে কোনো নির্ধারিত অংশ পরিমাণ খারাজ হিসেবে নেওয়ার চুক্তি হয় এবং চুক্তি অনুযায়ীই তা দিতে হয়। এ নিয়মে খারাজ ধার্য করা সম্পূর্ণ জায়েজ। হযরত মুহাম্মাদ (স) খায়বরবাসীদের সাথে এরূপ চুক্তিই করেছিলেন।[২]

দু' ধরনের খারাজের মধ্যে পার্থক্য

এই দু'ধরনের খারাজ শুরুতেই যিম্মীদের ওপর ধার্য হয় এবং প্রাপ্ত সম্পদ একই খাতে ব্যয় করা হয়। এদিক দিয়ে এ দুটি অভিন্ন। তবে অন্যান্য কতকগুলো দিক দিয়ে এ দুটির মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্যও রয়েছে। পার্থক্যের দিকগুলো এই ঃ

১. 'খারাজুল অযীফা' ব্যক্তির দায়িত্বে দেয় হিসেবে ধার্য হয়, যদি জমি থেকে উপকৃত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। আর খারাজুল মুকাসিমা সংশ্লিষ্ট হয় জমির উৎপন্ন ফসলের সাথে যা বাস্তবে হয়; শুধু সম্ভাবনাই থাকে না। ফলে জমি চাষযোগ্য ও ফসল উৎপাদনে সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও জমি বেকার ফেলে রাখা হলে তাতে এই খারাজ দিতে হবে না। কেননা এ চুক্তি অনুযায়ী উৎপন্ন ফসলেরই ভাগ হয়, ফসল না হলে কি ভাগ হবে।

২. 'খারাজুল অযীফা' বছরে মাত্র একবার দিতে হয়। কিন্তু 'খারাজুল মুকাসিমা' ফসল হলেই দিতে হয়, এক বছরে যত বারই হোক না কেন।

৩. 'খারাজুল অযীফা' নগদ অর্থে আদায় করা হয়; ফসলেও নেওয়া যেতে পারে। কিন্তু 'খারাজুল মুকাসিমা' শুধুমাত্র ফসলেই দিতে ও নিতে হয়।[৩]

---

১. আল-মালিয়াতুল-আম্মাতুল ইসলামীয়া, ২৭৩-২৭৪ পৃ.

২. ঐ, ৩৮৬ পৃ.,

৩. ঐ, ৩৮৪ পৃ.

www.amarboi.org

একটি প্রশ্নের জবাব

খারাজ কর যেখানে কোনো জমি ভোগ-দখলকারী ওপর ধার্য হবে, কিন্তু সে যদি তার জমি চাষাবাদ করতে ও তাতে ফসল ফলাতে কোনো একটি কারণে তা যা-ই হোক অক্ষম থেকে যায়, তাহলে তখন তার সাথে কিরূপ ব্যবহার করা হবে ?

জবাবে বলা যায়, এরূপ অবস্থায় শাফিয়ী ও হাম্বলী মাযহাবের মত হচ্ছে, ইমাম (রাষ্ট্রপ্রধান) জমি দখলদারকে নির্দেশ দেবেন, হয় সে জমি ইজারা দেবে, না হয় সে জমি থেকে হাত তুলে নেবে– দখল ছেড়ে দেবে। কেননা তার হাতে থাকতে দিয়ে জমিকে খারাপ হতে দেওয়া যায় না তার খারাজ দিতে থাকলেও– তাতে জমি মৃত হয়ে যেতে পারে।

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল থেকে বর্ণিত হয়েছে ঃ

যে লোক জায়গা জমি নিয়ে ইসলাম কবুল করবে, তা তারই হবে এবং তার থেকে খারাজ গ্রহণ করা হবে। সে যদি তার জমি ফেলে রাখে, চাষাবাদ না করে, তখন রাষ্ট্রের অধিকার রয়েছে তা এমন ব্যক্তিকে দেওয়ার যে তা চাষাবাদ করবে, যেন জমি খারাপ হয়ে না যায়। কেননা যে জমি খারাপ (পড়ো) হয়ে যায়, তা 'মৃত জমি' গণ্য হয়। আর তার ফলে জনগণ সামষ্টিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়– সে তার খারাজ দিতে থাকলেও।[১]

কিন্তু হানাফী ফকীহগণ মনে করেন, উপরোক্ত অবস্থায় সরকার সে জমি অপর একজনকে 'মুজাবিয়া' পদ্ধতিতে চাষ করার জন্যে দিয়ে দেবে। মূল দখলদারের অংশ থেকে খারাজ আদায় করে নেবে। আর অপর অংশ চাষাবাদকারীকে দেবে। অবশ্য সরকার তা ইজারায় লাগাতে পারে এবং প্রাপ্ত মূল্য থেকে খারাজ নিয়ে নেবে। বায়তুল মালের খরচে তা চাষ করানো যেতে পারে। আর তা-ও সম্ভব না হলে সে জমি বিক্রী করে দেবে এবং বিক্রয়লব্ধ অর্থ থেকে খারাজ নিয়ে নেবে।

এটি জায়েয। কেননা এতে এক ব্যক্তির ক্ষতি হলেও সমষ্টির ক্ষতি রোধ করা সম্ভব। আর ইমাম আবূ ইউসূফ মনে করেন, যে লোক বায়তুল মাল থেকে প্রয়োজন পরিমাণ পায় না, তাকে 'কর্জ' হিসেবে সেই জমি দিতে হবে, যেন সে তা চাষাবাদ করে নিজের প্রয়োজন পূর্ণ করে নেয়।[২]

---

১. আল-মালিয়াতুল-আম্মাতুল ইসলামীয়া ৩৮৪ পৃ.

২. ঐ ৩৮৬ পৃ.

www.amarboi.org

বাংলাদেশের জমি

ওশর ও খারাজ পর্যায়ে এ দীর্ঘ ও বিস্তারিত আলোচনা পাঠ করার প্রেক্ষিতে বাংলাভাষী পাঠকদের মনে স্বভাবতই প্রশ্ন জাগবে যে, বাংলাদেশের জমি সম্পর্কে শরীয়তের ফয়সালা কি ? ...... তা ওশরী, না খারাজী ?

বাংলাদেশের জমি সম্পর্কে এই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ ইসলামী রাষ্ট্রের মজলিসে শূরা কিংবা দেশের ফিকহ ও ভূমি ব্যবস্থা সংক্রান্ত বিষয়ে পারদর্শী কোনো সংস্থার পক্ষেই সম্ভব। কেননা এজন্য যেসব তথ্য সামনে রাখা একান্তই অপরিহার্য, তা এক দীর্ঘ ও ব্যাপক ব্যাপার, যা এক ব্যক্তির পক্ষে আয়ত্তাধীন করা প্রায় অসম্ভব বললেও অত্যুক্তি হয় না।

তবে এ পর্যায়ে প্রখ্যাত আলিম ও শরীয়ত বিশেষজ্ঞ মুফতী মুহাম্মদ শফী যে আলোচনা করেছেন, সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে তা চিন্তা ক্ষেত্রে যথেষ্ট উপাদান হিসেবে গণ্য হতে পারে বলে মনে করি।

তাই মুফতী শফী লিখিত আলোচনার ভিত্তিতে আমি নিম্নলিখিত আলোচনা পেশ করেছি ঃ পাকিস্তান হওয়ার পর অমুসলমানদের যে সব পরিত্যক্ত জমি মুহাজির মুসলমানদের মধ্যে সরকারীভাবে বণ্টন করা হয়েছে, সে সব জমি ওশরী ধরতে হবে, পাকিস্তান হওয়ার পূর্বে তার অবস্থা যা-ই থাক না কেন। কেননা ইংরেজের চলে যাওয়ার পর অমুসলিমদের পরিত্যক্ত জমি সরকারী মালিকানাধীন ও বায়তুল মালের সম্পদ গণ্য হয়েছে এবং সরকারীভাবে তার বণ্টন হওয়ায় সে জমির ওপর মুসলমানদের প্রাথমিক মালিকানা স্বীকৃত হয়েছে। আর শরীয়তের বিধান অনুযায়ী মুসলমানদের প্রথম মালিকানাধীন জমি ওশরীই হতে হবে।

যে সব জমি ইংরেজ আমলে অনাবাদী ছিল, কারুর মালিকানাধীন ছিল না, ইংরেজ সরকার লোকদের মধ্যে তার মালিকানা বণ্টন করেছে, সে সময় মুসলমানরা মূল্যের বিনিময়ে কিংবা বিনামূল্যে লাভ করেছে, তা-ও ওশরী জমি হবে। আর যা অমুসলিমরা পেয়েছে, তা হবে খারাজী জমি। যে সব নতুন জেগে উঠা চর বা সরকারী মালিকানাধীন জমি মুসলমানরা মূল্যে বা বিনামূল্যে পেয়েছে, তাও ওশরী জমি। এছাড়া অমুসলিমদের দখলীভুক্ত জমি সবই খারাজী গণ্য হবে।

এ তিন প্রকারের জমির মধ্যে প্রথমোক্ত দুই প্রকারের জমি ওশরী ও তৃতীয় প্রকারের জমি খারাজী হবে। পাকিস্তান হওয়ার পূর্বে থেকে যে সব জমাজমি মুসলমানদের মালিকানাধীন চলে এসেছে, সে সব জমির ওশরী বা খারাজী হওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্যে একথা জানা দরকার যে, প্রাক-বৃটিশ উপমহাদেশে এবং এ অঞ্চলে মুসলিম বিজয়ের সময় কোনো মুসলমানকে এ জমির মালিক বানিয়ে

www.amarboi.org

দেওয়া হয়েছিল কি না। যদি তা হয়ে থাকে, তা হলে সে জমি আবশ্যই ওশরী হবে। আর যদি তখন প্রাচীন হিন্দু বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের মালিকানাধীন থাকতে দেওয়া হয়ে থাকে, তাহলে সে জমির ওপর খারাজ ধার্য হবে। বাংলাদেশ অঞ্চলে ইসলাম প্রচারকদের আগমনের ফলে তাঁদের দাওয়াতে এতদঞ্চলের বহু অমুসলিম ব্যক্তি ও পরিবার যে ইসলাম কবুল করেছিল, তা এক ঐতিহাসিক সত্য। এরূপ ইসলাম গ্রহণকারীদের জমি-ক্ষেত নিঃসন্দেহে ওশরী হবে, যদি তা এখনো মুসলমানদের মালিকানায় থেকে থাকে। সে কালের অমুসলিম জমি-মালিকদের নিকট থেকে যেসব মুসলমান জমি ক্রয় করেছে বা অন্য কোনো বৈধ উপায়ে তার মালিক হয়েছে, তা ওশরী নয়– খারাজী জমি হবে এবং তার ওপর খারাজই ধার্য হবে। বর্তমানে যে সব জমি মুসলমানদের মালিকানায় রয়েছে এবং তারা তা মুসলমানের নিকট থেকেই পেয়েছে, তা ওশরী হবে। আর যে সব জমি মাঝখানে কোনো অমুসলিমের মালিকানায় চলে গেছে, এর ফলে তা ওশরী থাকেনি; কিংবা এখন তার পূর্ব অবস্থা জানা কোনোক্রমেই সম্ভব নয়– এ সব জমিকে ওশরী গণ্য করাই সমীচীন।[১]

বাংলাদেশের জমির ব্যাপারে একটি পন্থা গ্রহণ করা যায় কি না, ইসলামী শরীয়ত বিশেষজ্ঞগণ তা ভেবে দেখতে পারেন। তা হচ্ছে, বাংলাদেশের জমির অতীত পরিবর্তনশীল অবস্থার নির্ভরযোগ্য ইতিহাস উদ্ধার করা এখন সম্ভব নয়, সম্ভব নয় সে বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের সম্পূর্ণ একমত হওয়া। তাই দেশে ইসলামী হুকুমত কায়েম হওয়ার পর যথাযথ অবস্থাকে ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করে সমস্ত মুসলিম নাগরিকদের ভোগ দখলভূক্ত জমিকে ওশরী এবং সমস্ত অমুসলিম নাাগরিকদের ভোগ দখল ভুক্ত জমিকে খারাজী জমিরূপে ঘোষণা দিয়ে নতুনভাবে ভূমি-ব্যবস্থা শুরু করা তা যেমন সহজ, ঝামেলা মুক্ত তেমনি ইসলামী শরীয়তের সাথে তা সংঙ্গতিপূর্ণ নয়, এমন কথা মনে করার কোনো কারণ আছে বলেও আমি মনে করি না।

১. জাওয়াহিরুল ফিক্‌হ, ২য় খণ্ড, ২৫২-২৭০ পৃ.

www.amarboi.org

যাকাত ব্যয়ের খাতসমূহ

ফকীর ও মিসকীন

['ফকীর' এক বচন, বহুবচনে 'ফুকারা'।'মিসকীন' এক বচন, বহুবচনে 'মাসাকীন'।]

উপরে উদ্ধৃত সূরা তওবা'র আয়াতটি যাকাত ব্যয়ের খাত বা ক্ষেত্র সুস্পষ্টভাবে নির্দিষ্ট করে দিয়েছে। সে খাত হচ্ছে আটটি। তন্মধ্যে প্রথম দুটি খাত হচ্ছে ঃ ফকীর ও মিসকীন। যাকাত সম্পদে আল্লাহ্ তা'আলা সর্ব প্রথমে তাদের জন্যেই অংশ নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। এ থেকে সুস্পষ্ট বোঝা যায়, দারিদ্য ও অভাব-অনটন দূর করাই যাকাতের প্রথম লক্ষ্য। ইসলামী সমাজে দারিদ্র্য ও অভাব-অনটনের কোনো স্থিতি থাকতে পারে না।

তার বড় প্রমাণ, এ পর্যায়ে কথা শুরু করে কুরআন মজীদ সর্বপ্রথম ফকীর ও মিসকীনদের কথাই বলেছে। আর আরবী কথন রীতি হচ্ছে, সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের কথা সর্বপ্রথম বলা। দারিদ্র্য দূর করা ও ফকীর-মিসকীনদের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা বিধানই যাকাত ব্যবস্থার প্রথম লক্ষ্য– যাকাতের আসল উদ্দেশ্য। সেই কারণে নবী করীম (স)-ও কোনো কোনো হাদীসে শুধু এ কথাটিরই উল্লেখ করেছেন। তিনি হযরত মুয়ায (রা)-কে যখন ইয়েমেনে পাঠাচ্ছিলেন, তখন তাঁকে বললেন ঃ

اَعْلِمْهُمْ اَنَّ عَلَيْهِمْ صَدَقَةٌ تُؤْخَذُ مِنْ اَغْنِيَاءِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ –

তাদের জানিয়ে দেবে যে, তাদের ওপর যাকাত ফরয করা হয়েছে, যা তাদের ধনী লোকদের নিকট থেকে নেওয়া হবে এবং তাদের গরীব লোকদের মধ্যে বণ্টন করা হবে।

'ফকীর' ও 'মিসকীন' বলতে কাদের বোঝায় ?

কুরআনের আয়াতে উদ্ধৃত 'ফকীর' ও 'মিসকীন' বলতে কাদের বোঝায় ? এরা কি দুই ধরনের লোক না একই পর্যায়ের এবং অভিন্ন ? হানাফী মতের ইমাম আবূ

www.amarboi.org

ইউসুফ এবং মালিকী মাযহাবের ইবনুল কাসেম মত প্রকাশ করেছেন যে, ফকীর ও মিসকীন বলতে আসলে একই লোক বোঝায়। কিন্তু জমহুর ফিকাহবিদদের মতে এরা আসলেই দুই ধরনের লোক– একই প্রজাতিভুক্ত। আর সে প্রজাতি হচ্ছে অভাব-অনটনে লাঞ্ছিত জনগণ। তবে শব্দ দুটির তাৎপর্য নির্ধারণে তাফসীরকার ও ফিকাহবিদগণ ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। অবশ্য একটি আয়াতে একই প্রসঙ্গে শব্দ দুটি ব্যবহৃত হয়েছে, তাৎপর্য নির্ধারণে এ বিষয়টির প্রতি অবশ্যই গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। এ ঠিক 'ইসলাম' ও 'ঈমান' শব্দদ্বয়ের ব্যবহারের মত। বিশেষজ্ঞগণ বলেছেন, এ দুটি শব্দ এক স্থানে ব্যবহৃত হলে তাৎপর্য ভিন্ন ভিন্ন হবে। তখন প্রতিটি শব্দের একটা বিশেষ অর্থ হবে। আর এ দুটি ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ব্যবহৃত হলে অর্থ হবে অভিন্ন অর্থাৎ একটার উল্লেখ হলে অপরটির অর্থও তার মধ্যে শামিল আছে বলে মনে করতে হবে। এই দৃষ্টিতেই প্রশ্ন উঠেছে, এখানে 'ফকীর' ও 'মিসকীন' এই শব্দদ্বয়ের প্রকৃত তাৎপর্য কি?

শায়খুল মুফাসসিরীন ইমাম তাবারী লিখেছেন, 'ফকীর' অর্থ ঃ

اَلْمُحْتَاجُ الْمُتَعَفِّفُ الَّذِى لَايَسْأَلُ -

সেই অভাবগ্রস্ত ব্যক্তি, যে নিজেকে সর্বপ্রকারের লাঞ্ছনা থেকে রক্ষা করে চলছে, কারুর নিকটই কিছুর প্রার্থনা করে না।

আর 'মিসকীন' হচ্ছে, লাঞ্ছনাগ্রস্ত অভাবী ব্যক্তি, যে চেয়ে ভিক্ষা করে বেড়ায়।

তার এই ব্যাখ্যার সমর্থনে তিনি বলেছেন,– 'মাসকানা'– 'দারিদ্র্য'-শব্দটিই এই কথা বোঝায়, যেমন আল্লাহ তা'আলা ইয়াহুদীদের প্রসঙ্গে বলেছেন ঃ

وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ -

তাদের ওপর লাঞ্ছনা ও দারিদ্র্য চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে।[১] (সূরা বাকারা ঃ ৬১)

সহীহ্ হাদীসে বলা হয়েছে ঃ

সে মিসকীন নয়, যাকে একটি বা দুটি খেজুর দিয়ে দেওয়া হয়; বরং মিসকীন সে, যে নিজেকে পবিত্র রেখে চলে।[২]

তবে এটা 'মিসকীন' শব্দের আভিধানিক অর্থ নয়। অথচ আভিধানিক অর্থই তাদের নিকট গ্রহণীয়। এই কথাটি এ পর্যায়ের, যেমন বলা হয়েছে, 'কুস্তিগিরি দ্বারা শক্তিমত্তার পরিচয় হয় না, শক্তিধর সে, যে ক্রোধের সময় নিজেকে সামলাতে পারে।'

---

১. تفسير الطبرى ج ١٤ ص ١٠٨

২. বুখারী ও মুসলিম–বর্ণনাকারী হযরত আবূ হুরায়রা (রা)।

www.amarboi.org

এই কারণে ইমাম খাত্তাবী বলেছেন ঃ লোকেরা বাহ্যত তাকেই মিসকীন বলে মনে করে, যে ভিক্ষার জন্যে ঘুরে বেড়ায়। কিন্তু নবী করীম (স) তাকে মিসকীন বলেন নি। কেননা সে তো ভিক্ষা করে প্রয়োজন পরিমাণ- অনেক ক্ষেত্রে তার চাইতেও অধিক আয় করে থাকে। তখন তার অভাব মিটে যায়। দারিদ্র্যের নাম-চিহ্ন পর্যন্ত মুছে যায়। তবে যে ব্যক্তি দরিদ্র হয়েও ভিক্ষাবৃত্তি গ্রহণ করেনি, তার অভাব ও দারিদ্র্য অক্ষুণ্নই থেকে যায়। কেউ তার কষ্টের কথা বুঝে না, দেয়ও না তাকে কিছু।[১]

ফিকাহবিদগণও বিভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। তাঁদের মনে প্রশ্ন জেগেছে, এই দুই ধরণের দরিদ্র ব্যক্তির মধ্যে অধিক দুরবস্থা কার।- ফকীরের, না মিসকীনের?

শাফেয়ী ও হাম্বলী মতে ফকীর-এর অবস্থাই অধিক খারাপ। মালিকীদের নিকট ব্যাপারটি উল্টো- হানাফীরাও এই মত গ্রহণ করেছেন বলে সকলে জানেন। উভয় পক্ষের নিকট অভিধান ও শরীয়াত- দুই দিক দিয়েই দলীল রয়েছে।

শব্দ দিয়ে তাৎপর্য নির্ধারণে উপরিউক্ত মতদ্বৈততার ব্যাপারটি যত গুরুত্বপূর্ণই হোক, তারা নিজেরাই চূড়ান্ত করে বলেছেন যে, এর কোনো দীর্ঘসূত্রিতা নেই, আর এর তত্ত্বানুসন্ধানের পরিণতিতে যাকাতের ব্যাপারে আহরণযোগ্য কোনো ফলই পাওয়া যাবে না।

ইমাম মালিক, শাফেয়ী ও আহমাদের মত

যে-সম্পদ দ্বারা প্রয়োজন পূরণ হয়, তা-ই ধনাঢ্যতা। একজন লোক যখন পরমুখাপেক্ষী নয়, তখন যাকাত গ্রহণ তার জন্যে হারাম, কোনো জিনিসের মালিকানা না থাকলেও। আর অভাবগ্রস্ত ও পরমুখাপেক্ষী হলেই তার জন্যে যাকাত গ্রহণ হালাল- সে হিসাব পরিমাণ বা বিপুল পরিমাণ সম্পদের মালিক হলেও। ইমাম মালিক, শাফেয়ী ও অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত বর্ণনানুযায়ী ইমাম আহমাদের এই অভিমত। ইমাম খাত্তাবী বলেছেন ঃ ইমাম মালিক ও ইমাম শাফেয়ীর মত হচ্ছে, ধনাঢ্যতার কোনো সীমা বা সংজ্ঞা সুপরিচিত নয়। ব্যক্তির সচ্ছলতা ও অর্থশক্তির প্রেক্ষিতেই তা নির্ধারণ করতে হবে। ব্যক্তির নিকট যা আছে, তা তার জন্যে যথেষ্ট হলে তার পক্ষে যাকাত গ্রহণ জায়েজ হবে না। অভাবগ্রস্ত হলে তা জায়েজ হবে।[২]

---

১. معالم السنن ج ٢ ص ٢٣٢

২. معالم السنن ج٢ ص ٢٢٨

www.amarboi.org

ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, ব্যক্তি কখনও দিরহামের মালিক হয়ে ধনী গণ্য হয়– উপার্জন চালু থাকলে। আর কোনো ব্যক্তির হাজার টাকার মালিকানা থাকলেও তার অক্ষমতা ও বিপুল সংখ্যক সন্তানাদি থাকার কারণে সে ধনী গণ্য হবে না।

শরীয়ত তার দলীলাদি দ্বারা এই মতকেই সমর্থন করে। শরীয়তের মৌল ভাবধারাও তাই। অভিধান ও তার প্রয়োগ থেকেও তারই সমর্থন পাওয়া যায়।

নিম্নোদ্ধৃত কথাগুলো থেকেও এ মতের যথার্থতা প্রমাণিত হয় ঃ

ক. হাদীসে উদ্ধৃত হয়েছে, নবী করীম (স) কুবাইচা ইবনুল মাখারিকের এক প্রশ্নের জবাবে বলেছিলেন ঃ তিনজনের যে-কোনো একজনের পক্ষে ভিক্ষা করা জায়েজ ঃ যে ব্যক্তি অভুক্ত রয়েছে, সে যতক্ষণ পর্যন্ত জীবনে বেঁচে থাকার সম্বল না পাচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত ভিক্ষা চাইতে পারে।

খ. দারিদ্র্য হচ্ছে অভাবগ্রস্ততার অপর নাম। আর ধনাঢ্যতার বিপরীত। কাজেই যে-লোক অভাবগ্রস্ত, সে-ই দরিদ্র এবং কুরআনী আয়াতের আওতায় পড়ে প্রত্যক্ষভাবে অর্থাৎ সে যাকাত গ্রহণ করতে পারবে। আর যে-লোক পরমুখাপেক্ষিতামুক্ত, সে যাকাত হারাম হওয়ার সাধারণ ঘোষণার মধ্যে পড়বে অর্থাৎ যাকাত গ্রহণ তার জন্যে হারাম। অভাবগ্রস্ততাই যে দারিদ্র্য, তার দলীল হচ্ছে আল্লাহ্র ঘোষণা ঃ

يَاَيُّهَا النَّاسُ اَنْتُمُ الْفُقَرَاۤءُ اِلَى اللّٰهِ –

হে মানুষ! তোমরা সকলেই আল্লাহ্র প্রতি মুখাপেক্ষী।

এই কথার ভিত্তিতে দুটি বিষয়ে কথা বলা হচ্ছে ঃ

প্রথম, যে-ব্যক্তির যথেষ্ট পরিমাণ ধন-মাল আছে– তা যাকাত দেওয়া মাল হোক কিংবা অন্য ধরনের; অথবা তার উপার্জিত কর্মের বিনিময়ে বা মজুরী হিসেবে পাওয়া জমি হোক কিংবা অন্য কিছু– তার পক্ষে যাকাত গ্রহণ জায়েজ নয়। ধন-মালের যথেষ্ট হওয়ার ব্যাপারটি বিবেচ্য হবে তার নিজের, তার ওপর নির্ভরশীল তার সন্তানাদি ও অন্যান্যদের প্রেক্ষিতে। কেননা এদের সকলেরই প্রয়োজন পূরণ করা আল্লাহ প্রদত্ত বিধানের লক্ষ্য। তাই এক ব্যক্তির জন্যে যা প্রয়োজন বিবেচিত হবে তা-ই বিবেচিত হবে অন্যদের জন্যেও। সাধারণ শ্রমজীবী ও বেতনভুক লোকেরাও এই শ্রেণীর মধ্যে গণ্য এবং তাদের নিত্য নব উপার্জনের কারণে ধনী বলে বিবেচিত। তার ধন ও পুঞ্জীভূত সম্পদের দরুন নয়। অতএব যারা নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক না হওয়ার দরুন গরীব ও

www.amarboi.org

দরিদ্র বিবেচিত হবে, তারা সবাই যাকাত পাওয়ার যোগ্য হবে..... কিন্তু এ কথা অগ্রহণযোগ্য।

দ্বিতীয়, যে-লোক যাকাত দেওয়া মালের নিসাব পরিমাণের বা তার অধিকের মালিক হবে, যা তার নিজের ও তার ওপর নির্ভরশীল ব্যক্তিদের জন্যে যথেষ্ট নয়, তার পক্ষে যাকাত গ্রহণ বৈধ। কেননা সে ধনী নয়। কাজেই যার হাজার টাকার বা ততোধিক মূল্যের পণ্যদ্রব্য রয়েছে, কিন্তু তা থেকে লব্ধ মুনাফা তার প্রয়োজনের জন্যে যথেষ্ট হয় না– বাজারের মন্দা অবস্থার কারণে; কিংবা তার অধিক সংখ্যক সন্তান-সন্ততি থাকার কারণে– তার পক্ষে যাকাত গ্রহণ সম্পূর্ণ জায়েজ।

যার পাঁচ 'অসাক' পরিমাণ কৃষি ফসল রয়েছে; কিন্তু তা সত্ত্বেও তা তার জন্যে যথেষ্ট হয় না, তার পক্ষেও যাকাত নেওয়া জায়েজ। অবশ্য এই অবস্থা তার ওপর যাকাত ফরয হওয়ার প্রতিবন্ধক হবে না। কেননা যে ধনাঢ্যতা যাকাত ফরয হওয়ার কারণ হয় তা হচ্ছে শর্তাধীন নিসাবের মালিকানা। যাকাত গ্রহণের প্রতিবন্ধক ধনাঢ্যতা হচ্ছে তা, যদ্দ্বারা প্রয়োজন যথেষ্ট মাত্রায় পূরণ হবে। এ দুটির মধ্যে কোনো বাধ্যবাধকতা নেই।[১]

মাইমূনী বলেছেন, ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বলকে লক্ষ্য করে বলেছিলাম ঃ এক ব্যক্তির উট ও ছাগল রয়েছে, যার ওপর যাকাত ফরয হয়, অথচ তা সত্ত্বেও সে ফকীর-দরিদ্র। তার চল্লিশটি ছাগী থাকতে পারে, আছে কৃষিজমি; কিন্তু তা তার জন্যে যথেষ্ট হয় না, এই ব্যক্তিকে কি যাকাত দেওয়া যাবে ? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ, অবশ্যই। হযরত উমরের উক্তি হচ্ছে ঃ 'এদের দাও, তাদের এত এত উট থাকলেও।'[২]

ইমাম আহমাদ বলেছেন, কারুর ভূ-সম্পদ বা জমি থাকলে– যার ফসল হয় দশ হাজার বা ততোধিক, কিন্তু তা-ও তার জন্যে যথেষ্ট হয় না, সে যাকাত নেবে।[৩]

তাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, এক ব্যক্তির মাঠে দাঁড়িয়ে থাকা ফসল রয়েছে, কিন্তু তা কাটার সরঞ্জাম নেই, সে কি যাকাত নেবে ? বললেন ঃ হ্যাঁ।

যার মুখস্থকরণ ও অধ্যয়নের জন্যে জরুরি বই-পত্র রয়েছে অথবা ব্যবহারে বা ভাড়া দেওয়ার অলংকারাদি রয়েছে যা জরুরি, তার এই থাকাটা যাকাত গ্রহণের প্রতিবন্ধক নয়।

---

১. سرح غاية المنتهى ج٢ ص ١٣٥

২. المغنى ج ٢ ص ٦٦٤

৩. شرح الغية ج٢ ص ١٣٥

www.amarboi.org

উপার্জনক্ষম দরিদ্র

যাকাত পাওয়ার অধিকার হওয়ার ভিত্তি হচ্ছে অভাব-ব্যক্তির অভাব তার নিজের ও তার ওপর নির্ভরশীল লোকদের প্রয়োজন যথেষ্ট মাত্রায় পূরণের। এক্ষণে কোনো নিষ্কর্মা অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিকে– যে সমাজের ওপর বোঝা, সাহায্য ও দান নিয়ে বেঁচে থাকছে– যাকাত দেওয়া জায়েজ হবে কিনা ? অথচ সে লোকটি শক্ত-সুঠাম দেহসম্পন্ন, উপার্জন করতে সক্ষম এবং শ্রমোপার্জনের মাধ্যমে সে নিজেকে পরমুখাপেক্ষীহীন ও দারিদ্র্যমুক্ত বানাতে পারে, তা সত্ত্বেও তাকে যাকাত দেওয়া যাবে কিনা ?

এ পর্যায়ে শাফেরী ও হাম্বলী মাযহাবের বিশেষজ্ঞগণ মত প্রকাশ করে বলেছেন, যাকাত ফকীর ও মিসকীনের প্রাপ্য, তার কোনো অংশ কোনো ধনী ব্যক্তিকে দেওয়া জায়েজ নয়। অনুরূপভাবে যে উপার্জনের মাধ্যমে তার নিজের ও পরিবারবর্গের প্রয়োজন যথেষ্ট মাত্রায় পূরণ করতে সক্ষম, তাকেও তার অংশ দেওয়া যেতে পারে না। আমার বিবেচনায় এ মতই অগ্রাধিকার পাওয়ার যোগ্য।[১]

শরীয়তের অকাট্য দলিল ও নিয়মাদিও এই মতকেই শক্তিশালী করে। যদিও কোনো কোনো হানাফী আলিম উপার্জনশীল দরিদ্র ব্যক্তিকেও যাকাত দেওয়া জায়েজ মনে করেন, অবশ্য তার নিজের উচিত নয় তা গ্রহণ করা। কেননা গ্রহণ জায়েজ হলেও তা গ্রহণ করতেই হবে এমন কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। যেমন কোনো ধনী ব্যক্তিকে দরিদ্র মনে করে যাকাত দেওয়া হলে তা গ্রহণ না করাই তার উচিত। তাই দেওয়া জায়েজ হলেও গ্রহণ করা হারাম। আর জমহুর হানাফী ফিকাহবিদগণ বলেছেন, গ্রহণ করাও হারাম নয়। তবে গ্রহণ না করা অধিক উত্তম সেই ব্যক্তির পক্ষে, যার পক্ষে জীবনযাত্রা মোটামুটিভাবে নির্বাহ করা সম্ভব।[২]

কোনো কোনো মালিকী মাযহাবপন্থী ফিকাহবিদ মত দিয়েছেন যে, উপার্জনক্ষম ব্যক্তিকে যাকাত দেওয়া জায়েজ নয়।[৩]

উপরিউক্ত মতটি শরীয়তের দলিল ও নিয়মাদিও সমর্থন করে। এই কথা বলছি এজন্যে যে, ইসলাম প্রত্যেক শক্তিমান ব্যক্তির জন্যে কাজ করে উপার্জন করা ফরয করে দিয়েছে। সেই সাথে তার জন্যে কাজ করে উপার্জন করা সহজ করে দেওয়া কর্তব্য বলে ঘোষণা করেছে। ফলে সে স্বীয় শ্রম ও কাজের বিনিময়ে উপার্জন দ্বারা যাবতীয় প্রয়োজন পূরণ করতে সক্ষম হবে। সহীহ্ হাদীসে বলা হয়েছে ঃ

১. المجموع ج ٦ ص ٢٢٨
২. مجمع الانهر ص ٢٢٠
৩. حاشة الدسوقى ج ١ ص ١٤٩٤

www.amarboi.org

مَا اَكَلَ اَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِّنْ اَنْ يَّأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِه (بخارى)

স্বীয় উপার্জনে খাওয়া অপেক্ষা অধিক উত্তম খাদ্য কেউ কখনও খায়নি।

কেউ যখন যথেষ্ট উপার্জনের কাজ পায়, তার পক্ষে সে কাজ অগ্রাহ্য করা– দান-সাদকা গ্রহণ বা মানুষের নিকট ভিক্ষা চাওয়ার আশায়– কিছুতেই জায়েজ হতে পারে না।

এ কারণেই আমরা দেখছি, নবী করীম (স) সুস্পষ্ট ভাষায় বলছেন ঃ

لَاتَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ وَلَا لِذِيْ مِرَّةٍ سَوِيٍّ - (الخمسة)

ধনী ব্যক্তির জন্যে যাকাত-সাদকা জায়েজ নয়, সুস্থ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সম্পন্ন শক্তিশালী ব্যক্তির জন্যেও নয়।

তাবারী জুহাইরুল আমেরী থেকে বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন, তিনি আবদুল্লাহ ইবনে আমরুবনিল-আ'সকে যাকাত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলেন ঃ 'তা কোন ধরনের মাল' ? বললেন ঃ পংগু, আহত, অন্ধ, দুর্বল, বিপদগ্রস্ত ও উপার্জনে অক্ষম ব্যক্তিদের প্রাপ্য মাল। পরে বললেন, এই কাজের কর্মচারী ও মুজাহিদদেরও তাতে অংশ বা অধিকার রয়েছে। আবদুল্লাহ বলেছেন, মুজাহিদ লোকদের জন্যে জিহাদের প্রয়োজন ও সে কাজে সাহায্যকারী সম্পদ যাকাত থেকে গ্রহণ করা সম্পূর্ণ জায়েজ করে দেওয়া হয়েছে। আর কর্মচারীরা তাদের কাজের পরিমাণ অনুযায়ী নিতে পারবে। অতঃপর বলেছেন, ধনী ও শক্তিমান ব্যক্তিদের জন্যে যাকাত গ্রহণ জায়েজ নয়।[১]

আবদুল্লাহ ইবনে আমরের এই কথাটি বহু সংখ্যক সাহাবী স্বয়ং নবী করীম (স) থেকে শুনে বর্ণনা করেছেন।

তবে দৈহিক শক্তি ও উপার্জনে শারীরিক যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও কার্যত যদি যথেষ্ট পরিমাণে উপার্জন করতে সক্ষম না হয়, তাহলে তার কোনো মূল্য বা গুরুত্ব নেই। কেননা উপার্জনহীন শক্তি-সামর্থ্য ক্ষুধার্তের অন্ন ও বস্ত্রহীনের বস্ত্রের ব্যবস্থা করতে পারে না। ইমাম নববী বলেছেন, উপার্জনকারীকে কাজে নিয়োগ করার কেউ না থাকলে (অন্য কথায় বেকার ব্যক্তির পক্ষে) যাকাত গ্রহণ করা জায়েজ। কেননা সে তো কার্যত অক্ষম।[২]

---

১. تفسير الطبرى ج ١٤ ص ٣١

২. المجموع ج ٦ ص ١٩١

www.amarboi.org

উপরিউক্ত হাদীসে শুধু 'সুস্থ পূর্ণাঙ্গ দেহ' বলেই শেষ করা হয়েছে। কিন্তু অপর একটি হাদীসে নিশ্চিত করে বলা হয়েছে, ক্ষমতা থাকলেই হবে না, উপার্জন করতে হবে, তবেই তার জন্যে যাকাত গ্রহণ না-জায়েজ হবে।

আবদুল্লাহ্ ইবনে আদী বলেছেন, তাঁকে সংবাদ দেওয়া হয়েছে, দুজন লোক নবী করীম (স)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে যাকাতের অংশ প্রার্থনা করল। নবী করীম (স) তাদের দুজনের ওপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন। দেখতে পেলেন, দুজন লোকই সুস্থ শক্তিমান। তখন তিনি বললেন ঃ 'তোমরা চাইলে আমি যাকাতের মাল তোমাদের দেবো। কিন্তু জেনে রাখবে, ধনী ব্যক্তির জন্যে তাতে কোনো অংশ নেই। অংশ নেই শক্তিমান উপার্জনশীলের জন্যেও।[১]

নবী করীম (স) এ দুজন লোকের আসল অবস্থা জানতেন না বিধায় উক্তরূপ কথা বলে তাদেরকে যাকাত গ্রহণ করা না-করার স্বাধীনতা দিয়েছিলেন। কেননা তারা বাহ্যত শক্তিমান হলেও বাস্তবভাবে বেকার ও অ-উপার্জনকারী হতে পারে। অথবা উপার্জন করেও যথেষ্ট পরিমাণ থেকে বঞ্চিত থেকে যেতে পারে। আর তা হলে তাদের জন্যে যাকাত গ্রহণ না জায়েজ হবে না।

এই প্রেক্ষিতে হাদীস বিশেষজ্ঞগণ বলেছেন, রাষ্ট্রকর্তা বা যাকাতদাতার উচিত, যাকে যাকাতের মাল দেওয়া হচ্ছে, তার প্রকৃত অবস্থা না-জানার দরুন তাকে উক্তরূপ নসীহত করা। একথা স্পষ্ট করে বলা দরকার যে, যাকাতের মাল ধনী লোকের প্রাপ্য নয়, উপার্জনক্ষম ব্যক্তির জন্যেও নয়। তা-ই হচ্ছে রাসূলে করীম (স)-এর আদর্শ।[২]

উপার্জনের অর্থ হচ্ছে প্রয়োজন পরিমাণ উপার্জন। তা না করতে পারলে যাকাত গ্রহণ জায়েজ হবে। আসলে উপার্জনের অক্ষমতাই সেজন্যে শর্ত নয়। আর কেবল অক্ষম, রোগাক্রান্ত লোকদের মধ্যেই যাকাত সম্পদ বিতরণ করতে হবে, এমনও কোনো কথা নেই।

ইমাম নববীর কথানুযায়ী উপার্জন এমন হতে হবে, যা তার অবস্থা ও মর্যাদার উপযোগী। তা না হলে তাকে উপার্জনহীনই মনে করতে হবে।[৩]

তবে যে হাদীসে সুস্থ শক্তিমান ব্যক্তির ওপর যাকাত হারাম বলা হয়েছে, তা শক্তিসম্পন্ন অথচ সর্বক্ষণ বেকার ব্যক্তির ক্ষেত্রে সাধারণ অর্থেই গ্রহণ করতে হবে।

---

১. احمد، ابو داؤد، نسائی। আহমাদ বলেছেন, হাদীসটি উত্তম। নববী বলেছেন, হাদীসটি সহীহ। আবূ দাউদ ও মুনযেরী কিছুই বলেন নি।

২. نيل الاوطار ج ٤ ص ١٧٠

৩. المجموع ج ٦ ص ١٩٠

www.amarboi.org

সারকথা হচ্ছে, যে উপার্জনক্ষম ব্যক্তির ওপর যাকাত গ্রহণ হারাম, তাতে নিম্নোদ্ধৃত শর্তাবলী পুরামাত্রায় বর্তমান থাকতে হবে ঃ

১. উপার্জন করার মত কাজ পাওয়ার ব্যবস্থা থাকতে হবে।

২. এই কাজ শরীয়তসম্মত ও হালাল হতে হবে। কেননা শরীয়তে হালাল নয় এমন কাজ থাকলেও তা না থাকার মতোই মনে করতে হবে।

৩. সাধ্য ও শক্তির অতিরিক্ত কোনো কাজের বোঝা গ্রহণ করতে হবে না। কেননা সাধারণত সাধ্যায়ত্ত কাজই মানুষ করতে পারে। (সাধ্যাতীত কাজের ব্যবস্থা থাকলে তাতে বেকারত্ব ঘুচে না।)

৪. কাজটি তার মতো লোকের অনুকূল; তার অবস্থা, মর্যাদা ও সামাজিক পজিশনের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হতে হবে।

৫. উপার্জন এতটা পরিমাণ হতে হবে, যদ্দ্বারা তার নিজের ও তার ওপর নির্ভরশীল পরিবারবর্গের প্রয়োজন পূরণে যথেষ্ট হবে।

তার অর্থ হচ্ছে, উপার্জনক্ষম প্রত্যেক ব্যক্তির প্রতিই শরীয়তের আশা এই যে, তার নিজের প্রয়োজন সে নিজে পূরণ করবে। সেই সাথে সাধারণভাবে সমাজ ও বিশেষভাবে রাষ্ট্রনায়ক এই কাজে তার সহযোগিতা করবে। এটা তার অধিকার এবং সমাজ ও রাষ্ট্রনায়কের তা কর্তব্য। তাই যে-লোক এরূপ উপার্জনে অক্ষম হবে– ব্যক্তিগত দুর্বলতার কারণে, যেমন বালকত্ব, বার্ধক্য, রোগ ও পঙ্গুত্ব ইত্যাদি অথবা কর্মক্ষম হয়েও তার উপযোগী কোনো হালাল উপার্জন পাওয়া থেকে বঞ্চিত থেকে যাচ্ছে কিংবা উপার্জনের ক্ষেত্র ও সুযোগ পেয়েও তার নিজের ও পরিবারবর্গের জন্যে প্রয়োজনীয় ও যথেষ্ট পরিমাণের উপার্জন করতে পারছে না, এরূপ অবস্থায় তার পক্ষে যাকাত গ্রহণ সম্পূর্ণ জায়েজ। তা গ্রহণ করলে তাতে তার কোনো দোষ হবে না আল্লাহ্র দ্বীনের বিচারে।

বস্তুত এ-ই হচ্ছে ইসলামের মহান শিক্ষা। এতে যেমন ইনসাফ ও সুবিচারের দিকটি প্রকট, তেমনি দয়া-অনুগ্রহের ভাবধারাও পূর্ণরূপে কার্যকর। একালে যে স্লোগান উঠেছে ঃ 'যে কাজ করবে না সে খাবেও না'– তা সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক কথা যেমন, তেমনি নৈতিকতা পরিপন্থী এবং অমানবিকও। বস্তুত পাখি ও জন্তু জগতে এমন অনেকেই রয়েছে যেখানে শক্তিমান দুর্বলকে বহন করে, কর্মক্ষম অক্ষমকে সাহায্য করে। মানুষ কি এসব ইতর প্রাণীর অপেক্ষাও নিকৃষ্টতর ?

www.amarboi.org

ইবাদতে লিপ্ত ব্যক্তি যাকাত পাবে না

ইসলামের ফিকাহ্‌বিদগণ সুস্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, কোনো উপার্জনক্ষম ব্যক্তি যদি কামাই-রোজগার ছেড়ে দিয়ে নামায-রোযা ইত্যাদি নফল ইবাদতে মশগুল হয়ে যায়, তা হলে তাকে যাকাত দেওয়া যেতে পারে না, তার পক্ষে তা গ্রহণ করাও জায়েজ নয়। কেননা তার ইবাদতের কল্যাণই তাকে সংকুচিত করে ফেলেছে। কাজ ও শ্রমে সে অংশগ্রহণ করেনি।[১] অথচ শ্রম করার ও জমির পরতে পরতে রিযিকের সন্ধান করার জন্যে তাকে সুস্পষ্ট ভাষায় আদেশ দেওয়া হয়েছে। উপরন্তু ইসলামে এ ধরনের কোনো 'রাহবানিয়াতের' একবিন্দু স্থান নেই। বরং এরূপ অবস্থায় হালাল উপার্জনে নিয়োজিত হওয়া এই সব ইবাদতের তুলনায় অনেক উত্তম কাজ, অবশ্য নিয়ত যদি যথার্থ হয় এবং উপার্জনের ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র নির্ধারিত সীমা লংঘন না করে।

ইল্‌ম শেখার কাজে একনিষ্ঠ ব্যক্তি যাকাত পাবে

তবে কেউ যদি কল্যাণকর ইল্‌ম শেখার– বিদ্যার্জনের কাজে একনিষ্ঠভাবে নিয়োজিত হয়, তাহলে তার প্রয়োজন পূরণের জন্যে তাকে যাকাত দেওয়া যাবে। তাকে ইলমের প্রয়োজনীয় কিতাব খরিদ করে দেওয়া যেতে পারে যাকাতের টাকা দিয়ে। কেননা তা তার দ্বীন ও দুনিয়ার জন্যে সত্যিই কল্যাণকর।

ইল্‌ম শিক্ষার্থীকে যাকাত দেওয়া যায় এ কারণেও যে, সে 'ফরযে কেফায়া' আদায়ের কাজে আত্মনিয়োগ করে আছে। এই ইল্‌ম শেখার কল্যাণটা তার নিজের মধ্যেই সীমিত হয়ে থাকবে না। তা গোটা জাতির জন্যেই কল্যাণবহ। তাই তাকে যাকাতের টাকা দিয়ে সাহায্য করা বাঞ্ছনীয়। আসলে যাকাত ব্যয় করা যায় মুসলিম অভাবগ্রস্ত ব্যক্তির জন্যে। এমন কাজেও ব্যয় করা যায় যা মুসলিম উম্মতের জন্যে জরুরি।

কেউ কেউ শর্ত করেছেন যে, তাকে উত্তমতায় শ্রেষ্ঠ হতে হবে এবং তার দ্বারা মুসলিম জনগণকে উপকৃত হতে হবে। নতুবা সে যাকাত পাওয়ার অধিকারী বিবেচিত হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত সে উপার্জনক্ষম থাকবে।[২] এ কথাটি যুক্তিসম্মত। আধুনিক রাষ্ট্রসমূহ এই নীতি অনুযায়ী কাজ করে এবং সমাজের উত্তম ও অগ্রসরমান লোকদের জন্যেই অর্থ ব্যয় করে থাকে। তাদের জন্যে

---

১. المجموع ج ٦ ص ٢٩١ - والروضة للنووى ج ٦ ص ٣٠٠٩

২. ঐ এবং ١٩١-١٩٠ شرح غاية المنتهى ج ٢ ص ١٣٧ المجموع ج ٦ص

www.amarboi.org

বিশেষ অধ্যয়নের ব্যবস্থা করে কিংবা উচ্চতর শিক্ষা-প্রশিক্ষণের জন্যে তাদের অভ্যন্তরীণ বা বৈদেশিক প্রতিনিধিত্বে শরীক করে।

প্রচ্ছন্ন আত্মসম্মান রক্ষাকারী দরিদ্ররা সাহায্য পাওয়ার অধিকারী

ইসলামে সমান শিক্ষার ভুল প্রয়োগের কারণে সাধারণত লোকেরা ধারণা করে যে, যাকাত পাওয়ার অধিকারী সেসব গরীব-মিসকীন, যারা কোনো উপার্জনের কাজ করে না বা করবে না কিংবা যারা লোকদের নিকট প্রার্থনা করা, ভিক্ষা চাওয়াকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করেছে, যারা নিজেদের দারিদ্র্য ও দুঃখ-দুর্দশার কথা প্রচার করে ও দেখিয়ে বেড়ায়। পথে-ঘাটে-হাটে, বাজারে, মসজিদের দুয়ারে লোকদের সম্মুখে প্রার্থনার হস্ত প্রসারিত করে। সম্ভবত মিসকীনের এই চিত্র ও ছবিই দীর্ঘকাল ধরে লোকদের মন-মানসে ভাসমান হয়ে আছে। এমন কি স্বয়ং নবী করীম (স)-এর জীবদ্দশায়ও এরূপ অবস্থাই দাঁড়িয়েছিল। প্রকৃত মিসকীন কে তা বহু লোকই বুঝতে পারত না। তাই তিনি প্রকৃত মিসকীন ও সমাজ সমষ্টির সাহায্য পাওয়ার যোগ্য লোক কে সে বিষয়ে বলে দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করেছেন। বলেছে ঃ

لَيْسَ الْمِسْكِيْنُ الَّذِيْ تَرِدُّهُ التَّمَرَةَ وَالتَّمَرَ تَانِ وَلَا اللُّقْمَةَ وَاللُّقْمَتَانِ اِنَّمَا الْمِسْكِيْنُ الَّذِىْ يَتَعَفَّفُ اِقْرَأُوْ اِنْ شِئْتُمْ يَسْئَلُوْنَ النَّاسَ اِلْحَافًا -

প্রকৃত মিসকীন সে নয় যাকে তুমি একটা বা দুটো খেজুর দিয়ে অথবা এক মুঠি বা দু'মুঠি খাবার দিয়ে বিদায় করো। বরং প্রকৃত মিসকীন সে যে দরিদ্র হয়েও প্রার্থনা থেকে বিরত থেকে আত্মমর্যাদা বজায় রাখে। তোমরা ইচ্ছা করলে পড়তে পারো, কুরআনের আয়াত ঃ যারা লোকদের জড়িয়ে ধরে ভিক্ষা চায় না....[১]

অর্থাৎ যারা কাঁদ কাঁদ হয়ে ভিক্ষা চায় না, ভিক্ষা দিতে লোকদের বাধ্য করে না, লোকদের কষ্ট দেয় না যতক্ষণ পর্যন্ত তারা চূড়ান্তভাবে ঠেকে না যায়। যে-লোক নিজের প্রয়োজন পূরণের ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও ভিক্ষা চায়, সে তাই করে। এই পরিচিতি বর্ণনা করা হয়েছে সে ফকীর-মুহাজির লোকদের, যারা নিজেদের যথাসর্বস্ব ছেড়ে-ছুড়ে দিয়ে আল্লাহ ও রাসূলের দিকে চলে গেছে। এখন তাদের ধন-মাল বলতে কিছু নেই, নেই উপার্জন করে নিজেদের প্রয়োজন পূরণের কোনো উপায়।[২] আল্লাহ এদের সম্পর্কেই বলেছেন ঃ

---

১. البقرہ - ٢٧٣

২. تفسير ابن كثير ج ١ ص ٣٢٤

www.amarboi.org

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِيْنَ أُحْصِرُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ ضَرْبًا فِي الْاَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ اَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ ج تَعْرِفُهُمْ بِسِيْمٰهُمْ ج لَايَسْئَلُوْنَ النَّاسَ اِلْحَافًا -

দান-সাদকা-যাকাত সে-সব ফকীরদের জন্যে, যারা আল্লাহ্‌র পথে পরিবেষ্টিত হয়ে পড়েছে, পৃথিবীতে কামাই-রোজগার করে বেড়ানোর সামর্থ্যবান নয়, মূর্খ লোকেরা তাদের ধনী মনে করে, তারা ভিক্ষা থেকে বিরত থাকে আত্মমর্যাদা রক্ষার জন্যে, অথচ তুমি তাদের বাহ্যিক অবস্থা দেখেই চিনতে পারো, তারা লোকদের নিকট কাঁদ কাঁদ হয়ে জড়িয়ে ধরে ভিক্ষা চায় না। (বাকারা ঃ২৭৩)

বস্তুত এসব লোকই সাহায্য পাওয়ার তুলনামূলকভাবে অধিক উপযুক্ত অধিকারী। নবী করীম (স) পূর্বোক্ত হাদীসে এ কথাই বলেছেন।

অপর একটি বর্ণনার ভাষা এরূপ ঃ

لَيْسَ الْمِسْكِيْنُ الَّذِيْ يَطُوْفُ عَلَى النَّاسِ تَرُدُّهُ اللُّقْمَةَ وَاللُّقْمَتَانِ وَالتَّمَرَةُ وَالتَّمَرَتَانِ وَلٰكِنَّ الْمِسْكِيْنَ الَّذِيْ لَايَجِدُ غِنًى يُغْنِيْهِ وَلَايَفْطُنُ لَهُ فَيَتَصَدَّقُ عَلَيْهِ وَلَا يَقُوْمُ فَيَسْئَالُ النَّاسَ-

লোকদের নিকট ঘুরে ঘুরে যে-লোক ভিক্ষা চায়– যাকে তুমি এক বা দুমুঠি খাবার বা একটি বা দুটো খেজুর দিয়ে বিদায় করো– সে প্রকৃত মিসকীন নয়। বরং প্রকৃত মিসকীন সে, যে স্বাচ্ছন্দ্য অর্জনের উপায় পায় না, লোকেরাও তাদের দারিদ্র্য বুঝতে পারে না বলে তাদের দেয়ও না কিছুই। আর তারা লোকদের নিকট ভিক্ষা চাইতেও দাঁড়ায় না। (বুখারী, মুসলিম)

এই মিসকীনই সাহায্য পাওয়ার উপযুক্ত অধিকারী। যদিও লোকেরা এই মিসকীন সম্পর্কে উদাসীনই থাকে। বুঝতে পারে না যে, এই লোককে সাহায্য দেওয়া উচিত। এজন্যে নবী করীম (স) এই লোকের প্রতিই জনগণের দৃষ্টি আকৃষ্ট করেছেন। বিবেক-বুদ্ধি নিয়োগ করতেও বলেছেন তাদের জন্যেই। তাহলেই বহু প্রচ্ছন্ন দরিদ্র ও আত্মসম্মান রক্ষাকারী পরিবার প্রয়োজনীয় সাহায্য পেয়ে অভাবমুক্ত হতে পারে। এদের অনেক লোকই অবস্থার দুর্বিপাকে পড়ে গেছে বা অক্ষমতা তাদের দরিদ্র বানিয়েছে। অথবা সন্তান-সন্ততির আধিক্যের কারণে তাদের সম্পদ কম পড়ে যাচ্ছে। হয়ত উপার্জন করে এত সামান্য যে, তা তাদের প্রয়োজন পূরণ করতে পারে না।

www.amarboi.org

ইমাম হাসানুল বাসরীকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, এক ব্যক্তির ঘর-বাড়ি আছে, আছে সেবক-খাদেম, সে কি যাকাত গ্রহণ করতে পারে ? জবাবে তিনি বলেছিলেন, হ্যাঁ, সে যদি অভাব বোধ করে তাহলে নিতে পারে, কোনো দোষ নেই তাতে।[১] পূর্বে উল্লেখ করেছি, ইমাম মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান ফতোয়া দিয়েছিলেন, এক ব্যক্তির চাষের জমি রয়েছে, অথবা আছে দোকান ব্যবসা করার; কিংবা তার আয় তিন হাজার দিরহাম; কিন্তু তা তার নিজের ও পরিবারবর্গের প্রয়োজন পূরণে যথেষ্ট নয়, তার পক্ষে যাকাত গ্রহণ করা জায়েজ। যদিও তার আয় কয়েক হাজার পর্যন্ত পৌঁছায়। এই মতের ওপরই ফতোয়া দেওয়া হয়েছে। ইবনে আবেদীন এই কথা উল্লেখ করেছেন।[২] ইমাম আহমাদের অনুরূপ একটি ফতোয়ার কথা উল্লেখ করেছি এর পূর্বে। তার মর্ম এই যে, যে-ব্যক্তির ফসল ফলানোর জমি আছে, যার আয় দশ হাজার দিরহাম বা তার কম-বেশি পরিমাণ হবে, কিন্তু তা তার জন্যে যথেষ্ট হয় না, সেও যাকাত গ্রহণ করতে পারবে।[৩]

শাফেয়ী মাযহাবের লোকদের মত হচ্ছে, কারুর জমি থাকলে ও তার আয় তার প্রয়োজন পরিমাণের তুলনায় কম হলে সে 'ফকীর' বা 'মিসকীন' গণ্য হবে। তাকে যাকাত দিয়ে তার প্রয়োজন পূরণ করা সম্ভব। তাকে তার জমি বিক্রয় করে দিতে বাধ্য করা যাবে না।

মালিকী মাযহাবের লোকদের মত হচ্ছে, যে-লোক নিসাব পরিমাণ বা তার বেশি সম্পদের মালিক, তার খাদেম এবং ঘর-বাড়ি আছে; কিন্তু প্রয়োজন পূরণ হয় না, তাকেও যাকাত দেওয়া জায়েজ।[৪]

তার অর্থ, যার কিছুই নেই, যে কোনো কিছুরই মালিক নয় এমন নিঃস্ব ফকীরকেই যাকাত দেওয়া লক্ষ্য নয়। বরং প্রয়োজন পূরণের কতকাংশ যার আছে, তার পূর্ণমাত্রায় প্রয়োজন পূরণের ব্যবস্থা করে দেওয়াও লক্ষ্য। কেননা সে তার যথেষ্ট মাত্রার সম্পদের অধিকারী নয়।

ফকীর ও মিসকীনকে কি পরিমাণ যাকাত দেওয়া যাবে ?

ফকীর ও মিসকীনকে কতটা পরিমাণ যাকাত দেওয়া যাবে, সে বিষয়ে ফিকাহবিদদের বিভিন্ন মত রয়েছে। এ মতপার্থক্যকে আমরা নিম্নলিখিতভাবে দুটি ভাগে ভাগ করে বলতে পারি ঃ

---

১. كتاب الاموال لابى عبيد

২. ردالمحتارج ٢ ص ٨٨

৩. المغنى مع الشرح الكبير ج ٢ ص ٥٢٥

৪. شرح الخرشى بحاشية العدوى ج ٢ ص ٢١٥

www.amarboi.org

প্রথম, তাদের দেওয়া হবে প্রচলিত নিয়মে এতটা পরিমাণ, যদ্দারা তাদের প্রয়োজন যথেষ্ট মাত্রায় পূর্ণ হয়– বিশেষ কোনো পরিমাণ নির্ধারণ করা ছাড়াই।

দ্বিতীয়, তাদের দেওয়া যাবে নির্দিষ্ট পরিমাণের মাল, যা তাদের অনেকের নিকট সামান্য আবার অনেকের নিকট অধিক বিবেচিত হবে।

আমরা প্রথমটি নিয়ে প্রথমেই আলোচনা করব। কেননা ইসলাম– কুরআন ও সুন্নাতের দৃষ্টিতে যাকাতের লক্ষ্য পর্যায়ে তা-ই অতীব নিকটবর্তী মত। এই দিকটিতেও দুটো মত রয়েছে ঃ

১. একটি মত, আয়ুষ্কাল পর্যন্তকার জন্যে যথেষ্ট পরিমাণ দেওয়া,

২. আর একটি মত, এক বছরের জন্যে যথেষ্ট পরিমাণ দেওয়া।

প্রথমত জীবনকালের প্রয়োজন পরিমাণ দান

এ মত অনুযায়ী ফকীরকে এতটা পরিমাণ দিতে হবে, যদ্দারা তার দারিদ্র্যের মূলোৎপাটন হয়ে যায়। তার অভাব-অনটন দূর হওয়ার কারণ ঘটে এবং স্থায়ীভাবে যথেষ্ট মাত্রায় তার প্রয়োজন পূরণ হতে পারে। আর দ্বিতীয়বার যেন তার যাকাত গ্রহণের মুখাপেক্ষিতা না থাকে।

ইমাম নববী বলেছেন, ফকীর-মিসকীনকে দেয় পরিমাণ পর্যায়ে ইরাকী ও বিপুল সংখ্যক খোরাসানী ফিকাহবিদগণ বলেছেন, তাদের এমন পরিমাণ দিতে হবে যা তাদেরকে দারিদ্র্য থেকে মুক্ত করে স্বাচ্ছন্দ্য ও ধনাঢ্যতার দিকে নিয়ে যেতে পারে অর্থাৎ যা তাদেরকে স্থায়ীভাবে সচ্ছলতা দান করবে। ইমাম শাফেয়ী নিজেও এই মত দিয়েছেন। কুবাইচা ইবনুল মাখারিক আল হিলালী বর্ণিত একটি হাদীস দলিল হিসেবে তাঁরা উল্লেখ করেছেন। হাদীসটি হচ্ছে, নবী করীম (স) বলেছেন ঃ তিনজনের যে-কোনো একজনের পক্ষে ভিক্ষা চাওয়া জায়েজ। একজন, যার ওপর এমন বোঝা চেপেছে যে, তার জন্যে ভিক্ষা করা জায়েজ হয়ে গেছে যতক্ষণ পর্যন্ত সে সেই পরিমাণ না পাচ্ছে। তা পেয়ে গেলে সে তা থেকে বিরত থাকবে। দ্বিতীয়, এক ব্যক্তি বড় দুরবস্থার সম্মুখীন হয়ে পড়েছে, বিপদে পড়ে গেছে, তার সব ধন-মাল নিঃশেষ হয়ে গেছে। তার পক্ষে ভিক্ষা চাওয়া জায়েজ যতক্ষণ পর্যন্ত সে জীবনযাত্রার স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ মাত্রার মালিক না হচ্ছে। আর তৃতীয় ব্যক্তি সে, যে অনশনের সম্মুখীন হয়ে পড়েছে। এমন কি তার সমাজের জনগণের মধ্য থেকে অন্তত তিন ব্যক্তি বলতে শুরু করেছে যে, অমুক ব্যক্তি অনশনে দিন কাটাচ্ছে। এই ব্যক্তির পক্ষেও ভিক্ষা চাওয়া জায়েজ, যতক্ষণ না সে তার যথেষ্ট পরিমাণ সম্পদ লাভ

www.amarboi.org

করছে। এই তিনজন ব্যতীত অপর লোকদের পক্ষে ভিক্ষা চাওয়া– হে কুবাইচা– একান্তই ঘুষ ছাড়া আর কিছুই নয়। এরূপ ভিক্ষা করলে তা ঘুষ হবে। (মুসলিম)

অর্থাৎ প্রয়োজন পূরণ না হওয়া পর্যন্ত ভিক্ষা চাওয়ার অনুমতি নবী করীম (স) দিয়েছেন।

যদি সে উপার্জনের কোনো পেশা ধরতে পারে, তবে প্রয়োজনীয় দ্রব্য-সামগ্রী বা হাতিয়ার-যন্ত্রপাতি তাকে ক্রয় করে দিতে হবে, তার মূল্য বেশি হোক বা কম, যেন তৎলব্ধ মুনাফা এমন পরিমাণ হয় যা তার প্রয়োজন যথাসম্ভব পূরণ করে দেবে। তবে পেশা, দেশ, শহর-স্থান, সময়-কাল ও ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে পার্থক্য হতে পারে।

আমাদের সঙ্গীদের অনেকেই বলেছেন, যে-লোক সবজি বিক্রয় করতে পারে, তাকে পাঁচ বা দশ দিরহাম দেওয়া যেতে পারে। যার পেশা হীরা-জহরত ও স্বর্ণ-রৌপ্য বিক্রয়, তাকে দশ হাজার দিরহাম পর্যন্ত দেওয়া যেতে পারে, যদি তার কম পরিমাণ দ্বারা প্রয়োজন পরিমাণ আয় করা না যায়। আর যে ব্যবসায়ী, রুটি প্রস্তুতকারী, আতর প্রস্তুতকারী বা মুদ্রা বিনিময়কারী, তাকে সেই অনুপাতে যাকাতের অর্থ দেওয়া যেতে পারে। যে দরজী কাজে পটু, কাঠ মিস্ত্রী, কসাই বা যৌগিক পদার্থ সৃষ্টিকারী হবে, কোনো শিল্পকর্মে পারদর্শী হবে, তাকে এতটা পরিমাণ দিতে হবে যদ্দারা সে তার কাজের জন্যে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি খরিদ করতে পারবে।

যদি সে কৃষিজীবী হয়, তাহলে তাকে জমির ব্যবস্থা করে দিতে হবে এমন পরিমাণ, যেখানে ফসল ফলিয়ে সে চিরজীবন স্বাচ্ছন্দ্য সহকারে কাটাতে সক্ষম হবে।

যদি এই ধরনের পেশা গ্রহণে সক্ষম না হয়, কোনো শিল্প দক্ষতারও অধিকারী না হয়, ব্যবসা ইত্যাদি কোনো উপার্জনযোগ্য মাধ্যম অবলম্বন করে জীবিকা নির্বাহ করতে সক্ষম না হয়, তাহলে তাকে তার বসবাসের স্থানের উপযোগী জীবনযাত্রা নির্বাহের আয়ুষ্কালীন ব্যবস্থা করে দিতে হবে।

শামসুদ্দীন রমলী নববী লিখিত 'আল-মিনহাজ্জ' গ্রন্থের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে লিখেছেন, ফকীর ও মিসকীন উপরিউক্ত ধরনের কোনো উপার্জন পন্থা, কোনো পেশা বা ব্যবসায় অবলম্বন করতে যদি সক্ষম না হয়, তাহলে তার সারাজীবন কাটাবার জন্যে প্রয়োজন পরিমাণ সম্পদ তাকে দিতে হবে। কেননা উদ্দেশ্য হলো লোকটিকে মুখাপেক্ষিতা থেকে বিমুক্ত করা। আর তা করা না হলে এই মুখাপেক্ষিতা থেকে তার মুক্তি সারাজীবনে সম্ভব হবে না। আর বয়স যদি বেশি হয়ে যায়, তাহলে এক এক বছরের জন্যে প্রয়োজনীয় পরিমাণ দিতে হবে।

www.amarboi.org

যে লোক উপার্জন করতে সক্ষম নয়, তাকে যাকাত দিতে বলার অর্থ এই নয় যে, তার স্বাভাবিক জীবনযাত্রা নির্বাহের জন্যে নগদ অর্থ তাকে দিতে হবে, বরং তার অর্থ তাকে এমন জিনিস ক্রয় করে দিতে হবে, যার আয় থেকে তার প্রয়োজন পূরণ হবে এবং ভবিষ্যতে সে যাকাত গ্রহণ থেকে বেঁচে যেতে পারবে। তাহলে সে সেই জিনিসের মালিক হতে পারবে ও উত্তরাধিকারসূত্রে তা বণ্টিতও হতে পারবে তার বংশধরদের মধ্যে।

জরকাশী যেমন আলোচনা করেছেন, সরকারী ব্যবস্থাধীনেই সেই জিনিস ক্রয় হওয়া উচিত অথবা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকেই বাধ্য করা দরকার সেই জিনিস ক্রয় করার জন্যে এবং তা কোনো অবস্থায়ই হস্তান্তর না করার জন্যে।

এই মালিকানা যদি তার জীবনব্যাপী প্রয়োজনের জন্যে যথেষ্ট না হয় তাহলে যাকাতের অর্থ দ্বারাই তা পূর্ণ করে দিতে হবে। তখন সে দরিদ্র ও মিসকীন কিনা তা শর্ত করার আবশ্যকতা নেই।

মা-অর্দী বলেছেন, যদি তার নব্বই থাকে, আর একশ' না হলে তার প্রয়োজন পূর্ণ না হয়, তাহলে এই দশ তাকে দিয়ে দিতে হবে। আর কোনো উপার্জন ব্যতিরেকেই এই নব্বই যদি তার জন্যে যথেষ্ট হয় তাহলে হয়ত তার সমগ্র জীবনব্যাপী প্রয়োজন পূরণে যথেষ্ট হবে না।

এই সব কথাই বলা হচ্ছে সে লোক সম্পর্কে, যে ভালো উপার্জন করছে না। যে-লোক উপযুক্ত কোনো পেশা গ্রহণ করতে পারবে, যা তার জন্যে যথেষ্ট হবে, তাহলে তাকে তার পেশার জন্যে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ক্রয়ের মূল্য দেওয়া যেতে পারে তা যত বেশিই হোক না কেন। তাই যে-লোক ভালো ব্যবসা করতে পারে, তাকে যথেষ্ট পরিমাণে মূলধন দেওয়া যেতে পারে, যেন ব্যবসায়ের মুনাফা দ্বারা সে তার প্রয়োজন যথেষ্টভাবে পূরণ করতে সক্ষম হয়। আর এই মূলধন দেওয়ার ব্যাপারটি ব্যক্তি ও স্থানের তারতম্যের দরুন কমবেশিও হতে পারে।

যদি সে বেশির ভাগ উত্তম পেশা গ্রহণে সক্ষম হয় আর সবটাই তার জন্যে যথেষ্ট হয়, তাহলে তাকে মূল্য বা মূলধন যতটা কম দিলে চলে, তা-ই দিতে হবে। যদি তাকে কতকাংশ দিলে যথেষ্ট হয়, তাহলে তা-ই তাকে দেওয়া যাবে। তার একাংশ যদি একজনের জন্যে যথেষ্ট না হয়, তাহলে সেই একজনকে দিতে হবে এবং তার বেশি বেশি জমি ক্রয় করে দেওয়া যাবে, যার আয় তার অসম্পূর্ণ প্রয়োজন যথেষ্টভাবে পূর্ণ করবে।[১]

---

১. نهاية المحتاج الى شرح المنها ج ٦ ص ١٥٩

www.amarboi.org

ইমাম শাফেয়ী তাঁর الأم গ্রন্থে এই কথাগুলো লিখেছেন। তাই তাঁর অধিকাংশ সঙ্গী-সাথীও এই মতকেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন। এর ওপর ভিত্তি করে তার অনেক শাখা-প্রশাখা বের করেছেন। আর এ পর্যায়ে তিনটি বিস্তারিত সূক্ষ্ম আলোচনার অবতারণা করেছেন, যা আমরা এখানে উদ্ধৃত করলাম।

ইমাম আহমাদের মতও ইমাম শাফেয়ীর প্রায় অনুরূপ। তিনি দরিদ্র ফকীর ব্যক্তির পক্ষে তার চিরজীবনের প্রয়োজন পরিমাণ সম্পদ গ্রহণ জায়েজ বলে মত প্রকাশ করেছেন। আর তা নেওয়া যেতে পারে ব্যবসায় মূলধন বা কোনো শিল্প সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি হিসেবে। হাম্বলী মতের কোনো কোনো ফিকাহবিদও এই মত গ্রহণ করেছেন এবং তদনুযায়ী কাজ করাকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন।[১]

ইমাম খাত্তাবী উপরে উদ্ধৃত কুবাইচা বর্ণিত হাদীসের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, সাদকা বা যাকাত দানের চূড়ান্ত প্রান্তিক পরিমাণ হচ্ছে প্রয়োজন পূরণে যথেষ্ট পরিমাণ, যদ্দারা জীবনের প্রয়োজন যথেষ্টভাবে পূরণ হবে, জীবিকা সমস্যার সমাধান হবে এবং দারিদ্র্য মোচন হবে। আর তার হিসেবটা হবে প্রত্যেক ব্যক্তির অবস্থার ও জীবন জীবিকা মানের প্রেক্ষিতে। তাতে কোনো সীমা নির্দিষ্ট নেই। প্রত্যেক ব্যক্তির অবস্থার তারতম্যের বিচারেরই তা নির্ধারণ করতে হবে।[২]

যখন দিবেই, তখন সচ্ছল করে দাও

উপরিউক্ত মতটি হযরত উমর ফারূক (রা) থেকে বর্ণিত মতের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। হযরত উমর ফারূকের রাজনীতি এই খাতেই প্রবাহিত দেখতে পাচ্ছি এবং এ নীতি অতীব যুক্তিসঙ্গত, নিখুঁত ও সুষ্ঠু সন্দেহ নেই। হযরত উমর ফারূকেরই অপর একটি উক্তি হচ্ছে ঃ

إِذَا اَعْطَيْتُمْ فَاَغْنَوْا -

যখন দিবেই, তখন ধনী বানিয়ে দাও– সচ্ছল বানিয়ে দাও।[৩]

হযরত উমর (রা) যাকাত সম্পদ দিয়ে দরিদ্র ব্যক্তিকে বাস্তবিকই ধনী ও সচ্ছল বানিয়ে দিতেন। সামান্য খাদ্যের ব্যবস্থা করে দিয়ে কিংবা কয়েকটি দিরহাম দিয়ে তা ক্ষুধা বা উপস্থিত প্রয়োজন পূরণ করে দিয়েই ক্ষান্ত হতেন না।

তখনকার সময়ের ঘটনা, এক ব্যক্তি তার নিকট এসে তার অর্থনৈতিক দুরবস্থার বর্ণনা দিয়ে সাহায্য প্রার্থনা করে বসলো। তিনি তাকে তিনটি উট দিয়ে

---

১. الانصاف ج ٣ ص ٢٣٨

২. معالم السنن ج٢ ص ٥٦٥

৩. الاموال ص ٥٦٥

www.amarboi.org

দিলেন। এটা ছিল তাকে দারিদ্র্য থেকে বাঁচানোর জন্যে। তিনি যাকাত বণ্টনকারী কর্মচারীদের নির্দেশ দিলেন, যাকাত পাওয়ার যোগ্য লোকদের মধ্যে বারবার তা বণ্টন করো– তাতে এক-একজন একশ'টি করে উট পেয়ে গেলেও ক্ষতি নেই।[১]

দরিদ্রদের ব্যাপারে তার নীতি ঘোষণা করলেন উদাত্ত কণ্ঠে ঃ

لَأُكَرِّرَنَّ عَلَيْهِمُ الصَّدَقَةَ وَإِنْ رَاحَ عَلَى أَحَدِهِمْ مِائَةٌ مِّنَ الْإِبِلِ -

আমি তাদের বারবার যাকাত দেবো, তাদের একজন একশ'টি করে উট পেয়ে গেলেও।

তাবেয়ী ফিকাহবিদ আতা বলেছেন, 'কোনো মুসলিম ঘরের লোকদের মধ্যে যাকাত বণ্টন করলে পূর্ণমাত্রায় দাও। তা-ই আমার নিকট পছন্দ।'

এই মত অনুযায়ী ইসলামী রাষ্ট্র যাকাত-সম্পদ দ্বারা বড় বড় কল-কারখানা, খামার ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে পারে, যার মালিক হবে কেবলমাত্র গরীব লোকেরা– তার সবটার অথবা তার কিছু অংশের। যেন তার আয় দ্বারা তাদের যথেষ্ট মানে জীবিকা নির্বাহের ব্যবস্থা হয়ে যায়। তারা এই সবের মালিক হলেও তা বিক্রয় করার বা মালিকানা হস্তান্তর করার কোনো অধিকার তাদের থাকবে না। ফলে এসব প্রতিষ্ঠান 'প্রায় ওয়াকফ' সম্পত্তিতে পরিণত হয়ে স্থায়ী হয়ে থাকবে।

দ্বিতীয় মত ঃ এক বছরের জন্যে যথেষ্ট পরিমাণ দিতে হবে।

এখানে দ্বিতীয় একটি মত রয়েছে। মালিকী, হাম্বলী ও অন্যান্য মতের সাধারণ ফিকাহবিদগণ এ মতটি উপস্থাপিত করেছেন। এ মতের বক্তব্য হলো, ফকীর ও মিসকীনকে যাকাত সম্পদ থেকে এতটা পরিমাণ দিতে হবে, যা তার ও তার ওপর নির্ভরশীলদের এক বছরের জন্যে প্রয়োজন পূরণে যথেষ্ট হবে। এ মতের লোকেরা সারা জীবনের জন্যে যথেষ্ট– এমন পরিমাণ দেওয়ার প্রয়োজন মনে করেন নি। অনুরূপভাবে এক বছরের জন্যে প্রয়োজন পরিমাণের কম দেওয়ারও যৌক্তিকতা তাঁরা স্বীকার করেন নি।

তাঁরা এক বছর সময়ের জন্যে দেওয়ার পক্ষপাতী এজন্যে যে, সাধারণত প্রত্যেক ব্যক্তি তার সমাজ তথা রাষ্ট্রের নিকট থেকে এই মেয়াদকালে জৈবিক নিরাপত্তা লাভের অধিকারী। রাসূলে করীম (স)-এর অনুসৃত নীতিতেও তার সমর্থন ও দৃষ্টান্ত রয়েছে। একথা সহীহ সূত্রে জানা গেছে যে, তিনি তার পরিবারবর্গের জন্যে এক বছর কালের খোরাক মজুত করে রাখতেন।[২]

---

১. الا موال ص ٥٦٥

২. বুখারী. মুসলিম

www.amarboi.org

উপরন্তু যাকাতের মাল তো সাধারণত বার্ষিক হিসেবে সংগ্রহ করা হয়। কাজেই তা থেকে কাউকে সারা জীবনের রসদ যোগাবার কোনো কারণ থাকতে পারে না। প্রতি বছরই যাকাত সম্পদ সংগৃহীত হবে এবং তা পাওয়ার যোগ্য লোকদের মধ্যে বার্ষিক হিসেবে বন্টন করা হবে, এটাই যুক্তিযুক্ত কথা।[১]

এ মতের লোকেরা একথাও মনে করেন যে, এক বছরের জন্যে কতটা যথেষ্ট, তার কোনো পরিমাণ– সীমা নির্দিষ্ট নয়। বরং যথাসম্ভব পাওয়ার যোগ্য লোকদের এক বৎসরের সচ্ছলতা বিধানকারী মান অনুযায়ীই বন্টন করতে চেষ্টা করা উচিত।

যদি কোনো ফকীর বা মিসকীনের এক বৎসরের প্রয়োজন যথেষ্টভাবে পূরণ হতে নিসাব পরিমাণেরও বেশির প্রয়োজন হয়, তাহলে তাকে তা-ই দিতে হবে। তাতে যদি সে ধনী হয়ে যায়, তবু কোনো দোষ নেই। কেননা দেওয়ার সময় তো সে ফকীর বা মিসকীনই ছিল এবং যাকাত পাওয়ার যোগ্য ছিল।

বিয়ে করিয়ে দেওয়াও পূর্ণমাত্রার যথেষ্ট পরিমাণের অন্তর্ভুক্ত

'যথেষ্ট পরিমাণে দিতে হবে'– এই নীতির আলোকে আমি আরও একটি কথা এখানে বলতে চাই। তা হচ্ছে, ফকীর বা মিসকীনের জন্যে 'যথেষ্ট পরিমাণে'র পূর্ণ মাত্রার বাস্তবায়ন ও সম্পূর্ণতা দান। ইসলামী ফিকাহ তাই মনে করে। এই প্রেক্ষিতে ইসলামের আলিমগণের এ কথা বিবেচনা করা বাঞ্ছনীয় যে, শুধু পান-আহার-পোশাকই কেবল মানুষের মৌল প্রয়োজন নয়। মানুষের স্বভাবজাত প্রয়োজন ও তাগিদ আরও রয়েছে। যা না হলে মানুষের জীবন পূর্ণত্ব পেতে পারে না। সে প্রয়োজনের চরিতার্থতা একান্তই আবশ্যক। আর তা হচ্ছে প্রজাতি সংরক্ষণ ও যৌন প্রবণতার চরিতার্থতা বিধান। আল্লাহ্ তা'আলা পৃথিবী আবাদকরণ ও মানব বংশ সংরক্ষণে আল্লাহ্র ইচ্ছা বাস্তবায়নে এ বিষয়টিকে চাবুকের মতো বানিয়ে দিয়েছেন, মানুষ এর দ্বারাই চালিত হয় সেই লক্ষ্যের পানে। ইসলাম এই স্বভাবজাত ভাবধারার প্রতি কোনোরূপ উপেক্ষা প্রদর্শন করে নি; বরং এই জিনিসকে সুসংগঠিত করেছে এবং আল্লাহ্র বিধানের ভিত্তিতে তার সীমা ও নিয়ম-কানুন নির্ধারণ করেছে।

অপরদিকে ইসলাম অবিবাহিত জীবন যাপন, নারীবিহীন অবস্থায় জীবন কাটানো বা পুরুষত্ব হনন-হরণের কাজকে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করে দিয়েছে। মানুষের

---

১. মালিকী মাযহাবের কেউ কেউ বলেছেন, যাকাত বার্ষিক হিসেবে বন্টন করা না হলে এক সঙ্গে এক বছরের প্রয়োজনের অধিকও দেওয়া যেতে পারে।

www.amarboi.org

যৌন ও প্রজনন শক্তি দমনের কোনো চেষ্টা-ভাবধারাকেই আদৌ সমর্থন দেয়নি এবং প্রত্যেক দৈহিক সামর্থ্যসম্পন্ন পুরুষকে বিয়ে করার নির্দেশ দিয়েছে। আদেশ হচ্ছে ঃ

مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَنَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ - فَاِنَّهُ اَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَاَحْصَنُ لِلْفَرْجِ -

তোমাদের যে-কেউ সামর্থ্যবান হবে, সে-ই যেন বিয়ে করে। কেননা এই বিয়েই তার দৃষ্টিকে নত রাখবে এবং তার যৌন অঙ্গের সংরক্ষণ করবে অতীব উত্তমভাবে।[১]

অতএব সমাজের বিবাহেচ্ছুক (বিবাহক্ষম) নর-নারী মহরানা ইত্যাদি দিতে আর্থিকভাবে অক্ষম হলে তাদের সাহায্য করা যে একান্তই কাম্য, তাতে কোনোই সন্দেহ নেই।

এই কারণে বিশেষজ্ঞদের এ কথা বিস্ময়োদ্দীপক নয় যে, ফকীর মিসকীন ব্যক্তি বিবাহিত না হলেও বিয়ের প্রয়োজন হয়ে থাকলে তার বিয়ের ব্যবস্থা করে দেওয়া ও তাকে যথেষ্ট পরিমাণে যাকাত দেওয়ার অন্তর্ভুক্ত কাজ।[২]

শুধু তা-ই নয়, তারা এতদূর বলেছেন যে, যদি কারুর একজন স্ত্রী যথেষ্ট না হয়, তাহলে দুইজন স্ত্রী যোগাড় করে দিতে হবে। কেননা 'যথেষ্ট পরিমাণে' দেওয়ার মধ্যে এটিও গণ্য।[৩]

খলীফায়ে রাশেদ উমর ইবনে আবদুল আজীজ লোকদের মধ্যে ঘোষণা করতেন ঃ 'কোথায় মিসকীনরা, কোথায় ঋণগ্রস্ত লোকেরা, কোথায় বিবাহেচ্ছু লোকগণ ....।' তার এই ডাকের উদ্দেশ্য ছিল এ পর্যায়ের সকল লোকের প্রয়োজন বায়তুলমাল থেকে পূরণ করার ব্যবস্থা করা।

এ পর্যায়ের আসল ভিত্তি হচ্ছে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণিত একটি হাদীস। এক ব্যক্তি রাসূলে করীম (স)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বলল, 'আমি আনসার বংশের একটি মেয়ে বিয়ে করেছি।' তিনি জিজ্ঞেস করলেন,"কত মহরানা নির্দিষ্ট করলে ?" বললে "চার আউকিয়া (৪×৪০=১৬০ দিরহাম)।" নবী করীম (স) বললেন, "মাত্র চার আউকিয়া ? মনে হচ্ছে, তোমরা এই পাহাড়টি ফেলানোর জন্যে রৌপ্য খোদাই করছ। এখন তো আমাদের নিকট কিছু নেই। কিন্তু খুব শীগগীরই আমরা তোমাকে এমন প্রতিনিধিত্বে পাঠাব, যাতে তুমি অনেক কিছুই পেয়ে যাবে।"[৪]

---

১. বুখারী কিতাবুস্ সাওম

২. حاشيه الروض المربع ج ١ ص ٤٠٠

৩. شرح كتاب الفيل وشفاء العليل

৪. نيل الاوطار ج ٦ ص ٣١٦

www.amarboi.org

হাদীসটি থেকে জানা গেল, এই অবস্থায় নবী করীম (স)-এর বিরাট দানের কথা লোকদের ভালোভাবে জানা ছিল। এ কারণেই তিনি বলেছিলেন ঃ এখন তো আমার নিকট দেবার মতো কিছু নেই, তবে তোমার জন্যে অন্য ব্যবস্থা করা হবে, যা থেকে তুমি প্রচুর পেয়ে যাবে।

ইলমের বই-পত্র দানও 'যথেষ্ট দানে'র অন্তর্ভুক্ত

ইসলাম মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধির বিকাশ দানকারী দ্বীন। তা মানুষকে ইলম শেখার আহ্বান জানিয়েছে, বিদ্বান লোকদের সম্মান ও মর্যাদা অনেক উঁচু করে তুলেছে, বরঞ্চ, ইলমকে ঈমানের কুঞ্চিকা এবং কর্মের প্রেরণাদায়ক বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। অন্ধ অনুসরণকারীর ঈমান ও অজ্ঞ-মূর্খের ইবাদতের কোনো মূল্য ইসলামে গণ্য করা হয়নি। কুরআন সুস্পষ্ট ভাষায় প্রশ্ন তুলেছে ঃ

'যারা জানে, আর যারা জানে না, তারা উভয় কি সমান হতে পারে' ?[১]

বিজ্ঞ ও মূর্খ এবং ইলম ও মূর্খতার মধ্যকার পার্থক্য স্পষ্ট করে দেওয়ার উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে ঃ

'অন্ধ ও দৃষ্টিমান– পুঞ্জীভূত অন্ধকার ও আলো কখনোই অভিন্ন হতে পারে না।[২]

রাসূলে করীম (স) বলেছেন ঃ

'ইলম সন্ধান– অর্জন মুসলিম মাত্রের জন্যেই ফরয়।'[৩]

এখানে যে 'ইলম'-এর কথা বলা হয়েছে, তা প্রচলিত ধরনের দ্বীনি ইলমের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। বরং সকল প্রকার কল্যাণকর ইল্‌মই এর অন্তর্ভুক্ত। মুসলিম সমাজ তার এই জীবনে যত কিছু জ্ঞানের মুখাপেক্ষী তা সবই শিখতে হবে। তাতে স্বাস্থ্য রক্ষা, অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়ন ও সমাজ-সভ্যতা পরিচালন ও সংগঠন সংক্রান্ত সব ইল্‌ম শামিল রয়েছে। শত্রুদের প্রতিরোধ করার জন্যে সামরিক বিদ্যাও এর বাইরে নয়। এ সবই 'ফরযে কিফায়া'। বিশেষজ্ঞ আলেমগণ এই মত দিয়েছেন।

এ কারণে ইসলামের ফিকহ্‌বিদগণ যাকাত বন্টনের বিধানে ঘোষণা করেছেন, ইল্‌ম অর্জনে একনিষ্ঠভাবে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গকে তার অংশ দিতে হবে– দেওয়া যাবে। অথচ ইবাদতের কাজে একান্তভাবে আত্মনিয়োগকারীর জন্যে তা হারাম ঘোষিত হয়েছে। তার কারণ, ইবাদতের জন্যে উপার্জন বিমুখ হওয়ার কোনো

---

১. سورة الزمر - ٩

২. سوره فاطر ١٩-٢٠

৩. ابن عبد البرعن انس (رض)

www.amarboi.org

প্রয়োজন নেই; কিন্তু ইল্‌ম ও তাতে ব্যুৎপত্তি অর্জন একনিষ্ঠ ও একান্ত হয়ে নিয়োজিত না হওয়া পর্যন্ত সম্ভব নয়। উপরন্তু ইবাদতে নিয়োজিত ব্যক্তির কাজ নিজের জন্যে আর ইলম শিক্ষার্থীর কাজ তার নিজের জন্যে যেমন, তেমনি সমগ্র মানবতার কল্যাণেও।[১]

ইসলাম এ কথা বলেই ক্ষান্ত হয়নি। ফিকহ্‌বিদগণ এও বলেছেন যে, ফকীর-মিসকীন ব্যক্তির ইলম অর্জনে প্রয়োজনীয় কিতাবাদি খরিদ করার উদ্দেশ্যে যাকাত গ্রহণ করতে পারে, যদি তা দ্বীন ও দুনিয়ার কল্যাণের জন্যে অপরিহার্য হয়ে পড়ে।[২]

হানাফী ফিকাহ্‌বিদদের মতে যাকাতের মাল এক শহর থেকে অন্য শহরে নির্দ্বিধায় স্থানান্তরিত করা জায়েজ, যদিও এটা নিয়মের পরিপন্থী–যদি তা ইলম শিক্ষার্থীকে সাহায্য করার উদ্দেশ্যে হয়।[৩]

যাকাত কার্যে নিয়োজিত কর্মচারী

যাকাতের অর্থনৈতিক ও প্রতিষ্ঠানগত ব্যবস্থাপনা

কুরআনে নির্দিষ্ট যাকাত ব্যয়ের খাতসমূহের মধ্যে তৃতীয় হচ্ছে ‘এজন্যে নিয়োজিত কর্মচারী’। এর পূর্বে ফকীর ও মিসকীনের কথা বলা হয়েছে। ‘যাকাতে নিয়োজিত কর্মচারী’ বলতে বোঝায় যাকাত আদায়, সংরক্ষণ ও ব্যয়-বন্টন সংক্রান্ত যাবতীয় কাজের জন্যে গড়ে তোলা প্রতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনা। এর মধ্যে যাকাত আদায়কারী, সংরক্ষণকারী, পাহারাদার, লেখক, হিসাব রক্ষক এবং তার বণ্টনকারী– সব লোকই গণ্য। এসব লোকের পারিশ্রমিক যাকাত সম্পদ থেকে দেওয়ার ব্যবস্থা স্বয়ং আল্লাহ তা‘আলাই করে দিয়েছেন,– যেন তারা মালের মালিকদের নিকট থেকে যাকাত ছাড়া আর কিছুই গ্রহণ না করে, তার প্রয়োজনও তারা বোধ না করে। উপরন্ত এই ব্যবস্থা দ্বারা এ কথাও প্রমাণিত হয় যে, যাকাত একটা স্বয়ংসম্পূর্ণ ব্যবস্থা ও সংস্থা। এর নিজের আয় দ্বারাই তাকে চলতে হবে। অপর কোনো আয়ের উৎসের ওপর নির্ভরশীল হবে না। এই সংস্থার সঙ্গে জড়িত সকলের প্রয়োজন এখান থেকেই পূরণ করতে হবে।

কুরআন মজীদে যাকাত ব্যয়ের অন্যতম খাতরূপেই তাদের উল্লেখ করা হয়েছে এবং তা একটি অকাট্য দলীল। যাকাত পাওয়ার যোগ্য আট প্রকারের মধ্যে এরাও এক প্রকারের প্রাপক। এদের স্থান নির্ধারণ করা হয়েছে ফকীর ও মিসকীনের পর।

---

১. المجموع ج ٦ ص ١٩٠
২. الانصاف فی الفقه الحنبلی ج
৩. الدر المختار وحاشیه ج ٢ ص ٩٤

www.amarboi.org

কেননা এরাই প্রথম প্রাপক ও অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত লোক। এই সব কিছু প্রমাণ করে যে, যাকাত-ব্যবস্থা ইসলামে ব্যক্তির ওপর অর্পিত কাজ নয়। বরঞ্চ এটা আসলে রাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত। রাষ্ট্রই এর যাবতীয় ব্যবস্থাপনা, গঠন ও পরিচালন করবে। যাকাত আদায়কারী, খাজাঞ্চী, লেখক ও হিসাবরক্ষক সব কিছু নিযুক্ত করা ইসলামী রাষ্ট্রের দায়িত্ব। বস্তুত যাকাতের একটা আয় রয়েছে, আছে একটা বিশেষ বাজেট বা আয়-ব্যয়ের পরিকল্পনা। যারা এখানে কাজ করবে, তাদের মাসিক বেতন এখান থেকেই দেওয়া হবে।

যাকাত আদায়কারী কর্মচারীদের কর্তব্য

যাকাত সংক্রান্ত কাজে নিয়োজিত কর্মচারীদের বহু প্রকারের দায়িত্ব ও বিভিন্ন রকমের কাজ রয়েছে। তা সবই যাকাত সংগঠনের সাথে সংশ্লিষ্ট। কোন লোকের ওপর এবং কোন মালে যাকাত ধার্য হবে, যাকাতের পরিমাণ কত হবে, যাকাত কে কে পেতে পারে, তাদের সংখ্যা কত, তাদের প্রয়োজনের চূড়ান্ত মাত্রা বা পরিমাণ কত– কত পেলে তাদের জন্যে যথেষ্ট হয়, প্রয়োজন মেটে, এসব নির্ধারণ তাদেরই বড় কাজ।

যাকাতের জন্যে দুটো প্রতিষ্ঠান

আমাদের এ যুগে যাকাতের সম্পূর্ণ ব্যাপারটি সুষ্ঠুভাবে আঞ্জাম দেওয়ার জন্যে দুটো শীর্ষস্থানীয় প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা যেতে পারে। প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের অধীন বহু কয়টি শাখা সংস্থাও গড়ে উঠতে পারে ঃ

প্রথম ঃ যাকাত আদায় বা সংগ্রহকারী প্রতিষ্ঠান ।

দ্বিতীয় ঃ যাকাত বণ্টনকারী প্রতিষ্ঠান।

যাদের মন সন্তুষ্ট করা প্রয়োজন

এই পর্যায়ে সেই লোক গণ্য যাদের মন ইসলামের দিকে আকৃষ্ট করার জন্যে, কিংবা ইসলামের ওপর তাদের সুপ্রতিষ্ঠিত রাখার জন্যে অথবা যাদের দুষ্কৃতি থেকে মুসলিম জনগণকে রক্ষা করার জন্যে বা তাদের থেকে রক্ষা পাওয়ার কাজে তাদের আনুকূল্য লাভের আশায় অথবা মুসলমানদের শত্রুদের ওপর কোনোরূপ বিজয় লাভের উদ্দেশ্যে তাদের সাহায্য প্রয়োজনীয় বলে এদের জন্যে যে অর্থ ব্যয় করার প্রয়োজন হবে, যাকাত ফাণ্ড থেকে তা করা যাবে।

www.amarboi.org

এই খাতটির ফায়দা

এই খাতটি পূর্বে বলা কথাকে অধিকতর স্পষ্ট করে আমাদের জানিয়ে দেয় যে, যাকাত কোনো ব্যক্তিগত দয়া-অনুগ্রহের ব্যাপার নয়। নিছক ইবাদতও নয় তা, যা শুধু ব্যক্তিগতভাবেই আদায় করলে চলবে। কেননা এই খাতটি সাধারণত ব্যক্তিগতভাবে পালন পর্যায়ে নয়। আসলে তা রাষ্ট্রপ্রধানের কিংবা তার প্রতিনিধির করণীয় কিংবা জাতির কর্তৃত্বসম্পন্ন অপর কোনো ব্যক্তির পালনের ব্যাপার। এই লোকেরাই বুঝতে পারে, কোন লোকদের মন সন্তুষ্ট করার প্রয়োজন কিংবা কাদের তা করতে হবে না। কাদের মন সন্তুষ্ট করতে হবে এবং সেজন্যে অর্থব্যয় করতে হবে ইসলামের অগ্রগতি ও মুসলিম জনগণের কল্যাণের জন্যে, তাদের গুণ-পরিচয় নির্ধারণ করাও তাদেরই করণীয়।

এই লোকদের কয়েকটি ভাগ

এ পর্যায়ের লোক যেমন কাফের সমাজের মধ্যে থাকবে, তেমনি থাকতে পারে মুসলিম নামে পরিচিত লোকদের মধ্যেও ঃ

ক. যাকে অর্থ দিলে সে বা তার গোত্র বা বংশের লোকেরা ইসলাম কবুল করবে বলে আশা করা যায়, তারা এই পর্যায়ে গণ্য। দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যায়, মক্কা বিজয়ের দিন নবী করীম (স) সাফওয়ান ইবনে ইমাইয়্যাকে নিরাপত্তা দিয়েছিলেন এবং তার দাবি অনুযায়ী তার ব্যাপারটি পর্যবেক্ষণের জন্যে চারটি মাস সময় নির্ধারণ করেছিলেন। পরে সে নিরুদ্দেশ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু হুনাইন যুদ্ধকালে উপস্থিত হয়ে সে মুসলমানদের সাথে যোগদান করে, অথচ তখন পর্যন্ত সে ইসলাম কবুল করেনি। নবী করীম (স) এই যুদ্ধে যাত্রা করার পূর্বে তার অস্ত্রশস্ত্র ধার নিয়েছিলেন এবং তিনি তাকে বিপুল সংখ্যক উট দিয়ে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন ঃ এটা সেই দান যা পাওয়ার পর দারিদ্র্য সম্পর্কে কোনো ভয় থাকে না। মুসলিম ও তিরমিযী সায়ীদ ইবনুল মুসাইয়্যিব সূত্রে বর্ণনা করেছেন, সাফওয়ান বলেছে ঃ নবী করীম (স) পূর্বে আমার নিকট সর্বাধিক ঘৃণ্য ব্যক্তি ছিলেন, কিন্তু তিনি আমাকে ক্রমাগতভাবে দান করেছিলেন। তাঁর নিকট থেকে এই অব্যাহত দান পেয়ে পেয়ে এমন অবস্থা হলো যে, তিনিই হয়ে গেলেন আমার নিকট সর্বাধিক প্রিয় ব্যক্তি।[১]

এই লোকটি পরে ইসলাম কবুল করে খুবই ভালো মুসলমান হয়েছিল।

---

১. تفسير ابن كثير ج ٦ ص ٣٢٥

www.amarboi.org

ইমাম আহমাদ সহীহ সনদে হযরত আনাস সূত্রে বর্ণনা করেছেন, নবী করীম (স) -এর নিকট ইসলামের নামে যা কিছু প্রার্থনা করা হতো, তিনি তা অবশ্যই দান করতেন। এক ব্যক্তি এসে তাই প্রার্থনা করেছিল। নবী করীম (স) তাকে বহু সংখ্যক ছাগল দিয়ে দেবার নির্দেশ দিলেন। এগুলো যাকাত ফাণ্ডের ছিল এবং উপত্যকায় পালিত হচ্ছিল। লোকটি এই ছাগলগুলোসহ যখন তার নিজের গোত্রের লোকদের নিকট উপস্থিত হলো, বলল ঃ 'হে লোকেরা, তোমরা ইসলাম কবুল করো! কেননা মুহাম্মাদ (স) লোকদের এত বেশি দান করেন যে, অতঃপর আর দরিদ্র বা অনশনের ভয় করতে হয় না।'[১] এ দানও এই পর্যায়ে শামিল।

খ. যে লোকের দুষ্কৃতির ভয় করা হয়, তাকে টাকা-পয়সা দিলে তার দুষ্কৃতি এবং তার সাথে সাথে অন্যদের ক্ষতিকর কার্যকলাপ থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে বলে আশা করা যায়, তাকেও এই যাকাত থেকে দেওয়া যাবে। হযরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত হয়েছে, কতগুলো লোক নবী করীম (স)-এর নিকট বারে বারে আসত। তিনি যদি যাকাতের সম্পদ থেকে কিছু দিতেন, তাহলে তারা ইসলামের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হতো। বলত, এ উত্তম দ্বীন। আর কিছু না দিলে তারা দোষ গেয়ে বেড়াত ও গালমন্দ বলতে শুরু করত। এই ধরনের লোকদেরও যাকাত ফাণ্ড থেকে দেওয়া যায়।[২]

গ. নতুন ইসলাম গ্রহণকারী লোকেরা (অর্থনৈতিক সংকটের সম্মুখীন হয় বলে) তাদের আর্থিক সাহায্য করতে হয়। তবেই তারা ইসলামে স্থির ও অটল হয়ে থাকবে বলে আশা করা যায়।

'আল-মুয়াল্লাফাতু কুলুবুহুম'– শব্দদ্বয়ের ব্যখ্যা ইমাম জুহরীর নিকট জানতে চাওয়া হয়েছিল। জবাবে তিনি বললেন, যে ইয়াহুদী বা খ্রিস্টান ইসলাম কবুল করবে, সে-ই এর মধ্য গণ্য। জিজ্ঞেস করা হলো, সে যদি ধনী লোক হয় ? বললেন, সে যদি ধনী লোক হয়, তবুও তাকে এই ফাণ্ড থেকে সাহায্য দেওয়া যাবে।[৩] হাসান বলেছেন, যারা (নতুনভাবে) ইসলাম কবুল করবে, তারা সকলেই সাহায্য পাওয়ার অধিকারী।[৪]

কেননা নতুন ইসলাম গ্রহণকারী ব্যক্তি তার পূর্বতন ধর্ম ত্যাগ করেছে, তার পিতামাতা ও বংশ-পরিবারের নিকট তার প্রাপ্য ধন-মালের দাবিও প্রত্যাহার করেছে। তার বংশের বহু লোকই তার সাথে শত্রুতা করতে শুরু করে দেবে

---

১. نيل الاوطار ج ٤ ص ١٦٦

২. تفسير الطبرى ج ١٤ص ٣١٣

৩. تفسير الطبرى ج ١٤ ص ٣١٤ المصنفلابى شيبة ٣ ص ٢٢٣

৪. المصنف الابى شيبة الاكليل للسيوطى ص ١٤٩

www.amarboi.org

এটাই স্বাভাবিক। এর ফলে তার জীবিকার সব পথ ও উপায় বন্ধ বা বিনষ্ট হয়ে যেতে পারে। এরূপ দুনিয়ার স্বার্থ ত্যাগকারী ও আল্লাহ্‌র জন্য নিজেকে বিক্রয়কারী ব্যক্তি ইসলাম ও মুসলিম সমাজের নিকট থেকে বিপুল উৎসাহ ও সাহায্য-সহযোগিতা পাওয়ার অধিকারী, তাতে কোনোই সন্দেহ নেই।

ঘ. মুসলিম সমাজের নেতৃস্থানীয় ও কর্তা ব্যক্তিদের পক্ষে অনেক কাজের লোকদের সাথে সাক্ষাৎ ও কথাবার্তা এবং চিন্তার আদান-প্রদান করার সুযোগ ঘটে। অনেকের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কও গড়ে উঠতে পারে। এই সময় তারা যদি তাদের কিছু দান করে, তাতে তারা ইসলামের প্রতি খুবই আশাবাদী হয়ে উঠতে পারে। হযরত আবূ বকর (রা) আদী ইবনে হাতেম ও জারকার ইবনে বদরকে অনেক দান-উপঢৌকনে ধন্য করে দিয়েছিলেন। তাদের নিজ জাতির লোকদের নিকট তাদের উচ্চতর মর্যাদার কারণে ইসলামের প্রতি তাদের আচণ খুবই উত্তম ছিল।[১]

ঙ. দুর্বল ঈমানের নেতৃস্থানীয় মুসলমানরাও এই শ্রেণীভুক্ত। তারা জনগণের নিকট অনুসৃত, তাদের ওপর যথেষ্ট প্রভাবশালী হয়ে থাকে। তাদেরকে অর্থদান করা হলে তারা ইসলামে স্থিত থাকবে, তাদের ঈমান দৃঢ় ও শক্তিশালী হবে এবং কাফেরদের সাথে জিহাদে তাদের নিকট থেকে মূল্যবান আনুকূল্য পাওয়া যাবে বলে খুবই আশা করা যায়। নবী করীম (স) সামাজের এই শ্রেণীর লোকদেরকে 'হাওয়াজিন' যুদ্ধে প্রাপ্ত গনীমতের মাল থেকে বিপুল পরিমাণ দান করেছিলেন। এরাই মক্কার সেসব লোক ছিল, যাদেরকে নবী করীম (স) ক্ষমা করে দিয়েছিলেন। পরে তারা খুবই পাক্কা মুসলিম হয়ে গিয়েছিল, যদিও পূর্বে তারা হয় মুনাফিক, না হয় দুর্বল ঈমানের লোক ছিল। পরবর্তীকালে ইসলামী আদর্শ পালনে তাদের দৃঢ়তা আদর্শস্থানীয় হয়েছিল।[২]

চ. অনেক মুসলমান শত্রুদেশের সীমান্তে একেবারে মুখের কাছে অবস্থিত থাকে। শত্রুদের আক্রমণ হলে তারা প্রতিরক্ষামূলক কাজ করে মুসলিম সমাজকে রক্ষা করতে পারে। এদেরকেও যাকাত ফাণ্ড থেকে সাহায্য দেওয়া যেতে পারে।

ছ. অনেক মুসলমান সমাজে এমন প্রভাবশালী হয়ে থাকে যে, তাদের বাস্তব সহযোগিতা না হলে– তারা প্রভাব বিস্তার না করলে ও চাপ সৃষ্টি না করলে– যাকাত সংগ্রহ করাই অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। অন্যথায় সেজন্যে যুদ্ধ করার প্রয়োজনও দেখা দিতে পারে। এই কারণে তাদেরকে সন্তুষ্ট রেখে তাদেরকে সরকারের সহযোগী ও সাহায্যকারী বানিয়ে রেখে কাজ করা খুবই প্রয়োজনীয়

---

১. تفسير المنار ج ١٠ ص ٥٧٤

২. تفسير القرطبى ج ٧ ص ١٧٩

www.amarboi.org

হয়ে পড়ে। তা করা দুটো মারাত্মক কাজের মধ্যে অপেক্ষাকৃত কম ক্ষতিকর কাজ, দুটো কল্যাণমূলক কাজের মধ্যে অগ্রাধিকার পাওয়ার যোগ্য কল্যাণ পথ। এই কাজটি আংশিক হলেও অনেক সময় সাধারণের জন্যে অধিক কল্যাণের কারণ হতে পারে।[১]

এই সকল পর্যায়ের লোকেরা اَلْمُؤَلَّفَةُ قُلُوْبُهُمْ -এর অন্তর্ভুক্ত–তারা কাফের হোক, কি মুসলিম।

এ যুগে 'মুয়াল্লাফাতু' খাতের টাকা কোথায় ব্যয় করা হবে

'মুয়াল্লাফাতু কুলুবুহুম' খাতটি বাতিল হয়নি এবং যাকাতের অংশ এই খাতে ব্যয় করার অবকাশ এখনও আছে। তাই প্রশ্ন ওঠে, বর্তমান যুগে এই খাতের টাকা কোন কাজে ব্যয় করা হবে?

এই প্রশ্নের জবাব আমাদের পূর্ববর্তী আলোচনা থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। শরীয়তের বিধানদাতা যে উদ্দেশ্যে এ খাতটি রেখেছেন, ঠিক সেই উদ্দেশ্যে এ যুগেও তা ব্যয়িত হবে। আর তা হচ্ছে, লোকদের মন ইসলামের দিকে আকৃষ্ট করা এবং ইসলামে প্রতিষ্ঠিত ও দৃঢ় করে রাখার কাজে এই টাকা ব্যয় করা অথবা ইসলামে যারা দুর্বল অবস্থায় রয়েছে, তাদের শক্তিশালী করার জন্যে ব্যয় করা। ইসলামের সাহায্যকারী লোক সংগ্রহ কিংবা ইসলামী দাওয়াতী আন্দোলন ও ইসলামী রাষ্ট্রের শত্রুদের অনিষ্ট প্রতিরোধ করার কাজেও ব্যয়িত হতে পারেবে। কোনো কোনো সময়ে কোনো অনৈসলামী রাষ্ট্রকে মুসলমানদের স্বপক্ষে রাখার জন্যেও তা ব্যয় করার প্রয়োজন দেখা দিতে পারে, কোনো কোনো সংস্থা, গোত্র বা দল কিংবা শ্রেণীকে ইসলামের সহায়তা করার দিকে উৎসাহী বানানো বা রাখার জন্যেও তা ব্যয় করার দরকার হতে পারে। ইসলামের প্রতিরক্ষার কাজে কোনো কোনো লেখনী বা মুখপাত্র নিয়োগের প্রয়োজন দেখা দিতে পারে এবং সেজন্যেও এই খাতটি ব্যবহৃত হতে পারে। ইসলামের বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচারণাকারীদের মুখ বন্ধ করার জন্যে এবং তাদের সমুচিত জবাব দেওয়ার জন্যেও তা লাগানো যেতে পারে।

যেমন, প্রতিবছর লোকেরা দলে দলে ইসলামে প্রবেশ করে, কিন্তু কোনো ইসলামী রাষ্ট্রের নিকট থেকে তারা কোনোরূপ সাহায্য-সহযোগিতা পায় না, তাদেরকে একবিন্দু উৎসাহিতও করা হয় না। তাদেরকে এই খাত থেকে সাহায্য দেওয়া একান্ত জরুরী হয়ে পড়ে। তা হলে তাদের কোমর শক্ত হবে, তারা

---

১. غاية المنتهى ج ٢ ص ١٤١، المجموع ج ٦ ص ١٩٦

www.amarboi.org

ইসলামে অবিচল হয়ে থাকবে। ইমাম জুহরী ও হাসান বসরী বর্ণিত, খ্রিস্টান মিশনারীরা এই ব্যবস্থা নিয়েছে যে, যে লোকই খৃস্ট ধর্ম গ্রহণ করবে তার যাবতীয় ব্যয়ভার বহন এবং বস্তুগত ও সাহিত্যিক সাংস্কৃতিক আনুকূল্য দেওয়ার দায়িত্ব তারাই গ্রহণ করে। এসব মিশনারী তাদের বিপুল পরিমাণ টাকা-পয়সা দিয়েও সাহায্য করে। এভাবে প্রতিবছর বহু সংখ্যক খ্রিস্টান মিশনারী প্রতিষ্ঠান সাহায্য দানের কাজ করে যাচ্ছে। দ্বীন ইসলামের ন্যায় তাদের মধ্যে যাকাতের মতো কোনো ব্যবস্থা নেই। আমাদের পক্ষেই এটা সম্ভব যে, আমরাই যাকাতের একটা বড় অংশ লোকেদের মন সন্তুষ্ট রাখা ও ইসলামের ওপর অবিচল রাখার জন্যে ব্যয় করতে পারি।

বস্তুত ইসলামে সুস্থ প্রকৃতি ও সুষ্ঠু বিবেক-বুদ্ধির সাথে সামঞ্জস্যসম্পন্ন সুস্পষ্ট ভাবধারা রয়েছে। তাই তা স্বতই দুনিয়ার বিভিন্ন দিকে প্রচারিত হয়ে পড়েছে। কিন্তু যারাই ইসলাম গ্রহণ করেছে তারা এমন কোনো বৈষয়িক সুযোগ-সুবিধা পায় না, যার ফলে তারা দ্বীন-ইসলামে গভীর অন্তদৃষ্টি ও পাণ্ডিত্য লাভ করতে পারে না। যার দরুন তারা এর হেদায়েতে সত্যিকারভাবে উপকৃত হতে পারছে না। তারা যে ত্যাগ স্বীকার করেছে, তার কিছুরও প্রতিবিধান করা হচ্ছে না কিংবা তার প্রতিপক্ষ বা অত্যাচারী রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে আসা কঠিন নির্যাতন সে ভোগ করতে বাধ্য হয়েছে, তা থেকে কিছুমাত্র নিষ্কৃতি দেওয়ার ব্যবস্থাও করা হচ্ছে না।

বিভিন্ন দেশে অবশ্য এমন বহু সংস্থা আছে, যেগুলো এই অসুবিধাসমূহ দূর করার জন্যে নিরন্তর চেষ্টা চালাচ্ছে; কিন্তু সেগুলো প্রয়োজন পরিমাণ সাহায্য-সহযোগিতা পাচ্ছে না। এটা খুবই দুঃখের কথা।

আফ্রিকা মহাদেশে ভয়াবহ ধর্মীয় ও রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ নিত্যকার ঘটনা-দুর্ঘটনা হয়ে রয়েছে। তথায় বিভিন্ন শক্তি, গোত্রপতি রাষ্ট্র-ক্ষমতা দখলের চেষ্টায় নিয়োজিত রয়েছে। একদিকে মিশনারী সাম্রাজ্যবাদ বা সাম্রাজ্যবাদী মিশনারীরা চেষ্টায় লেগে আছে, অপরদিক দিয়ে ইসরাইলী ইয়াহুদী সাম্রাজ্যবাদ সর্বাত্মক শক্তি এই উদ্দেশ্যে নিয়োজিত করে রেখেছে। আর তৃতীয় দিক দিয়ে মার্কসীয় কমিউনিস্ট সাম্রাজ্যবাদও ওঁৎ পেতে আছে। প্রত্যেকেই আফ্রিকা দখল করে স্বীয় রঙে রঙীন করে তোলার চেষ্টায় রত আছে।

এসব আক্রমণাত্মক পরিস্থিতি ও ঘটনাবলীর প্রেক্ষিতে ইসলাম নির্বাক, নিষ্ক্রিয় ও নিশ্চুপ হয়ে বসে থাকতে মুসলিম জাতিকে অনুমতি দেয় না। তাই এ সময় এমন একটি রাষ্ট্র থাকা একান্তই জরুরী, যা তার এই দায়িত্ব যথাযথ পালন করবে,

www.amarboi.org

দ্বীন-ইসলামের দাওয়াত প্রচার করবে এবং আল্লাহ্‌র জমিনে আল্লাহ্‌র দ্বীন কায়েম করবে।

ইসলাম একদিন 'আক্রমণাত্মক' বা সম্প্রসারণের ভূমিকায় ছিল। আর বর্তমানে তা প্রতিরক্ষার ভূমিকায় চলে গেছে। চারদিক থেকে তা আক্রমণের সম্মুখীন, তার নিজের ঘর রক্ষার কঠিন দায়িত্বেও ব্যতিব্যস্ত।

অতএব আজকের দিনেও লোকদের মনস্তুষ্টি সাধনের চেষ্টায় নিয়োজিত হওয়া অধিক কর্তব্য। সাইয়েদ রশীদ রিজা লিখেছেন– কাফেররা মুসলমানদের মনস্তুষ্টি সাধন করে তাদের স্বপক্ষে কিংবা তাদের ধর্মে শামিল করে নিয়ে যাচ্ছে। সমস্ত মুসলমানকে দাস বা গোলাম বানাবার চেষ্টায় রত আছে সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রসমূহ। সেই সাথে তাদের ধর্মের প্রতিরক্ষার কাজও তারা করে যাচ্ছে। সেই উদ্দেশ্যে তারা বিপুল সংখ্যক মুসলমানের মনস্তুষ্টি সাধনের কাজে অপরিমেয় ধনসম্পদ ও কলাকৌশল ব্যয় ও প্রয়োগ করে যাচ্ছে। কেউ কেউ মুসলমানদের ইসলামের সীমার মধ্য থেকে বহিষ্কৃত করে তাদের সাহায্যে লাগানোর উদ্দেশ্যে তাদের মনস্তুষ্টি সাধনের কাজ করে যাচ্ছে। তাদের সমর্থনে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে এই কাজ করছে অনেকগুলো সংস্থা। মুসলিমদের ঐক্য ও ইসলামী রাষ্ট্রসমূহ ধ্বংস করাই তাদের চরম লক্ষ্য। এরূপ অবস্থায় মুসলমানদের কি উচিত নয় তাদের সঠিক দায়িত্ব পালনে নেমে যাওয়া ?[১]

যাকাতের মাল ছাড়াও এ কাজ করা জায়েজ

উপরের এই দীর্ঘ আলোচনার পরও আমরা বলে রাখতে চাই যে, প্রয়োজনীয় মনস্তুষ্টি সাধনের এ কাজটি কেবলমাত্র যাকাত দ্বারাই করতে হবে, অন্য কোনো উপায়ে করা যাবে না, এমন কথাও নয়। বায়তুল মালের যাকাত সহ অন্যান্য আয় দ্বারাও এই কাজ করা যাবে। এজন্য একটা স্বতন্ত্র ফাণ্ডও গঠন করা যাবে। বেশি অভাবগ্রস্ত হয়ে পড়ে কিংবা তাদের সংখ্যা যদি অনেক বেশি হয়ে দাঁড়ায়, তাহলে তা করা ছাড়া উপায় থাকে না। ইমাম শাফেয়ী ও অন্যান্য ফিকাহবিদ এ মত দিয়েছেন। তার অর্থ জনকল্যাণমূলক ফাণ্ড দ্বারা 'মুয়াল্লাফাতু কুলুবুহুম' খাতে কাজ করা। আসলে আদর্শবাদী সুবিচারক রাষ্ট্রকর্তার অভিমতের ওপরই তা একান্তভাবে নির্ভর করে। পরিমাণটা উপদেষ্টা পরিষদের নির্ধারিতব্য। শু'রা সদস্যদের পরামর্শক্রমেই এ কাজটি সুষ্ঠুভাবে আঞ্জাম পেতে পারে।

---

১. تفسير المنار ج ١٠ ص ٥٧٤

www.amarboi.org

'ফির-রিকাব'– দাসমুক্তি

ফির-রিকাব'-এর তাৎপর্য

الرقاب। বহুবচনের শব্দ। একবচনে رقبة –কুরআনের পরিভাষায় তার অর্থ দাস বা দাসী। তা বলা হয় তাকে মুক্ত করার প্রচেষ্টাকালে। কুরআন মজীদ এই শব্দটি বলে পরোক্ষভাবে একথাই বোঝাতে চেয়েছে যে, মানুষের জন্যে দাসত্ব গলায় বাঁধা শৃংখলের মতো অথবা বলদের ঘাড়ে বাঁধা জোয়ালের মতো। আর দাসকে এই শৃংখল থেকে মুক্ত করা যেন গলায় বাঁধা রশি খুলে ফেলা। মানুষ যে জোয়ালের তলায় পড়ে থাকে, তা থেকে তা সরিয়ে দূর করে দেওয়া। যাকাত-ব্যয়ের ক্ষেত্র বলতে আল্লাহ্ বলেছেন ঃ وفى الرقاب তার অর্থ, মানুষের গলা মুক্তকরণের কাজে যাকাত ব্যয় করা হবে। আর এই কথা দাস বা দাসীকে দাসত্বের শৃংখল থেকে মুক্তকরণ বোঝাবার জন্যে যথেষ্ট। এ কাজটি দু'ভাবে হতে পারে ঃ

১. যে দাস বা দাসী মনিবের সাথে চুক্তি করেছে যে, সে তাকে এত টাকা দিয়ে দিলে সে তাকে মুক্ত করে দেবে, যাকাত দিয়ে তার এই চুক্তি পূরণে সাহায্য করা হবে। তাই এ টাকা দেওয়া হলেই সে তার ঘাড়কে মুক্ত করে নিতে পারল, সে স্বাধীনতা পেল।

আল্লাহ্ তা'আলা মুসলিম জনগণকে তাদের দাস-দাসীদের মধ্যে যারাই এরূপে বিনিময় দানের শর্তে চুক্তি করতে ইচ্ছুক, তাদের সাথে চুক্তিবদ্ধ হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। তারা নিজেদের জন্যে যা বাধ্যতামূলক বানিয়ে নিয়েছে তা পরিপূরণে পূর্ণাঙ্গ সাহায্য দান করতেও বলেছেন, যেন মালিক মনিবরা তাদের মুক্তিপথ সহজ করে দেয়, তাদের দেয় পরিমাণ হ্রাস করে। গোটা মুসলিম সমাজই যেন দাসত্ব-শৃংখল থেকে মুক্তি লাভের এই চেষ্টায় তাদের সাথে পূর্ণ সহযোগিতা করে। এ পর্যায়ে আল্লাহ্র কথা হচ্ছে ঃ

وَالَّذِيْنَ يَبْتَغُوْنَ الْكِتٰبَ مِمَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوْهُمْ اِنْ عَلِمْتُمْ فِيْهِمْ خَيْرًا ق وَّاٰتُوْهُمْ مِّنْ مَّالِ اللّٰهِ الَّذِىْٓ اٰتٰكُمْ ط

তোমাদের মালিকানাভুক্ত যেসব ক্রীতদাস বা দাসী চুক্তিবদ্ধ হতে ইচ্ছা করে, তোমরা তাদের সাথে লিখিতভাবে চুক্তিবদ্ধ হও যদি তোমরা তাদের মধ্যে কল্যাণ জানতে পারো.....এবং তাদেরকে আল্লাহ্র সেই মাল থেকে দাও যা তিনি তোমাদের দান করেছেন। (সূরা নূর ঃ ৩৩)

www.amarboi.org

অতঃপর যাকাতের একটা অংশ তাদের জন্য নির্ধারিত করে দিয়েছেন। চুক্তি অনুযায়ী অর্থ দিয়ে দাসত্বমুক্তির এই চেষ্টায় তাদের সাহায্য করা হবে। এটাই এই নির্ধারণের লক্ষ্য।

দাসত্ব মুক্তির এই পদ্ধতির পক্ষে মত প্রকাশ করেছেন ইমাম আবূ হানীফা, শাফেয়ী এবং তাঁদের সঙ্গিগণ। লাইস ইবনে সায়াদও এ মত সমর্থন করেছেন।

তাঁরা দলিল হিসেবে হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত হাদীস উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন, আল্লাহ্ তা'আলা وفى الرقاب বলে 'মুক্তির জন্য চুক্তিবদ্ধ ক্রীতদাস বা দাসী' বুঝিয়েছেন। আর তা আরও দৃঢ় হয়েছে আল্লাহ্র কথা শেষাংশ واتو هم من مال الله الذى اتاكم দিয়ে।[১] (এবং তাদের দাও আল্লাহ্র সেই মাল থেকে যা তিনি তোমাদের দিয়েছেন।)

২. ধনবান ব্যক্তি তার মালের যাকাত- সম্পদ দিয়ে একজন দাস বা দাসীকে ক্রয় করবে এবং পরে তাকে মুক্ত করে দেবে।

অথবা আরও কয়েকজন একত্রিত হয়ে এই ক্রয় ও মুক্তি দানের কাজ করবে। রাষ্ট্রকর্তাও সংগৃহীত যাকাতসম্পদ দিয়ে দাস বা দাসী ক্রয় করে মুক্ত করে দেবে- এটাও সম্ভব। ইমাম মালিকের এই মতটি প্রখ্যাত। ইমাম আহমাদ ও ইসহাক এ মতই প্রকাশ করেছেন। ইবনুল আরাবী বলেছেন ঃ বস্তুত এটাই যথার্থ ও সঠিক পদ্ধতি। তার সমর্থনে তিনি কুরআনের বাহ্যিক বাচন-ভঙ্গীকেই দলিল হিসেবে তুলে ধরেছেন। কেননা আল্লাহ্ তাঁর কিতাবে যে দাসত্বের উল্লেখ করেছেন, তার লক্ষ্য হচ্ছে মুক্তিদান। যদি চুক্তিবদ্ধ দাসদাসীর সাহায্যই লক্ষ্য হতো, তাহলে তিনি তাদের এই বিশেষ নাম সহকারেই উল্লেখ করতেন। তা না বলে যখন الرقبة বলেছেন, তখন বোঝা গেল, তিনি মুক্তিদানই বোঝাতে চেয়েছেন। আর তাৎপর্যগত কথা হচ্ছে, চুক্তিবদ্ধ লোকেরা আসলে ঋণগ্রস্ত লোকদের গোষ্ঠীর মধ্যে শামিল হয়ে গেছে। এখন তাদের ওপর এটা একটা ঋণ বিশেষ। কাজেই তারা فى الرقاب পর্যায়ে গণ্য হবে না। আর সাধারণভাবে চুক্তিবদ্ধ দাস-দাসীও এর মধ্যে গণ্য ধরা হয় বটে। কিন্তু চূড়ান্ত পর্যায়ে তাদের মুক্তই করা হবে।[২]

আসলে সত্য কথা হচ্ছে, চুক্তিবদ্ধ দাস-দাসীর সাহায্যকরণ ও ক্রয় করে দাস মুক্তকরণ- উভয় কাজই আয়াতটির অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

ইবরাহীম নখয়ী ও সায়ীদ ইবনে জুবাইর তাবেয়ী ফিকাহ্‌বিদ থেকে বর্ণিত,

---

১. التفسير الكبير للفخر الرازى ج ١٦ص ١١٢ الهد اية وفتح القدير ج ٢ ص١٧

২. احكام القران ج ٢ ص ٩٥٥

www.amarboi.org

তাঁরা দু'জনই যাকাতের টাকা দিয়ে দাস ক্রয় করে মুক্তকরণ অপছন্দ করতেন। কেননা তাতে যাকাতদাতার ব্যক্তিগত স্বার্থ জড়িত থাকে। তা হচ্ছে ইসলামের বিধান অনুযায়ী মুক্তকারীর নিকট দাসের এক ধরনের সম্পর্ক যুক্ত থাকা এবং মুক্তকারীর কোনো উত্তরাধিকারী না থাকলে 'মুক্ত দাস' مـولـى তার উত্তরাধিকারী হতে পারে– এই সুবিধা। এ দৃষ্টিতেই ইমাম মালিক থেকে বর্ণিত হয়েছে, যে লোক তার মালের যাকাত দিয়ে দাস মুক্ত করবে, তার মুক্তকরণ সম্পর্ক ও উত্তরাধিকার সমস্ত মুসলিম জনগণের জন্যে হবে অর্থাৎ বায়তুলমালের সম্পদ হবে।[১]

কিন্তু আবূ উবাইদ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন, কোনো মুসলিম তার মালের যাকাত দিয়ে কোনো দাসকে মুক্ত করবে– তাতে তিনি কোনো দোষ দেখতে পান নি। নখয়ীও ইবনে জুবাইরের মত উদ্ধৃত করার পর বলেছেন ঃ এ পর্যায়ে আমাদের নিকট এ পর্যন্ত যত মতই পৌঁছেছে, তন্মধ্যে ইবনে আব্বাসের মতই সর্বোত্তম। তিনি খুব বেশি অনুসরণীয়, কুরআনের তাৎপর্য ব্যাখ্যা ও মর্মোদ্ধারের কাজেও তিনি অধিক পারদর্শী। হাসান বসরীও এ ব্যাপারে তাঁর সাথে ঐকমত্য প্রকাশ করেছেন। অধিক সংখ্যক বিশেষজ্ঞও এ মতেই রয়েছেন।[২]

তিনি আরও বলেছেন, এ মতটি আরও বলিষ্ঠতা পায় এ দিক দিয়ে যে, মুক্তকারীর যদি ভয় থাকে যে, তার মীরাস মুক্তকরণ সম্পর্কের দরুন.الـولا। মুক্ত দাসই পেয়ে যাবে, তাহলে তার এ-ও ভয় থাকতে পারে যে, সে এমন কোনো ফৌজদারী অপরাধ করে বসবে যার রক্তমূল্য বা ক্ষতিপূরণ দেওয়া তার বা তার গোত্রের লোকদের জন্যে কর্তব্য হয়ে পড়বে। আর তাহলে তারা দু'জন পারস্পরিক সম্পর্কিত হয়ে গেল।[৩]

এসব কথাই সে অবস্থায় প্রযোজ্য, যখন যাকাত বণ্টনের কাজ ব্যক্তিগতভাবে বা সম্পদ মালিকের প্রতিনিধির মাধ্যমে সম্পন্ন হবে। কিন্তু এ কাজ যদি মুসলিম শাসক বা ইসলামী সরকার কর্তৃক সম্পন্ন হয়– যাকাতের মৌল ব্যবস্থাপনাই তাই– তাহলে আর এ সব মতপার্থক্যের কোনো কারণ থাকবে না। অতএব এক ব্যক্তি তার মালের যাকাতে যতটা কুলায় দাস ক্রয় করে মুক্ত করতে পারে যাকাত ব্যয়ের অপরাপর ক্ষেত্রকে লংঘন করা ছাড়াই। (ইমাম শাফেয়ী অবশ্য যাকাত পাওয়ার যোগ্য আট প্রকারের লোকদের মধ্যে সমান পরিমাণে বণ্টন করা ওয়াজিব মনে করেন। তা হলে আট ভাগের এক ভাগে নেহায়েত কম পড়বে না।) উত্তম ব্যবস্থা হচ্ছে, রাষ্ট্রকর্তা দুটি ব্যাপারকে একত্রিত করবে। চুক্তিবদ্ধ

---

১. الاموال ص ٦٠٨ - ٦٠٩

২. الا موال ص ٦٠٨ - ٦٠٩

৩. الا موال ص ٦٠٨ - ٦٠٩

www.amarboi.org

দাসদের সাহায্য করবে এবং দাস-দাসী ক্রয় করেও মুক্ত করবে। ইমাম জুহরী খলীফা উমর ইবনে আবদুল আজীজকে তা-ই লিখেছিলেন। তাতে তিনি বলেছিলেন, 'দাস মুক্তকরণের অংশটি দুই ভাগে বিভক্ত হবে, অর্ধেক ব্যয়িত হবে মুসলিম চুক্তিকারী দাসদের সাহায্যার্থে। আর অপর অর্ধেক দিয়ে ইসলাম গ্রহণকারী ও নামায-রোযা পালনকারী দাসদের ক্রয় করে মুক্ত করার কাজে। তা হলে এই উভয় প্রকারের দাস-দাসীই যাকাতের সাহায্যে মুক্তি লাভ করবে।[১]

কিন্তু কোনো ইসলামী রাষ্ট্রকর্তা অর্ধেক বা অপর কোনো হার মেনে চলতে বাধ্য এ কথা আমরা মনে করি না। সে যেভাবেই ভালো মনে করবে সেভাবেই তা করতে পারবে। অবশ্য পরামর্শদাতাদের নিকট থেকে উপদেশ গ্রহণ করবে ইসলামের পরামর্শ গ্রহণ নীতি অনুযায়ী।

মুসলিম বন্দীকে দাসমুক্তির অংশ দিয়ে মুক্ত করা যাবে

কুরআনের ব্যবহৃত শব্দ في الرقاب। কেবলমাত্র ক্রীতদাসকেই বোঝায়। এক্ষণে প্রশ্ন হচ্ছে, এ শব্দটির সাধারণ প্রয়োগে মুসলিম বন্দীদেরকে শামিল করা ও তাদের মুক্তির জন্যে এই অংশের যাকাত ব্যয় করা যাবে কিনা..... যাদের ওপর কাফের শত্রুরা ঠিক সেভাবেই প্রভুত্ব করে যেমন করে মনিব-মালিক তার ক্রীতদাসের ওপর ? আসলে এই মুসলিম বন্দীরা ঠিক ক্রীতদাসদের মর্মান্তিক অবস্থার মধ্যেই নিপতিত হয়ে থাকে।

ইমাম আহমাদের মতের বর্ণনানুযায়ী তা করা সম্পূর্ণ জায়েজ। মুসলিম বন্দীকে যাকাতের টাকা দিয়ে মুক্ত করা অবশ্যই শরীয়তসম্মত কাজ হবে। কেননা তাতেও তো 'ঘাড়'কে বন্দীদশা থেকে মুক্তই করা হয়।[২]

কাযী ইবনুল আরাবী মালিকী বলেছেন, যাকাতের টাকা দিয়ে বন্দী মুক্তকরণ পর্যায়ে আলিমগণের বিভিন্ন মত রয়েছে। আতবাগ বলেছেন, তা জায়েজ হবে না। ইবনে হুবাইব বলেছেন, অবশ্যই জায়েজ হবে। মুসলিম দাসকে যখন একজন মুসলমানের নিকট থেকেই যাকাতের অর্থ দিয়ে মুক্ত করা ইবাদতের পর্যায়ের কাজ এবং জায়েজ, তখন মুসলিম বন্দীকে কাফিরের দাসত্ব শৃংখল ও লাঞ্ছনা থেকে মুক্ত করার কাজে যাকাতের অর্থ ব্যয় করা অধিক উত্তম কাজ বলে বিবেচিত হওয়া বাঞ্ছানীয়।[৩] দাসপ্রথা পরিত্যক্ত হয়েছে বটে কিন্তু যুদ্ধ বিগ্রহ তো

---

১. الاموال ٦٠٩

২. الروض المربع ج ١ص ٤٠٢

৩. احكام القران ج ٢ ص ٩٥٦

www.amarboi.org

চিরকালের জন্যেই লেগে আছে, সত্য ও মিথ্যার মধ্যকার দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষ কোনো দিনই সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে যাবে না এবং তাতে বহু মুসলমান কাফের শক্তির হাতে বন্দীও হতে পারে। কাজেই মুসলমান বন্দীকে যাকাতের এ অংশ থেকে বিনিময় মূল্য দিয়ে অবশ্যই মুক্ত করতে হবে উদার হস্তে ও প্রশস্তভাবে।

সাম্রাজ্যবাদী শক্তির অধীন জাতিসমূহকে কি যাকাত দিয়ে সাহায্য করা যাবে

সাইয়েদ রশীদ রিজা তাঁর তাফসীর 'আল-মানার'-এ লিখেছেন, 'ফির-রিকাব' বলে যাকাতের যে ব্যয়-খাতটি নির্দিষ্ট কড়া হয়েছে, তাকে পরাধীন গোত্র ও জাতিসমূহকে মুক্তকরণের কাজে ব্যবহার করা যাবে– যখন ব্যক্তিদের মুক্তকরণে তা ব্যয় করা হবে না।[১] প্রধান শিক্ষাপবদ শায়খ মাহ্মুদ শালতুত তাগিদ করে বলেছেন, ব্যক্তি দাসের মুক্তিকরণের সুযোগ যখন নিঃশেষ হয়ে গেছে– আমি যা মনে করি– এ ব্যয়ের ক্ষেত্রটি নতুনভাবে নির্ধারিত হয়েছে জাতি ও গোত্রসমূহকে সাম্রাজ্যবাদীদের অধীনতাপাশ থেকে মুক্তির সংগ্রামে সাহায্যকরণ। কেননা এই অবস্থাটি মানবতার পক্ষে অধিকতর কঠিন, দুঃসহ ও বিপজ্জনক। এক্ষেত্রে মানুষ দাস হয় চিন্তা-বিশ্বাস, ধন-মাল ও রাজনৈতিক কর্তৃত্বে। তাদের গোটা দেশের স্বাধীনতা বলতে কিছুই থাকে না। আগের কালে ব্যক্তিকেন্দ্রিক দাসত্বের প্রথা চালু ছিল। সে ব্যক্তির মৃত্যুতে দাসত্বেরও মৃত্যু ঘটত। তাদের রাষ্ট্র থাকত স্বাধীন সার্বভৌম, তখন তার কর্তৃত্ব ও যোগ্যতা ততটাই থাকত যতটা দুনিয়ার অন্যান্য স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের থাকত। কিন্তু এখনকার দাসত্ব হচ্ছে গোটা জাতির। জাতির জন্মই হয় দাসত্বের অবস্থায় তাদের বাপ-দাদার মতোই। এই দাসত্ব সাধারণ ও স্থায়ী। একটি অন্ধ জুলুমকারী শক্তি তাদের দাসত্ব শৃংখলে বন্দী করে নেয় ও রাখে। এই দাসত্বের মুকাবিলা– প্রতিরোধ এবং তা থেকে মুক্তিলাভের জন্যে চেষ্টা ও সংগ্রাম করা ও লাঞ্ছনা-গঞ্জনা তাদের ওপর থেকে অপসারণ করার জন্যে যাকাতের এ অংশ ব্যয় করা অধিকতর বাঞ্ছনীয়। তা কেবল যাকাত সাদকার দ্বারাই নয়, সমস্ত ধন-মাল ও প্রাণ দিয়েই তা করতে হবে।

এ থেকে আমরা এ-ও বুঝতে পারি, এ পর্যায়ের ইসলামী জাতিসমূহকে পরাধীনতার শৃংখল থেকে মুক্ত করার ব্যাপারে দুনিয়ার ধনী মুসলিমদের বিরাট দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে।[২]

সাইয়্যেদ রশীদ রিজা ও মাহ্মুদ শালতুত এই যা কিছু বলেছেন, তা বলেছেন الـــرقـــاب। শব্দের ব্যাপক তাৎপর্য স্বরূপ। তাতে ব্যক্তি ক্রীতদাসের পর্যায়ে এসে

---

১. تفسير المنار ج ١٠ ص ٥٩٨

২. الاسلام عقيدة وشريعة ص٤٤٦

www.amarboi.org

গেছে জাতি বা গোত্র ক্রীতদাস। মূলের দিক দিয়ে উভয়ের মধ্যে কোনোই পার্থক্য নেই।

তবে আমার কথা হচ্ছে, যে বাক্য বা শব্দের তাৎপর্যে এ ব্যাপকতা নেই, তাতে কৃত্রিমভাবে ব্যাপকতা নিয়ে আসার কোনো প্রয়োজনই আমাদের নেই। আমরা তো সাম্রাজ্যবাদী শক্তির গোলামী থেকে মুক্তি লাভের সংগ্রামে আর্থিক সাহায্য দানের ব্যবস্থা যাকাতের বণ্টন ক্ষেত্রেই দেখতে পাচ্ছি– তা হচ্ছে سبيل الله -এর অংশ। যদিও রাষ্ট্রের অপরাপর আয়ও এ কাজে ব্যয় হতে পারে। বরং এজন্যে সমস্ত মুসলিম জনতা ও রাষ্ট্রের প্রধানগণ এগিয়ে আসা একান্তভাবেই কর্তব্য।

‘আল গারেমূন’– ঋণগ্রস্ত লোকগণ

কুরআনের আয়াত অনুযায়ী যাকাতের ষষ্ঠ ব্যয়-ক্ষেত্র হচ্ছে, আল-গারেমূন–ঋণগ্রস্ত লোকগণ। কিন্তু ‘গারেমূন’ বলতে কোন সব লোক বোঝায়?

‘গারেমূন’ কারা

‘গারেমূন’ বহুবচনের শব্দ। একবচনে ‘গারেম’ غارم ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিকে ‘গারেম’ বলা হয়।[১] তবে ‘গরীম’ বলা হয় ঋণ গ্রহীতাকে, যদিও ঋণদাতাকে বোঝাবার জন্যেও এই শব্দটির ব্যবহার হয়ে থাকে। আর غارم শব্দের আসল অর্থ অপরিহার্যতা, লেগে যাওয়া। জাহান্নাম সম্পর্কে আল্লাহ্‌র কথা إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا –‘নিশ্চয়ই জাহান্নামের আযাব অবশ্যম্ভাবী’! এ থেকেই ‘গারেম’ নাম দেওয়া হয়েছে। কেননা ঋণ তার ওপর চেপে বসেছে, অপরিহার্য হয়ে দাঁড়িয়েছে (তা ফিরিয়ে দেওয়া)। আর ‘গরীম’ বলা হয় এজন্যে যে, ঋণদাতার সাথে তার ঋণের অবিচ্ছিন্ন সম্পর্ক স্থাপিত হয়ে গেছে।

---

১. ইবনুল হুমাম উল্লেখ করেছেন, ‘গারেমূন’ হচ্ছে সেই লোক যার ওপর ঋণ চেপেছে অথবা লোকদের নিকট যার পাওনা রয়েছে, কিন্তু তা আদায় করতে পারছে না, তাকেও ‘গারেম’ বলার প্রচলন আছে। এই লোকের নিসাব পরিমাণ সম্পদ নেই বলে তার ওপর যাকাত ফরয হয় না। কিন্তু এই কথাটিতে আপত্তি আছে। কেননা আভিধানিকভাবে ‘গারেম’ কেবল তাকেই বলা হয়, যার ওপর ঋণ চেপেছে। সম্ভবত ‘গারেম’ ও ‘গরীম’-একই ধরনের দুটি শব্দে তার বিভ্রান্তি ঘটেছে। কেননা ‘গরীম’ বলতে ঋণদাতা ও ঋণগ্রহীতা উভয়কেই বোঝায়। মানুষ তো, ভুলের উর্ধ্বে কেবলমাত্র আল্লাহ। তবে الفتح গ্রন্থে যে রূপটির উল্লেখ হয়েছে, তা সেই ব্যক্তিকে বোঝায় যার পাওনা রয়েছে লোকদের নিকট......... তাকেও যাকাত দেওয়া জায়েজ। কেননা সে কার্যত ফকীর–নিঃস্ব পথিক। সে ঋণগ্রস্ত বলে নয়। দেখুন ঃ حاشيه ردالمحتار ج ٢ ص ٦٣

www.amarboi.org

ইমাম আবূ হানীফার মতে غـــــارم হচ্ছে 'ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি।'– যার ওপর ঋণ চেপেছে, ঋণ পরিমাণ সম্পদের অতিরিক্ত নিসাব পরিমাণ সম্পদের সে মালিক নয়।[১] (তাই সে যাকাত পেতে পারে।) ইমাম মালিক, শাফেয়ী ও আহমদের মতে, 'গারেমূন' দুই শ্রেণীর লোক। এক শ্রেণীর লোক তারা, যারা নিজেদের প্রয়োজন পূরণের জন্যে ঋণ গ্রহণ করেছে। আর দ্বিতীয় শ্রেণীর লোক হচ্ছে সমাজ সমষ্টির কল্যাণে ঋণ গ্রহণকারী। এই উভয় শ্রেণীর লোকদের জন্যে আলাদা-আলাদা আইন-বিধান রয়েছে।

নিজের প্রয়োজনে ঋণ গ্রহণকারী লোক

প্রথম শ্রেণীতে রয়েছে সেসব লোক যারা নিজেদের প্রয়োজন পূরণ ও কল্যাণ সাধনের জন্যে অর্থ ঋণ করে থাকে। ঘরের প্রয়োজন, কাপড়-চোপড় খরিদ, বিবাহ অনুষ্ঠান, কিংবা রোগের চিকিৎসা, ঘর-বাড়ি নির্মাণ, ঘরের প্রয়োজনীয় দ্রব্য-সামাগ্রী বা সাজ-সরঞ্জাম ক্রয়, কিংবা সন্তানের বিবাহ দান প্রভৃতি কাজে অথবা ভুলবশত অপরের কোনো জিনিস নষ্ট করে দেওয়া ইত্যাদি কারণে ঋণ করেছে। তাফসীর লেখক ইমাম তাবারী আবূ জাফর কাতাদাহ প্রমুখ থেকে বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন ঃ 'গারেম'– ঋণকারী অপচয়কারী নয়– রাষ্ট্রপ্রধানের উচিত তার এই ঋণটা বায়তুলমাল থেকে পরিশোধ করে দেওয়া।[২]

আকস্মিক বিপদগ্রস্তরা এই পর্যায়ে গণ্য

এ গুণটির বাস্তবতা লক্ষ্য করা যায় সেসব লোকের মধ্যে যারা আকস্মিকভাবে জীবনের কঠিনতম বিপদে নিপতিত হয়েছে। তারা এমন সব আঘাত পেয়ে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেছে যে, তাদের ধন-মাল সবই নিঃশেষে শোষিত হয়েছে। তখন তারা প্রয়োজনবশতই নিজেদের ও পরিবারবর্গের জন্যে ঋণ গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছে। মুজাহিদ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, তিনজন লোক 'ঋণগ্রস্ত' 'গারেম'রূপে গণ্যঃ একজন, যার ধন-মাল ফসল-ফল বন্যায় ভেসে গেছে। দ্বিতীয় জন যার সব কিছু জ্বলে পুড়ে ভস্ম হয়ে গেছে আর তৃতীয়, যার বহু সন্তান ও পরিজন, কিন্তু তার ধন-মাল বলতে কিছুই নেই। সে ঋণ নিয়ে পরিবারবর্গের জন্যে ব্যয় করতে বাধ্য হয়।[৩]

কুবাইচাতা ইবনুল মাখারিকের– আহমাদ ও মুসলিম উদ্ধৃত হাদীস– এ বলা হয়েছে, যে লোক বিপদগ্রস্ত হয়ে সব ধন-মাল খুইয়েছে, রাষ্ট্র-সরকারের নিকট

---

১. البحر الرائق ج ٢ص ٢٦٠

২. تفسير الطبرى، بتحقيق محمود شاكر ج ١٤ ص ٣٣٧

৩. مصنف ابن ابى شيبة ج ٣ ص ٢٠٧ ط حيدراباد، وانظر الطبرى السابق

www.amarboi.org

যাকাত ফাণ্ড থেকে তার হক্ পাওয়ার জন্যে দাবি করা সম্পূর্ণ জায়েজ ও মুবাহ, যেন সে জীবনযাত্রা নির্বাহের প্রয়োজন পরিমাণ লাভ করতে পারে। ('গারেমীন' সম্পর্কিত দ্বিতীয় পর্যায়ের আলোচনায় আমরা এ প্রসঙ্গ সম্পূর্ণভাবে উল্লেখ করব।)

এভাবে যাতে বিপদ মুকাবিলার লক্ষ্যে সামষ্টিক নিরাপত্তা দানের (Social security) দায়িত্ব পালন করে। আকস্মিকভাবে বিপদে পড়া লোকেরা নিজেদের জীবন-জীবিকার নিরাপত্তা লাভ করতে পারে যাকাত ব্যবস্থার দরুন। বিশ্ব-সমাজ এর পূর্বে এ ধরনের সামাজিক নিরাপত্তার সাথে কিছুমাত্র পরিচিত ছিল না। জীবনবীমা ব্যবস্থার প্রচলন নিতান্তই এ কালের ব্যাপার।

তবে ইসলাম যাকাত ব্যবস্থার মাধ্যমে তার লোকদের জন্যে যে নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে, তা অধিকতর উন্নত, পূর্ণাঙ্গ ও কার্যকর– জীবন বীমার তুলনায়। পাশ্চাত্য জগত আধুনিককালে পর্যায়ক্রমে এই বীমার ব্যবস্থা খাড়া করেছে বটে, কিন্তু পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে তা থেকে উপকৃত হতে পারে কেবলমাত্র সেসব লোক, যারা কার্যত তার পলিসি ক্রয় করে নির্দিষ্ট পরিমাণে বীমা কোম্পানীর কিস্তি আদায় করতে সমর্থ হয়। আর বিনিময় দেওয়ার সময় বিপদগ্রস্ত ব্যক্তিকে ঠিক ততটা পরিমাণই দেবে, যার সে বীমা করেছে। কিন্তু যে পরিমাণ ক্ষতি সাধিত হয়েছে বা যা তার প্রয়োজন, সে পরিমাণ অর্থ তাকে কখনও দেবে না। ফলে যে লোক বিরাট পরিমাণ টাকার বীমা ক্রয় করেছে, বড় বড় কিস্তি দিয়েছে, সে বড় পরিমাণ বিনিময় লাভ করবে। পক্ষান্তরে যে লোক সামান্য পরিমাণের পলিসি করেছে, সে সেই দৃষ্টিতে সামান্য পরিমাণই পাবে– তার বিপদটা যত বড় এবং প্রয়োজন যত বেশিই হোক না কেন। আর কম আয়ের লোকেরা যে খুব সামান্য পরিমাণেরই বীমা পলিসি করতে পারে, তা তো জানা কথাই। এরূপ অবস্থায় তার বিপদ যত বড়ই হোক, প্রাপ্য হবে খুবই কিঞ্চিৎ। তার কারণ হচ্ছে, পাশ্চাত্য বীমা ব্যবস্থার ভিত্তি হচ্ছে ব্যবসায়িক এবং বীমাকারী লোকদের দেওয়া টাকার মধ্য দিয়ে মালিক পক্ষের বিপুল পরিমাণে মুনাফা কামাই করে নেওয়ার নীতির ওপর সংস্থাপিত।

কিন্তু ইসলামী সামজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা পূর্বে প্রদত্ত কিস্তির শর্তের ওপর স্থাপিত নয়। বিপদগ্রস্ত ব্যক্তিকে সেখানে দেওয়া হবে তার প্রয়োজন পরিমাণ, ক্ষতির পরিমাণ অনুপাতে, যেন তার অসুবিধাটা দূর হয়ে যায়।

ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ঋণ গ্রহীতাকে কত দেওয়া হবে

ব্যক্তিগত প্রয়োজনে যে লোক ঋণ গ্রহণ করেছে, তাকে তার প্রয়োজন পরিমাণ দিতে হবে। আর এখনকার প্রয়োজন হচ্ছে তার ঋণ শোধ করা। তাকে যদি

www.amarboi.org

সামান্য পরিমাণ দেওয়া হয়, তাহলে সে ঋণ শোধ করা সম্ভব হবে না তার দ্বারা। বরং তখন ঋণদাতা তাকে হয় ক্ষমা করে দেবে, কিংবা তার পক্ষ থেকে অন্যরা তা দিয়ে দেবে কিংবা সে যাকাত ছাড়া অন্য মাল দ্বারা শোধ করবে, যথার্থ কাজ হবে তার নিকট থেকে তা ফিরিয়ে নেয়া হলে। কেননা তার তো সে পরিমাণের প্রয়োজন নেই।[১] ঋণের পরিমাণ কম হোক কি বেশি, তা শোধ করাই কাম্য এবং তাকে এই দায়িত্বের ঝুঁকি থেকে নিষ্কৃতি দানই আসল লক্ষ্য।

মৃতের ঋণ শোধে যাকাত ব্যবহার

এখানে একটি প্রশ্ন রয়ে গেছে, তা হচ্ছে, যাকাত দ্বারা যেমন জীবিত ব্যক্তির ঋণ শোধ করা যায়, তেমনি মৃত ব্যক্তির ঋণও কি শোধ করা যাবে ? ইমাম নববী এ পর্যায়ে শাফেয়ী মাযহাবের দুটি মতের উল্লেখ করেছেন। একটি হচ্ছে, তা জায়েজ নয়। বলা হয়েছে, সাইমারী, নখরী, আবূ হানীফা ও আহমাদ এই মতই পোষণ করতেন।

আর দ্বিতীয়, তা করা জায়েজ। কেননা আয়াতে সাধারণভাবেই ঋণগ্রস্তের কথা বলা হয়েছে। অতএব মৃতকে জীবিতের ন্যায় মনে করেই তার ঋণও শোধ করা যাবে। আবূ সওর এ মতই দিয়েছেন।[২]

অনুরূপভাবে ইমাম আহমাদ থেকে বর্ণিত হয়েছে, মৃতের ঋণ শোধে যাকাতের টাকা দেওয়া জায়েজ নয়। কেননা এ অবস্থায় ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি মৃত। তাকে তো দেওয়ার উপায় নেই। আর যদি ঋণদাতাকে দেওয়া হয়, তাহলে তা দেওয়া হবে ঋণদাতাকে, ঋণগ্রস্তকে নয়।[৩]

দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, মৃতুর ঋণ শোধে যাকাত দেওয়া জায়েজ। কেননা আয়াত সাধারণ অর্থবোধক। তা সর্ব প্রকারের ও সর্বাবস্থার ঋণগ্রস্ত পরিব্যাপ্ত; সে জীবিত হোক, কি মৃত। তাছাড়া মৃত ব্যক্তির ঋণ শোধ দিয়ে তার প্রতি একটা বদান্যতা দেখানোও সম্ভব এবং এটা সঠিক কাজ। মালিক ও আবূ সওরও এই কথা বলেছেন।[৪]

খলীলের মূল রচনার ওপর টীকা লিখতে গিয়ে খরশী বলেছেন ঃ ঋণগ্রস্তের ক্ষেত্রে জীবিত ও মৃতের মধ্যে কোনো পার্থক্য করা যাবে না। রাষ্ট্রকর্তা যাকাত ফাণ্ড থেকে নিয়ে মৃতের ঋণ শোধ করে দেবে। বরং অন্যরা বলেছেন, মৃতের ঋণ বাবদ

---

১. المجموع ج ٦ ص ٢٠٩
২. المجموع للنووى ج ٦ ص ٢١١
৩. المغنى ج ٢ ص ٦٦٧
৪. দেখুন المجموع ج ٦ ص ٢١١

www.amarboi.org

যাকাত প্রদান জীবিতের ঋণের তুলনায় অনেক বেশি গুরুত্বসম্পন্ন যেহেতু তার ঋণ শোধ হওয়ার আর কোনো আশা নেই। কিন্তু জীবিতের ঋণ সে রকম নয়।[১]

ইমাম কুরতুবী লিখেছেন,[২] আমাদের আলিম ও অন্যরা বলেছেন, যাকাতের অর্থ দিয়ে মৃতের ঋণ শোধ করা যাবে। কেননা সেও 'গারেমীন' 'ঋণগ্রস্ত' লোকদের মধ্যে গণ্য। নবী করীম (স) বলেছেন ঃ

اَنَا اَوْلٰى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلَا هْلِه وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا اَوْضَيَاعًا فَالَىَّ وَعَلَىَّ -

প্রত্যেক মুমিন ব্যক্তির জন্যে আমি তার নিজের থেকে অধিক আপন। যে লোক ধন-মাল রেখে যাবে তা তার উত্তরাধিকারীরা পাবে। আর যে লোক ঋণ অথবা (বলেছেন) অসহায় সন্তানাদি রেখে যাবে তা আমার ওপর ন্যস্ত হবে।[৩]

ফী-সাবীলিল্লাহ্– আল্লাহ্র পথে

কুরআন মজীদ সপ্তম পর্যায়ে যাকাত ব্যয়ের ক্ষেত্র বা খাত হিসাবে উল্লেখ করেছে وَفِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ এবং আল্লাহ্র পথে .....। এই খাতটির প্রকৃত লক্ষ্য কি ? আয়াতে কোন সব লোকদের সাহায্যের জন্যে বলা হয়েছে ?

বাক্যটির প্রকৃত আভিধানিক অর্থ সুস্পষ্ট। 'সাবীল' অর্থ পথ। আর 'সাবীলিল্লাহ্' অর্থ আকীদা-বিশ্বাস ও কাজের দিক দিয়ে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেয় যে পথ, তা।

'আল্লামা ইবনুল আসীর বলেছেন ঃ 'সাবীল' অর্থ পথ। আর সাবীলিল্লাহ্ সাধারণ অর্থবোধক এমন যে-কোনো কার্যক্রমই বোঝায়, যা খালেস নিয়তে করা হবে আল্লাহ্র নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে, তা করা যাবে ফরয, নফল ও বিভিন্ন ধরনের ইবাদত-বন্দেগী ও আল্লাহ্র সন্তুষ্টিমূলক কাজ-কর্মের মাধ্যমে, আর এই কথাটি যখন বাস্তবে প্রয়োগ করা হবে, তখন প্রধানত তা ব্যবহৃত হবে 'জিহাদ' অর্থে। ব্যাপক ও বেশি বেশি ব্যবহারের দরুন এক্ষণে যেন 'ফী-সাবীলিল্লাহ' বলতে এই জিহাদকেই বোঝাচ্ছে। মনে হচ্ছে এই বাক্যটির যেন এ ছাড়া অন্য কোনো অর্থই নেই।[৪]

---

১. দেখুন شرح الخرشى وحاشية العدوى عليه ج ٢ ص ٢١٨

২. تفسير القرطبى ج ٨ ص ١٨٥

৩. হাদীসের শব্দ الضياع বলতে ছোট ছোট শিশু সন্তান বোঝানো হয়েছে, যারা দারিদ্র্যের চাপে অসহায় বলে ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। হাদীসটি বুখারী মুসলিম উদ্ধৃত।

৪. النهاية لابن الاثير ج ٢ ص ١٥٦

www.amarboi.org

ইবনুল আসীর কর্তৃক 'ফী-সাবীলিল্লাহ্' বাক্যের উপরিউক্ত তাফসীর থেকে আমাদের সম্মুখে নিম্নোদ্ধৃত কথাগুলো স্পষ্ট হয়ে উঠেছে ঃ

১. বাক্যটির আসল আভিধানিক অর্থ ঃ এমন সব খালেস আমল যা আল্লাহ্র নৈকট্য লাভ করিয়ে দেয়। সর্বপ্রকারের নেক আমলই এর অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। তা ব্যক্তিগত পর্যায়ের হোক, কি সামষ্টিক।

২. বাক্যটির অর্থ সাধারণভাবে ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে যা মনে করা হয়, তা হচ্ছে জিহাদ। এই অর্থে খুব বেশি ব্যবহারের দরুন কেবল এটার মধ্যেই সীমিত হয়ে গেছে বাক্যটির সমস্ত তাৎপর্য।

উপরিউক্ত দুটি অর্থের দ্বন্দ্বে যাকাত ব্যয়ের এ খাতটির সঠিক তাৎপর্য নির্ধারণে ফিকাহ্বিদদের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর এই কারণেই এই দ্বিতীয় অর্থটি 'সাবীলিল্লাহ্'-এর তাৎপর্যের অন্তর্ভুক্ত ধরে নেওয়া হয়েছে ফিকাহবিদদের ঐকমত্যের ভিত্তিতে।

কিন্তু অন্য একটি ব্যাপারে আলিমগণের মধ্যে মতভেদের সৃষ্টি হয়েছে। তা হচ্ছে, 'ফী-সাবীলিল্লাহ্' -এর অর্থ কি শুধু জিহাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ– যেমন ব্যবহারিকতায় সাধারণভাবেই তা বোঝা যায় অথবা তা অগ্রসর হয়ে তার আসল আভিধানিক অর্থটিকেও শামিল করে নেবে ?.... তখন তা কেবল জিহাদের সীমার কাছে এসে থেমে যাবে না, এবং সর্বপ্রকারের কল্যাণময় নেকের কাজই শামিল হবে, কোনো একটিও এর বাইরে পড়ে থাকবে না।

কুরআনে 'সাবীলিল্লাহ্'

কুরআন মজীদের 'ফি-সাবীলিল্লাহ্' শব্দটি অনেক কয়টি স্থানে উল্লিখিত হয়েছে। দুভাবে এই শব্দের উল্লেখ রয়েছে ঃ

১. কখনও কখনও 'সাবীলিল্লাহ্' পূর্বে 'ফি-সাবীলিল্লাহ্' অক্ষরটি ব্যবহৃত হয়েছে, যেমন আলোচ্য যাকাতের খাত সংক্রান্ত আয়াতে রয়েছে এবং এটাই অধিক মাত্রায় ব্যবহৃত। কখনও তার পূর্বে عـن রয়েছে। এরূপ ব্যবহার কুরআনে প্রায় তেইশটি আয়াতে রয়েছে।

এসব আয়াতে তার পূর্বে صَدٌّ (বিরত রাখা) ব্যবহৃত হয়েছে –যেমন ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ قَدْ ضَلُّوْا ضَلٰلاً بَعِيْدًا -

যেসব লোক কুফরী করে ও (লোকদের) আল্লাহ্র পথ থেকে বিরত রাখে, তারা নিঃসন্দেহে পথভ্রষ্ট হয়ে অনেক দূর চলে গেছে। –সূরা নিসা ঃ ১৮৭

www.amarboi.org

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ -

যারা কুফরী গ্রহণ করেছে তারা (লোকদের) আল্লাহ্র পথ থেকে বিরত রাখার উদ্দেশ্যে তাদের ধন-মাল ব্যয় করে। –সূরা আনফাল ঃ ৩৬

কোনো কোনো আয়াতে 'সাবীলিল্লাহ্'র পূর্বে اضـــــلال 'গুমরাহ করা' শব্দটি এসেছে। যেমনঃ

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْتَرِىْ لَهْوَ الْحَدِيْثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ -

এমন লোকও আছে, যারা খেল-তামাশার কথা ক্রয় করে (লোকদেরকে) আল্লাহ্র পথ থেকে গুম্রাহ্ করে নেওয়ার উদ্দেশ্যে। –(সূরা লোকমান ঃ ৬)

২. যে যে আয়াতে 'সাবীলিল্লাহ্' শব্দটির পূর্বে عـن এসেছে– আর এই ধরনের আয়াতের সংখ্যাই অধিক– সেখানে হয় انـــــفـــــاق 'ব্যয় করা' শব্দটি তার পূর্বে এসেছে। যেমন ঃ

اَنْفِقُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ -

তোমরা আল্লাহ্র পথে অর্থ ব্যয় করো।

অথবা 'হিজরত' শব্দটি এসেছে। যেমন ঃ

وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ -

আর যারা হিজরত করেছে আল্লাহ্র পথে ......

কিংবা قتال (যুদ্ধ) বা قتل (হত্যা) শব্দটি এসেছে। যেমন ঃ

يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰه فَيَقْتُلُوْنَ وَيُقْتَلُوْنَ -

তারা সশস্ত্র যুদ্ধ করে আল্লাহ্র পথে, তাতে তারা হত্যাও করে আর নিজেরাও নিহত হয়। যেমন ঃ

وَلَاتَقُوْلُوْا لِمَنْ يُّقْتَلُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتٌ -

যারা আল্লাহ্র পথে নিহত হয়, তাদের মৃত বলো না।

অথবা তার পূর্বে 'জিহাদ' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন ঃ

وَجَاهِدُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ -

এবং তোমরা জিহাদ করো আল্লাহ্র পথে।

কিংবা দুর্ভিক্ষ বা অনুরূপ কোনো শব্দ এসেছে। এসব ক্ষেত্রে 'ফি-সাবীলিল্লাহ্' শব্দের কি অর্থ বা তাৎপর্য গ্রহণ করা হবে ?

www.amarboi.org

আভিধানিক অর্থে 'সাবীল' অর্থ পথ। আর 'সাবীলিল্লাহ্' অর্থ 'আল্লাহ্র সন্তুষ্টি ও প্রতিফল পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেওয়ার পথ।' আর আল্লাহ্ তা'আলা নবিগণকে পাঠিয়েছেন গোটা সৃষ্টিলোককে সেই দিকের পথ-প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে এবং তাঁর শেষ নবীকে সেই দিকে দাওয়াত দেওয়ার জন্যে নির্দেশ দিয়েছেন এই বলে ঃ

أُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ -

আহ্বান করো তোমার আল্লাহ্র পথে সুদৃঢ় যৌক্তিকতা ও উত্তম উপদেশ সহকারে। –সূরা নহল ঃ ১২৫

লোকদের মধ্যে এই কথা ঘোষণা করারও নির্দেশ দিয়েছেন ঃ

هٰذِهٖ سَبِيْلِىْ اُدْعُوْ اِلَى اللّٰهِ عَلٰى بَصِيْرَةٍ اَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِىْ (يوسف)

এটাই আমার পথ। আমি আল্লাহ্র পথে আহ্বান জানাই বুঝে শুনে ও অন্তর্দৃষ্টি সহকারে– আমি এবং আমার অনুসারী লোকেরা। –সূরা ইউসূফ

এখানে আরও একটা পথ রয়েছে। কিন্তু তা উক্ত পথের বিপরীত। তা হচ্ছে তাগুতের পথ। ইবলিশ শয়তান এবং তার চেলা-চামণ্ডারা সেই পথে লোকদের আহ্বান জানায়। সে পথটি তার পথিককে জাহান্নাম ও আল্লাহ্র ক্রোধ-অসন্তুষ্টির দিকে নিয়ে যায়। এ দুটো পথের ও এই পথ-দ্বয়ের পথিকদের মধ্যে তুলনাস্বরূপ আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেছেন ঃ

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ج وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ الطَّاغُوْتِ -

ঈমানদার লোকেরা যুদ্ধ করে আল্লাহ্র পথে এবং কাফেররা যুদ্ধ করে তাগুতের পথে। –সূরা নিসা ঃ ৭৬

'সাবীলিল্লাহ্'– 'আল্লাহ্র পথের আহ্বানকারী স্বল্পসংখ্যক এবং তার শত্রুপক্ষ– এই পথ থেকে বিরত রাখতে সচেষ্ট লোকের সংখ্যা বিপুল। আল্লাহ্র ঘোষণা ঃ 'তারা তাদের ধন-মাল ব্যয় করে এই উদ্দেশ্যে যে, তারা আল্লাহ্র পথ থেকে লোকদের বিরত রাখবে।' 'লোকদের মধ্যে এমনও আছে যারা খেলা-তামাশার বস্তু ক্রয় করে লোকদের আল্লাহ্র পথ থেকে বিরত রাখার উদ্দেশ্যে।' বলেছেন, 'তুমি যদি পৃথিবীর অধিকাংশ লোকের আনুগত্য অনুসরণ করো, তাহলে তারা তোমাকে আল্লাহ্র পথ থেকে গুমরাহ করে দেবে।' .....এ সব এই কারণে যে, এ পথে অনিবার্য কষ্ট ও দায়দায়িত্ব মানব-মন ও কামনা-বাসনাকে এই পথের বিরোধী ও

www.amarboi.org

রোধকারী বানিয়ে দেয়। এই কারণে মনের কামনা-বাসনা অনুসরণের পরিণতি সম্পর্কে হুশিয়ারী উচ্চারিত হয়েছে কুরআন মজীদেঃ

وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ -

তুমি মনের কামনা-বাসনার অনুসরণ করো না। তা করলে তোমাকে আল্লাহ্‌র পথ থেকে গুমরাহ্ করে দেবে।

আল্লাহ্‌র দুশমনরা যখন তাদের চেষ্টা-সাধনা ও অর্থশক্তি দ্বারা লোকদেরকে আল্লাহ্‌র পথে চলায় বাধা দান করার কাজে নিয়োজিত করেছে, তখন আল্লাহ্‌র সাহায্যকারী মুমিন লোকদের কর্তব্য হচ্ছে তাদের শক্তি-সামর্থ্য ও অর্থবল আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করা, আর ইসলাম তা ফরযও করে দিয়েছে। তাই এই কাজটিকে ফরয যাকাতের একটা অংশরূপে নির্দিষ্ট করেছে 'আল্লাহ্‌র পথে'র এই গুরুত্বপূর্ণ ব্যয়খাতে ব্যয় করার জন্যে– যেমন করে মুমিনদেরকে সাধারণভাবে তাদের ধন-মাল আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করার জন্যে উৎসাহ দান করেছে।

একালে 'সাবীলিল্লাহ্'র অংশ কোথায় ব্যয় করা হবে ?

আমরা দেখেছি, চারটি মাযহাবের প্রখ্যাত ও নির্ভরযোগ্য মত হচ্ছে ঃ 'সাবীলিল্লাহ'-এর অর্থ হচ্ছে সামরিক ও সশস্ত্রতার অর্থে জিহাদ ও যুদ্ধ। অন্য কথায়, 'সাবীলিল্লাহ' হচ্ছে ইসলামী যুদ্ধ। যেমন সাহাবায়ে কিরাম ও মহান তাবেয়িগণ যুদ্ধ করেছেন। তাঁরা তার সূচনা করেছেন আল্লাহ্‌র নামে, কুরআনের ঝাণ্ডার তলে। তাঁদের লক্ষ্য ছিল মানুষকে সৃষ্টিকুলের বন্দেগী ও দাসত্বের শৃংখল থেকে মুক্ত করে কেবলমাত্র এক আল্লাহ্‌র বান্দাহ বানিয়ে দেওয়া, জীবনের সংকীর্ণতা-কাঠিন্য থেকে নিষ্কৃতি দিয়ে জীবনের প্রশস্ততা-উদারতার মধ্যে নিয়ে আসা, ধর্মের নামে অত্যাচার-নিপীড়ন থেকে বের করে ইসলামের সুবিচার ও ন্যায়-নিষ্ঠা নিয়ে আসার জন্যে।

কেউ কেউ মনে করেন, আজকের দিনে এ ধরনের যুদ্ধের আর কোনো অস্তিত্ব বা অবকাশ নেই, দীর্ঘকাল পর্যন্তই তার অস্তিত্ব ছিলও না। যেসব রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ এ কালের মুসলিম দেশগুলোর ওপর চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে, এবং কিছুকাল ধরে চালিয়ে যেতে বাধ্য করা হচ্ছে, তা নিশ্চয়ই ইসলামী যুদ্ধ নয়। মুসলমানগণ তাতে কাফেরদের বিরুদ্ধে লড়ছে না। সেগুলো হচ্ছে জাতীয় বা স্বাদেশিক পর্যায়ের যুদ্ধ, তা একটি জাতি করে তাদের বিরুদ্ধে, যারা তাদের দেশ বা জাতির বিদ্রোহী হয়েছে অথবা অন্যায়ভাবে দখল করে নিয়েছে। এগুলো আসলে নেহায়েত বৈষয়িক যুদ্ধ, দ্বীনের সাথে তার দূরতম সম্পর্কও নেই। অতএব এসব যুদ্ধ কখনোই

www.amarboi.org

'ফী-সাবীলিল্লাহ' বলে গণ্য হতে পারে না। আর এজন্যেই এসব যুদ্ধে যাকাত ব্যয় করা কোনো মুসলমানের পক্ষেই জায়েজ নয়।

কোনো কোনো মুসলমান এরূপ ধারণা করেন, বলেনও। কিন্তু এ কথাটি বিশ্লেষণ সাপেক্ষ, তত্ত্বানুসন্ধান আবশ্যক, যেন তার ভুল ও শুদ্ধ দিকটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

ইসলামী যুদ্ধ বা ইসলামী জিহাদ কেবলমাত্র সেসব রূপের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, যা সাহাবায়ে কিরামের যুগে পরিচিত ছিল। বিদ্রোহী স্বৈরাচারী শক্তিসমূহ দমন বা উৎখাতের উদ্দেশ্যে যেসব যুদ্ধ পরিচালিত হচ্ছে– যার ফলে মুসলমানকে ইসলাম থেকে বলপূর্বক দূরে সরিয়ে নেওয়া হয় এবং ইসলামের দাওয়াত ও আন্দোলনকে শক্তিবলে নেস্তনাবুদ করা হয়, ইসলামের আন্দোলনকারীদের অত্যাচার-নিপীড়ন সহকারে হত্যা করা হয়, এ ধরনের যুদ্ধ– তার লক্ষ্য ও নিয়ম-নীতিসহ ইতিহাসে কখনোই পরিচিত বা পরিচালিত ছিল না। এসব যুদ্ধের ফলাফল ও প্রভাবের কোনো দৃষ্টান্ত অতীতে খুঁজে পাওয়া যাবে না। আসলে এগুলো ছিল বিদ্রোহীদের কর্তৃত্ব থেকে জাতিসমূহকে মুক্তকরণের উদ্দেশ্যে, তারা আল্লাহ্‌র বান্দাহ্‌দেরকে নিজেদের দাসানুদাস বানাবার উদ্দেশ্যেই এসব যুদ্ধ চালিয়েছে।

সন্দেহ নেই, এ অবস্থা ইসলামী যুদ্ধ এবং ইসলামী জিহাদের পক্ষে খুব ভয়াবহ, কিন্তু তা-ই একমাত্র অবস্থা নয়। ইসলামের ইতিহাসে এমন এমন যুদ্ধও সংঘটিত হতে দেখা গেছে, যাতে ইসলাম ও ইসলামপন্থীরা নিজেদের সত্তা, মান-মর্যাদা, ইজ্জত-আবরু, দেশ বা জন্মভূমি ও পবিত্রতম প্রতিষ্ঠানসমূহ রক্ষা করার উদ্দেশ্যে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। ইসলামের জন্যেই তারা ইসলামের দুশমনদের সাথে যুদ্ধ করেছে যার পবিত্রতা সাহাবা-তাবেয়ীনের যুদ্ধের তুলনায় কিছুমাত্র সামান্য নয়। এসব যুদ্ধের ইতিহাসের ইমাদুদ্দীন জংগী, নূরুদ্দীন মাহমুদ, সালাহুদ্দীন আইয়ূবী, কুতজ ও জাহির বেবিরস প্রমুখের নাম আজও জ্বলজ্বল করছে। এগুলো হিত্তীন, বাইতুল মাকদিস ও জানুত-কূপের যুদ্ধ। ইসলামী দেশকে তাতার ও ক্রুস যোদ্ধাদের কবল থেকে মুক্ত করার উদ্দেশ্যে এসব যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল।

সাহাবী ও তাবেয়ীনের যুদ্ধ যখন ইসলামী দাওয়াত সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে সংঘটিত হয়েছিল, তখন নূরুদ্দীন, সালাহুদ্দীন ও কুতুজের যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল ইসলামের দেশ ও ভূমি রক্ষার উদ্দেশ্যে। আর জিহাদ যেমন ফরয হয়েছে ইসলামী আকীদা-বিশ্বাস রক্ষার্থে– তার সমর্থনে, তেমনি ফরয হয়েছে ইসলামী দেশ রক্ষার জন্যেও। কেননা ইসলামী আকীদা-বিশ্বাস ইসলামী দেশের মতোই। এ দুটোরই পূর্ণ সংরক্ষণ এবং আক্রমণকারীদের দাঁত ভেঙ্গে দেওয়া একান্তই আবশ্যক।

www.amarboi.org

দেশ বা জমিনের এরূপ গুরুত্ব এবং তার সংরক্ষণ প্রতিরক্ষা একটা ইবাদত ও পবিত্র কর্তব্যরূপে গণ্য হওয়ার কারণ হচ্ছে তা দারুল-ইসলাম– ইসলামের আবাসস্থল, ইসলামের অবস্থানক্ষেত্র, ইসলামের পরিবেশ। পিতৃভূমি বা মাতৃভূমি অথবা বাপ-দাদার দেশ বলে নয়। কেননা মুসলমান অনেক সময় এই বাপ-দাদার দেশ থেকেও হিজরত করে ইসলামেরই ভালোবাসায়– ইসলামের সাথে আন্তরিক সম্পর্ক রক্ষার্থে অন্য দেশে– সম্পূর্ণ বিদেশ বিভূঁইয়ে চলে যেতেও প্রস্তুত হয়– যদি পূর্বের স্থানে ও দেশে ইসলাম পালন করা সম্পূর্ণ অবসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়, ইসলামের কথা শুনতে একটি কর্ণও প্রস্তুত না থাকে। রাসূলে করীম (স) এবং তাঁর সাহাবিগণ ঠিক এ কারণে ও এরূপ অবস্থায়ই মক্কা ত্যাগ করে চলে গিয়েছিলেন। তখন তাঁরা হয়েছিলেন 'মুহাজির ফী-সাবীলিল্লাহ'। এরূপ অবস্থা আজও হতে পারে শুধু তাই নয়, রাত-দিন হতে দেখা যাচ্ছে।

কাফেরী শাসন থেকে ইসলামের দেশ মুক্তকরণ

কোনো সন্দেহ নেই, এ কালেও 'জিহাদ' শব্দের বাস্তব প্রয়োগ হতে পারে জোরপূর্বক দখলকারী কাফেরদের প্রশাসন থেকে ইসলামী দেশ মুক্তকরণের সংগ্রামের ওপর। কেননা তারা তথায় আল্লাহ্র বিধান উচ্ছেদ করে কাফেরী শাসন প্রতিষ্ঠিত করেছে। এই কাফের ইয়াহুদী হোক, খ্রিস্টান হোক বা মূর্তিপূজারী অথবা নাস্তিক কমিউনিস্ট বা পাশ্চাত্যানুসারী– এরা কেউই আল্লাহ্র দ্বীন মেনে চলে না। আর কুফর– তার রূপ যাই হোক– এক অভিন্ন শক্তি, ইসলামের দুশমন।

পুঁজিবাদী ও কমিউনিস্টপন্থী, পাশ্চাত্যপন্থী বা প্রাচ্যবাদী, আহ্লি কিতাব কিংবা ধর্মহীন– ইসলামের দৃষ্টিতে সকলই সমান। এই সবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা ফরয– যদি তারা বল প্রয়োগ করে কোনো ইসলামী দেশ বা তার কোনো অংশ দখল করে নেয়। কোনো অংশ দখল করে নিলেও তা গোটা দেশের সমান গুরুত্বপূর্ণ। এই কর্তব্য কাজে শরীক হওয়ার বাধ্যবাধকতা নৈকট্যের দৃষ্টিতে বিচার্য। যারা অতি নিকটে, তাদের কর্তব্য সর্বাগ্রে। শেষ পর্যন্ত এই কর্তব্য গোটা মুসলিম জাতির ওপর বর্তে। কেউই এ কর্তব্য পালন থেকে অব্যাহতি পেতে পারে না। অবশ্য সকলের যোগদানের পরিবর্তে কিছু লোকের অংশ গ্রহণে যদি উদ্দেশ্যে সিদ্ধ হয়, তাহলে ভিন্ন কথা।

তবে একালে অনেক কয়টি মুসলিম দেশ কাফের শক্তি কর্তৃক দখলকৃত বা অধিকৃত, আক্রান্ত হওয়ার দরুন এখানকার গোটা মুসলিম জাতির ওপরই এক কঠিন দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে– যা ইতিপূর্বে কখনোই দেখা যায়নি। এ দেশগুলোর মধ্যে প্রথম উল্লেখ্য হচ্ছে ফিলিস্তিন। দুনিয়ায় বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থানকারী ইয়াহুদীরা

www.amarboi.org

এ দেশটি দখল করে নিয়েছে। কাশ্মীরের প্রধান অংশ দখল করে নিয়েছে হিন্দু মুশরিকরা। এরিটেরিয়া, আবিসিনিয়া, চাদ, পশ্চিম সোমালিয়া ও কবরুচ বা ক্রীট– ষড়যন্ত্রকারী হিংসুক খ্রিস্টান বা কমিউনিস্ট শক্তি এসব দেশ দখল করে নিয়েছে। আর সমরখন্দ, বোখারা, তাসখন্দ, উজবেকিস্তান ও আলবেনিয়া প্রভৃতি ইসলামী দেশ নাস্তিক খোদা বিদ্রোহী কমিউনিস্টরা শক্তি প্রয়োগ করে দখল করে নিয়েছে। এখনকার মতো শেষ শিকার হচ্ছে আফগানিস্তান। রাশিয়া (বর্তমানে আমেরিকা) নিতান্ত গায়ের জোরেই তা দখল করে রেখেছে।

এসব দেশ পুনরুদ্ধার করা ও কুফরী শাসন থেকে তা মুক্ত করা– কুফরী আইন-বিধান সম্পূর্ণ উৎখাত করা সামষ্টিকভাবে গোটা মুসলিম জাতিরই একান্ত কর্তব্য। এসব শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা একটা বড় ইসলামী ফরয বিশেষ।

এ উদ্দেশ্যে এসব দেশের যে কোনো অংশে কোনো যুদ্ধ শুরু হয়ে গেলে তা নিঃসন্দেহে 'জিহাদ ফী-সাবীলিল্লাহ' হবে। অবশ্য লক্ষ্য হতে হবে কুফরী শাসন ও কাফেরী কর্তৃত্ব থেকে মুক্তকরণ। এ যুদ্ধে ধন-মাল ব্যয় করা ও কার্যত সাহায্য-সহায়তা করা অবশ্যই ফরয হবে। আর এজন্যে যাকাতের একটা অংশ দেওয়াও একান্তই উচিত হবে। সে অংশের পরিমাণ কমও হতেও পারে, বেশিও হতে পারে– যাকাত বাবদ সঞ্চিত সম্পদের হার অনুপাতেই তা হবে একদিক দিয়ে। আর জিহাদের প্রয়োজনের দৃষ্টিতেও তা কম বা বেশি হতে পারে অপর দিকের বিচারে। আর অন্যান্য সর্ববিধ প্রয়োজনীয় ব্যয়ের তীব্রতা ও দুর্বলতার দৃষ্টিতেও তার বিবেচনা হতে পারে। এ সবই নির্ভর করে দায়িত্বশীল কর্মকর্তাদের বিবেচনাভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ওপর। মুসলিম পরামর্শদাতা বা উপদেষ্টাগণ যেরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন, সেরূপই হবে।

ইসলামী শাসন পুনপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা আল্লাহ্র পথের জিহাদ

এ কালে যাকাতের 'ফী-সাবীলিল্লাহ' অংশের ধন-সম্পদ সেই কাজে ব্যয় করা বাঞ্ছনীয়, যার উল্লেখ করেছেন প্রখ্যাত সংস্কারক মনীষী আল্লামা সাইয়েদ রশীদ রিজা (রা)। তিনি মুসলিমদের মধ্যে যারা দ্বীন ও দ্বীনী মর্যাদাসম্পন্ন লোক রয়েছেন, তাঁদের নিয়ে একটা সংস্থা গড়ে তোলার প্রস্তাব করেছেন। এ সংস্থাটি যাকাত সংক্রান্ত যাবতীয় ব্যাপার সুসংগঠিত করবে, সংগ্রহ ও বন্টন করবে এবং সর্বাগ্রে তা ব্যয় করবে এই সংস্থার সাথে সংশ্লিষ্ট যাবতীয় কল্যাণময় কাজে, অন্যত্র নয়। বলেছেন ঃ এ সংস্থাটির সংগঠনে এটা লক্ষ্য রাখা আবশ্যক যে, যাকাতের 'ফী-সাবীলিল্লাহ' খাতটির একটা ব্যয়ক্ষেত্র রয়েছে ইসলামী শাসন ও রাষ্ট্রব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা-প্রচেষ্টায়। বর্তমান অবস্থায় কাফেরদের আগ্রাসন থেকে

www.amarboi.org

ইসলামকে সংরক্ষণের জন্যে জিহাদ করার তুলনায় এটা অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। এজন্যে দাওয়াতী কাজও তার একটা ব্যয়ক্ষেত্র, মুখের বক্তৃতা ও ভাষা-সাহিত্য রচনার সাহায্যে তার প্রতিরক্ষা জরুরী। কেননা এখানে শক্তি প্রয়োগ করে প্রতিরক্ষা করা অধিক কঠিন বরং অসম্ভব ব্যাপার।[১]

এ মূল্যবান প্রস্তাব গভীর অনুধাবন শক্তির পরিচায়ক। মনে হচ্ছে, তিনি সূক্ষ্মভাবে পরিস্থিতি বিবেচনা করেছেন ইসলামের জন্যে– জীবনের সব কিছুর জন্যে। ইসলামের আহ্বান-আন্দোলনকারীদের উচিত এই প্রস্তাবটি শক্ত করে ধারণ করা, বোঝা ও বাস্তবায়ন করা। কেননা দ্বীনদার লোকদের ধন-মাল নিয়ে নাস্তিক, চরিত্রহীন, আদর্শহীন ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীদের জন্যে তা ব্যয় করার মতো নির্বুদ্ধিতা আর কিছু হতে পারে না।

হ্যাঁ, প্রথম ও সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কাজ 'ফী-সাবীলিল্লাহ' খাতে ইসলামী জীবন বিধান পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্যে সর্বাত্মক চেষ্টা-প্রচেষ্টা চালানো, যেখানে ইসলামী আইন বিধান বাস্তবায়িত হবে, ইসলামী আকীদা-বিশ্বাস, আচার-আচরণ, শরীয়াত, চরিত্র ইত্যাদি সবকিছু পুরামাত্রায় কার্যকর হবে।

সর্বাত্মক চেষ্টা-প্রচেষ্টা বলতে আমরা বুঝি সামষ্টিক সুসংগঠিত ও লক্ষ্যভিত্তিক কাজ এবং তা হবে ইসলামী জীবন বিধান বাস্তবায়নের জন্যে, ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে। আর তা হল ইসলামী খিলাফতের পুনঃপ্রতিষ্ঠা, মুসলিম উম্মতের পুনর্জাগরণ, ইসলামী সভ্যতার পুনরাভ্যুদয়।

এ ক্ষেত্রটিই প্রকৃতপক্ষে এমন যে, মুসলিম দানশীল লোকদের পক্ষে তাদের যাকাতের মাল ও অপরাপর সাধারণ সাদকা এই কাজে বিনিয়োগ করাই অধিক উত্তম ও কর্তব্য। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বহু মুসলমানই এ ক্ষেত্রটির গুরুত্ব অনুধাবন করতে ব্যর্থ হয়েছেন, মাল ও মনন শক্তির দ্বারা এই কাজের সমর্থন দানের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে পারেন নি। সর্বশক্তি দিয়ে এ ব্যাপারে চেষ্টা চালাতে মনে-প্রাণে প্রস্তুত হন নি। অথচ অবস্থা এই যে, যাকাত ও যাকাত-বহির্ভূত আর্থিক সাহায্য দিলে যাকাত ব্যয়ের অন্য খাতসমূহ নিঃশেষ হয়ে যায় না।

একালে ইসলামী জিহাদের বিচিত্র রূপ

আমরা এক্ষণে এ সিদ্ধান্তে পৌঁছে গেছি যে, ইসলামী জিহাদের কাজটি কেবলমাত্র বৈষয়িক বস্তুগত সামরিক পদক্ষেপের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; এ পথে জিহাদের আরও বহু প্রশস্ত পদ্ধতি ও ক্ষেত্র রয়েছে। সম্ভবত এ কালের মুসলিমগণ

---

১. تفسير المنار ج ١٠ ص ٥٩٨ ط ثانيه.

www.amarboi.org

সেই অন্যান্য প্রকারের জিহাদের মুখাপেক্ষী তুলনামূলকভাবে বেশি। বস্তুত এ কালে আমরা ঘোষিত ইসলামী জিহাদের আরও কতিপয় পদ্ধতি আয়ত্ত করতে পারি।

সে পদ্ধতি ও দৃষ্টান্তসমূহ পেশ করার পূর্বে এ বিষয়টির নিগূঢ় তত্ত্ব এবং তার গুরুত্ব সম্পর্কে কথা বলা প্রয়োজন মনে করছি।

সে নিগূঢ় তত্ত্ব হচ্ছে এই ঃ সুসংগঠিত সেনাবাহিনী সজ্জিতকরণ, তাকে সশস্ত্র বানানো এবং তার জন্যে অর্থ ব্যয়ের সমস্ত দায়-দায়িত্ব– ইসলামের সূচনাকাল থেকেই ইসলামী রাষ্ট্রের সাধারণ অর্থ ভাণ্ডারের ওপর অর্পিত ছিল। কেবল যাকাতের টাকা দিয়েই এ কাজটি হতো না। সেজন্যে 'ফাই' 'খারাজ' প্রভৃতি বাবদ সংগৃহীত অর্থ সেনাবাহিনী, অস্ত্র ক্রয় ও যুদ্ধকাজে ব্যয় করা হতো। যাকাতের অর্থব্যয় করা হতো কতিপয় পরিপূরক কাজে। যেমন নফল হিসেবে যুদ্ধে যোগানকারীদের খরচ বহন ইত্যাদি।

অনুরূপভাবে আমরা দেখছি, সেনাবাহিনী ও প্রতিরক্ষার যাবতীয় খরচের সামষ্টিক বোঝা সাধারণ বাজেটের কাঁধের ওপর চাপানো হয়ে থাকে। কেননা সে বাবদ একটা বিরাট ও ভয়াবহ ব্যয়ভারের দাবি করা হয়, যা কেবলমাত্র যাকাত সম্পদই বহন করতে সক্ষম হয় না। এরূপ ব্যয়ভার যদি যাকাত ফাণ্ডকেই বহন করতে হয়, তাহলে যাকাত বাবদ অর্জিত সমস্ত সম্পদ নিঃশেষে ব্যয় হয়েও তার প্রয়োজন পূরণ সম্ভব হবে না।

এ কারণে আমরা মনে করি, যাকাত খাতের সমস্ত আয় সাংস্কৃতিক প্রশিক্ষণমূলক ও প্রচারধর্মী কার্যাবলীতে ব্যয় করাই একালে উত্তম। তবে শর্ত এই যে, সে জিহাদটি ইসলামী হতে হবে সর্বতোভাবে, খালেস এবং যথার্থ ইসলামী। তা কখনো জাতীয়তা বা স্বাদেশিকতাবাদী ভাবধারায় কলুষিত হবে না। পাশ্চাত্য বা প্রাচ্য উপাদান সম্পন্ন ইসলামী ঝাণ্ডাধারীও হবে না তা। কেননা তাতে বিশেষ ধর্মমত বা বিশেষ ব্যবস্থা কিংবা শহর বা দেশ, শ্রেণী অথবা ব্যক্তির খেদমতই লক্ষ্য হয়ে থাকে। যেহেতু আমরা লক্ষ্য করছি, ইসলাম অনেক সময় এমন সব প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার শিরোনাম হয়ে দাঁড়ায়, যার অভ্যন্তরীণ ভাবধারা পুরোপুরি ধর্মনিরপেক্ষ বা ধর্মহীন হয়ে থাকে। অতএব এক্ষণে ইসলামকেই ভিত্তি ও মৌল উৎসরূপে গৃহীত হতে হবে, তা-ই হতে হবে চরম লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। অনুপ্রেরক ও পথ প্রদর্শক হতে হবে তাকে। তাহলেই এ সব প্রতিষ্ঠান আল্লাহ্‌র নামের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার মর্যাদা লাভের উপযুক্ত হতে পারবে। আর সে কাজটাই 'আল্লাহ্‌র পথের জিহাদ' নামে অভিহিত হতে পারবে।

www.amarboi.org

আমরা এ পর্যায়ে এমন বহু কাজের দৃষ্টান্তের উল্লেখ করতে পারি, যার ওপরে এ কালে ইসলামী দায়িত্ব পালন অনেক মাত্রায় নির্ভর করে। তাও 'আল্লাহ্‌র পথের জিহাদ' নামে অভিহিত হওয়ার যোগ্য হতে পারে।

সঠিক ইসলামী দাওয়াত প্রচারের কেন্দ্র স্থাপন এবং অমুসলিম লোকদের মধ্যে ইসলাম প্রচারের দায়িত্ব পালন একালে সব কয়টি মহাদেশেই একান্ত কর্তব্য। কেননা একালে বিভিন্ন ধর্ম ও মতবাদের মধ্যে প্রচণ্ড দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষ চলছে। এ কাজও 'জিহাদ-ফী-সাবীলিল্লাহ' রূপে গণ্য হতে পারে।

খোদ ইসলামী দেশসমূহের অভ্যন্তরে ইসলাম প্রচার কেন্দ্র গড়ে তোলা এবং মুসলিম যুব সমাজকে এ কাজে নিয়োজিত ও প্রতিপালন করা একান্ত আবশ্যক। এ সব কেন্দ্র যথার্থ ইসলামী আদর্শ প্রচার করে সর্বস্তরের জনগণকে ইসলামী আদর্শে উদ্বুদ্ধ করতে পারে। রক্ষা করতে পারে তাদেরকে সকল প্রকার নাস্তিক্যবাদী মতবাদের কু-প্রভাব থেকে, চিন্তা-বিশ্বাসের কঠিন বিপর্যয় থেকে, আচার-আচরণের বিচ্যুতি থেকে। এ কাজও ইসলামের সাহায্যরূপে চিহ্নিত হতে পারে, তাই ইসলামের দুশমনদের প্রতিহত করার এ-ও একটা কাজ এবং তাও ইসলামী জিহাদ।

খালেস ইসলামী মতবাদ ও চিন্তাধারামূলক বই-পুস্তক ও পত্র-পত্রিকা প্রচার করাও একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ। তা প্রতিহত করবে বিধ্বংসী ও বিভ্রান্তিকর চিন্তা-বিশ্বাসের ধারক বই-পুস্তক ও পত্র-পত্রিকার যাবতীয় কারসাজি। তার ফলেই আল্লাহ্‌র কালেমা প্রাধান্য লাভ করতে পারে এবং সত্য সঠিক চিন্তা সর্বত্র প্রচারিত হতে পারে। সম্ভব হতে পারে ইসলামের প্রতিরক্ষা। কেননা এ কালে ইসলামের ওপর বহু মিথ্যা ও ভিত্তিহীন কথা আরোপ করা হচ্ছে। জনমনে বহু সংশয় ও বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে দিচ্ছে। এ বই ও পত্রিকা ইসলামকে সর্বপ্রকার বাহুল্য ও বাড়াবাড়ি মুক্ত করে তার আসল রূপে উপস্থাপিত করবে। এ কাজও আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ। মৌলিক ইসলামী গ্রন্থাদি প্রকাশ করা– ইসলামের প্রকৃত বৈশিষ্ট্য সৌন্দর্য বিশ্লেষণ করা, তার অন্তর্নিহিত পবিত্র ভাবধারাসমূহ বিকশিত করা ইসলামী আদর্শের শ্রেষ্ঠত্ব, সমস্যার সমাধানে তার সর্বাধিক যোগ্যতা ও ক্ষমতা জনগণের সম্মুখে উপস্থাপিত করা একটা বিরাট কাজ। তা ইসলামের দুশমনদের সৃষ্ট সব বিভ্রান্তি ও সন্দেহের ধুম্রজাল ছিন্নভিন্ন করে দেবে। এ ধরনের বই-পুস্তক ব্যাপক ও সাধারণভাবে প্রচার করা একটি ইসলামী জিহাদ সন্দেহ নেই।

শক্তিমান বিশ্বস্ত ও নিষ্ঠাবান লোকদের পূর্বোক্ত কার্য ক্ষেত্রসমূহে সার্বক্ষণিকভাবে নিয়োগ করা, তাদের দৃঢ় সংকল্প ও মর্যাদাবোধ সহকারে সুস্পষ্ট রূপরেখা সম্মুখে

www.amarboi.org

নিয়ে এই দ্বীনের খেদমত করার সুযোগ করে দেওয়া– বিশ্বের চারদিকে ইসলামের নির্মল জ্যোতির কিরণ ছড়ানো, ওঁৎ পেতে থাকা শত্রুদের সব ষড়যন্ত্র জাল ছিন্ন করা আর ঘুমন্ত মুসলিম জনগণকে জাগ্রত করা এবং খৃস্টান মিশনারী ও নাস্তিকতার প্রচারকদের মুকাবিলা করা নিশ্চয়ই ইসলামী 'জিহাদ ফী-সাবীলিল্লাহ'।

প্রকৃত ইসলাম প্রচারকদের সাহায্য করাও কর্তব্য। কেননা তাদের ওপর বাইরের জগতের ইসলামের দুশমনদের প্রচণ্ড চাপ পড়ে। অভ্যন্তরীণভাবে আল্লাহদ্রোহী ও মুর্তাদ লোকদের কাছ থেকে তারা পাচ্ছে সর্বাত্মক অসহযোগিতা ও বিরোধিতা। তাদের ওপর আসে আঘাতের পর আঘাত প্রচণ্ডভাবে। নানা ধরনের আযাবে তারা হয় নিত্য জর্জরিত, তাদের হত্যা করা হয়, নিপীড়ন করা হয় মর্মান্তিকভাবে, তাদের পানাহার বন্ধ করে দিয়ে কষ্ট দেওয়া হয়, মেরে ফেলার ব্যবস্থা করা হয়। কুফর ও আল্লাহদ্রোহিতার এ প্রচণ্ড চাপের মুখে ঈমানের ওপর অবিচল থাকার কাজে তাদের সর্বপ্রকার সাহায্য করা নিঃসন্দেহে আল্লাহ্র পথে অতি বড় জিহাদ।

এ ধরনের বহুবিধ বিচিত্র ক্ষেত্র এমন রয়েছে, যেখানে একালে যাকাতের সম্পদ ব্যয় করা মুসলমানদের জন্যে খুবই কল্যাণকর হতে পারে। যাকাতের ওপরও– আল্লাহ্র পরে ইসলামের ধারক-বাহকগণের প্রয়োজন পূরণের গুরুত্ব রয়েছে, বিশেষ করে ইসলামের বর্তমান দুর্দিনে তো তার গুরুত্ব কোনো অংশেই কম হওয়া উচিত নয়।

ইবনুস-সাবীল– নিঃস্ব পথিক

'ইবনুস-সাবীল' কে ?

জমহুর আলিমগণের মতে 'ইবনুস-সাবীল' বলে বোঝানো হয়েছে সেই পথিক– মুসাফিরকে, যে এক শহর থেকে অন্য শহরে– এক দেশ থেকে অন্য দেশে চলে যায়। 'সাবীল' অর্থ পথ। পথিককে 'ইবনুস-সাবীল' বলা হয় এজন্যে যে, পথিকের জন্যে পথই হয় অবিচ্ছিন্ন সাথী। যেমন কবি বলেছেন ঃ

أَنَا ابْنُ الْحَرْبِ رَبَّتْنِي وَلِيْدًا

إِلَى أَنْ شِبْتُ وَاكْتَهَلْتُ لَدَاتِي

আমি সমর সন্তান, তা-ই আমায় জন্মকাল থেকে লালিত করেছে–শেষ পর্যন্ত আমি যৌবন লাভ করেছি এবং বৃদ্ধ হয়েছি জটিল সমস্যার মধ্যে পড়ে ....

www.amarboi.org

আরবরা তা-ই করে। সে যে জিনিসের সাথে জড়িত হয়ে পড়ে, নিজেকে সে জিনিসেরই সন্তান বলে ঘোষণা করে। বলে .... তাঁর পুত্র।[১]

তাবারী মুজাহিদ থেকে বর্ণনা করেছেন, বলেছেন, ইবনুস– সাবীল– পথিক ব্যক্তির একটা হক্ রয়েছে যাকাত সম্পদে, সে যদি ধনী হয় তবুও– যদি সে তার নিজের ধন-সম্পদ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। ইবনে জায়দ বলেছেন ঃ 'ইবনুস-সাবীল' মানে মুসাফির, পথিক– সে ধনী হোক, কি গরীব উভয় অবস্থায়ই, যদি সে স্বীয় প্রয়োজনীয় ব্যয়ের ব্যাপারে বিপদগ্রস্ত হয়ে পড়ে, সম্পদ হারিয়ে ফেলে অথবা অন্য কোনো ধরনের বিপদের সম্মুখীন হয়ে পড়ে অথবা তার হাতে যদি কোনো সম্পদই না থাকে, তাহলে তার এই হক অবশ্যই প্রাপ্য।[২]

(এ কারণে বাংলায় আমরা ইবনুস-সাবীল-এর আনুবাদ করেছি এক শব্দে 'নিঃস্ব পথিক' বলে– আনুবাদক)

'ইবনুস-সাবীল'-এর প্রতি কুরআনের বদান্যতা

কুরআন মজীদ 'ইবনুস-সাবীল' শব্দটি দয়ার পাত্র হিসেবে– সদ্ব্যবহার পাওয়ার অধিকারীরূপে– আটবার উল্লেখ করেছে। কুরআনের মক্কী অংশের সূরা আল-ইসরায় আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন ঃ

وَاٰتِ ذَا الْقُرْبٰى حَقَّهٗ وَالْمِسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيْرًا

এবং নিকটাত্মীয়কে দাও তার হক্ এবং মিসকীন, নিঃস্ব পথিককেও এবং তুমি অপব্যয় করবে না।[৩]

সূরা 'আর-রুম'-এ বলা হয়েছে ঃ

فَاٰتِ ذَا الْقُرْبٰى حَقَّهٗ وَالْمِسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ ط ذٰلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَ اللّٰهِ –

'অতএব দাও নিকটাত্মীয়কে তার হক্ এবং মিসকীন ও নিঃস্ব পথিককেও। এ কাজ অতীব কল্যাণময় সেসব লোকের জন্যে, যারা আল্লাহ্র সন্তুষ্টি চায়।[৪]

কুরআনের মাদানী সূরাসমূহে 'ইবনুস-সাবীল'কে ফরয কিংবা নফল অর্থব্যয়ের ক্ষেত্র হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

---

১. تفسير الطبرى - بتحقيق محمود شاكر ج ١٤ ص ٣٢٠.
২. ঐ
৩. সূরা বনী-ইসরাঈল ঃ ২৬ আয়াত ৪. সূরা রূম ঃ ৩৮ আয়াত

www.amarboi.org

يَسْئَلُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ ط قُلْ مَآاَنْفَقْتُمْ مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْ وَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ وَالْيَتَامٰى وَالْمَسَاكِيْنَ وَابْنِ السَّبِيْلِ -

লোকেরা তোমাকে জিজ্ঞাসা করে, তারা কি এবং কোথায় ব্যয় করবে ? বলো, তোমরা যে-ধন-মালই ব্যয় করো না কেন, তা করবে আল্লাহ্‌র জন্যে, পিতাম মাতার জন্যে, নিকটাত্মীয়দের জন্যে, ইয়াতীম-মিসকীন ও নিঃস্ব পথিকদের জন্যে।[১]

দশটি অধিকার সংক্রান্ত আয়াতে 'ইবনুস-সাবীল'-এর প্রতি দয়া অনুগ্রহ্‌ করার আদেশ করা হয়েছে। আয়াতটি এই ঃ

وَاعْبُدُوْاللّٰهَ وَلَاتُشْرِكُوْابِهٖ شَيْئًا وَّبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَّبِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتَامٰى وَالْمَسَاكِيْنَ وَالْجَارِذِى الْقُرْبٰى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيْلِ لا وَمَامَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ -

তোমরা সকলে আল্লাহ্‌র বন্দেগী কবুল করো, তাঁর সাথে কোনো কিছুই শরীক করো না, পিতামাতার সাথে উত্তম দয়ার্দ্র ব্যবহার করো এবং নিকটাত্মীয়, পার্শ্ববর্তী সঙ্গী, নিঃস্ব পথিক এবং তোমাদের দক্ষিণ হস্তের মালিকানাভুক্ত দাস-দাসীদের সাথে।[২]

বায়তুলমালে গনীমতের এক-পঞ্চমাংশ জমা হলে তাতেও নিঃস্ব পথিকের জন্যে একটা অংশ নির্দিষ্ট হয়ে যায়। এরশাদ হয়েছে ঃ

وَاعْلَمُوْآ اَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّنْ شَىْءٍ فَاَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهٗ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتَامٰى وَالْمَسَاكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ

তোমরা জেনে রাখো, যে জিনিসই তোমরা গনীমত হিসেবে পাও, তার এক-পঞ্চমাংশ আল্লাহ্‌র জন্যে, রাসূলের জন্যে, নিকটাত্মীয়ে জন্যে, ইয়াতীম, মিসকীন ও নিঃস্ব পথিকের জন্য নির্দিষ্ট। –আনফাল ঃ ৪১

'ফাই সম্পদেও তার জন্যে অংশ নির্দিষ্ট রয়েছে। এরশাদ হয়েছে ঃ

১. সূরা বাকারা ঃ ২১৫ ২. সূরা নিসা ঃ ৩৬

www.amarboi.org

مَآ اَفَاءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مِنْ اَهْلِ الْقُرٰى فَلِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِى الْقُرْبٰى وَالْمَسَاكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ لا كَيْلَا يَكُوْنَ دُوْلَةً ۢ بَيْنَ الاَغْنِيَآءِ مِنْكُمْ -

আল্লাহ্ তাঁর রাসূলকে নগরবাসীদের নিকট থেকে যে 'ফাই' সম্পদ পাইয়ে দেন, তা আল্লাহ্র জন্যে, রাসূলের জন্যে, নিকটাত্মীয়ের জন্যে এবং ইয়াতীম, মিসকীন ও নিঃস্ব পথিকের জন্যে যেন ধন-সম্পদ কেবলমাত্র তোমাদের ধনী লোকদের মধ্যেই আবর্তিত হতে না থাকে। —সূরা হাশর ঃ ৭

অনুরূপভাবে কুরআন যাকাতেরও একটা অংশ নিঃস্ব পথিকের জন্যে নির্দিষ্ট করেছে। তা এখনকার আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে। যার সূচনা হয়েছে এভাবেঃ اِنَّمَا الصَّدَقٰتُ যাকাত আদায় করার পরও ব্যক্তিদের নিকট যে মাল-সম্পদ সঞ্চিত থাকে, তাতেও তার জন্যে অংশ নির্দিষ্ট হয়েছে। এরূপ অবস্থায় এই দান আল্লাহভীতি ও পরম পুণ্যময় কাজের অন্তর্ভুক্ত। আয়াতটি হচ্ছে ঃ

وَاٰتَى الْمَالَ عَلٰى حُبِّهٖ ذَوِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ لا وَالسَّآئِلِيْنَ وَفِى الرِّقَابِ ج وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ وَاٰتَى الزَّكٰوةَ

এবং দেয় মাল-সম্পদ আল্লাহ্র প্রতি ভালোবাসার দরুন নিকটাত্মীয়কে, ইয়াতীম, মিসকীন, নিঃস্ব পথিক, প্রার্থী, দাসত্ব-শৃংখলে বন্দী লোকদেরকে এবং নামায কায়েম করে ও যাকাত দেয়। —সূরা বাকারা ঃ ১৭৭

'ইবনুস সাবীল'কে যাকাত দেওয়ার শর্ত

'ইবনুস-সাবীল'—'পথ-পুত্র'কে যাকাতের অংশ দেওয়ার ব্যাপারে কতিপয় শর্ত আরোপ করা হয়েছে। কয়েকটি শর্ত সর্বসম্মত এবং কয়েকটি শর্তের ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে।

প্রথম শর্ত, 'পথ-পুত্র' যে স্থানে রয়েছে, সেখানেই তাকে অভাবগ্রস্ত হতে হবে তার স্বদেশে পৌঁছার সম্বলের জন্যে। তার নিকট সেই সম্বল থেকে থাকলে তাকে যাকাতের অংশ থেকে দেওয়া যাবে না। কেননা তার তো কাজ হল তার নিজের ঘরে পৌঁছা। মুজাহিদের অবস্থা ভিন্নতর। সে যাকাতের অংশ নিতে পারবে— অ-হানাফীদের মতও এই— যদিও সে তার নিজের অবস্থান স্থানে ধনশালী ব্যক্তি। কেননা তাকে তা দেওয়া হবে শত্রুদের ভীত ও বিতাড়িত করার লক্ষ্যে। আর জিহাদকারীকে যাকাত দেওয়া হবে আল্লাহ্র দুশমনদের মুকাবিলায় তাকে সাহসী শক্তিমান করে তোলার উদ্দেশ্যে।

www.amarboi.org

দ্বিতীয়, তার সফর পাপমুক্ত হতে হবে। তার সফর যদি কোনো পাপ কাজের লক্ষ্যে হয়– যেমন কাউকে হত্যা করা বা হারাম ব্যবসায়ের জন্যে প্রভৃতি– তা হলে তাকে যাকাতের অংশ থেকে দেওয়া যাবে না একবিন্দুও। কেননা তাকে দেওয়ার অর্থ তার সেই পাপ কাজে তাকে সহায়তা করা। কিন্তু মুসলমানদের ধন-মাল দিয়ে আল্লাহ্‌র নাফরমানীর কাজে সহায়তা করা যেতে পারে না। তবে সে যদি খালেসভাবে তওবা করে, তবে তার অবশিষ্ট সফরের খরচ বাবদ দেওয়া যাবে। তার যদি অভাবে মরে যাওয়ার আশংকা দেখা দেয় তাহলে তওবা না করলেও তাকে দেওয়া যাবে। কেননা পাপ করলে সে করবে, তাকে মারার জন্যে ছেড়ে দিয়ে সমাজ তো পাপ করতে পারে না।[১]

আর যে সফরে কোনো গুনাহ নেই সে সফর কোনো ইবাদতের জন্যে হতে পারে, হতে পারে কোনো প্রয়োজনের জন্যে বা প্রমোদবিহারও হতে পারে। ইবাদতের সফর যেমন হজ্জ, জিহাদ ও কল্যাণকর ইল্‌ম সন্ধান এবং জায়েজ যিয়ারতের সফর ইত্যাদি, সে সব পথিককে যাকাত দানে কোনো মতভেদ নেই। কেননা ইবাদতের কাজে সাহায্য তো শরীয়তে কাম্য। বৈষয়িক প্রয়োজনের সফরও হতে পারে– যেমন ব্যবসা, জীবিকা সন্ধান প্রভৃতির উদ্দেশ্যে বিদেশ গমন। যারা বলেন যে, 'ইবনুস-সাবীল' হচ্ছে সেই লোক, যে তার নিজের ঘর-বাড়ি ও ধন-মাল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে, তাদের মতে সে পথিককে যাকাত দেওয়া যাবে। কেননা এ হচ্ছে বৈধ বৈষয়িক প্রয়োজনের কাজে সাহায্য দান। সঠিক লক্ষ্য অর্জনের জন্যে সাহায্য।

যে শাফেয়ী ফিকাহ্‌বিদ নিজ ঘর থেকে রওয়ানাকারীকেও 'ইবনুস-সাবীল' মনে করেন, উক্ত ব্যাপারে তাদের দুটি কথা ঃ

একটি, দেওয়া যাবে না। কেননা এ সফরে তার কোনো প্রয়োজন নেই।

দ্বিতীয়, দেওয়া যাবে। কেননা শরীয়ত যে সফরের রুখসাত বা অনুমতি দিয়েছে তাতে ইবাদতের সফর ও মুবাহ সফরের মধ্যে কোনো পার্থক্য করা হয়নি। যেমন নামায 'কসর' পড়া যাবে, রোযা ভাঙা যাবে উভয়বিধ সফরেই। এ অত্যন্ত সহীহ্ কথা।

---

২. দেখুন ঃ حاشية الدسوقى ج ١ ص ٤٩٨ মালিকী মতের কেউ কেউ বলেছেন, তার মৃত্যুর আশংকা হলেও তাকে দেওয়া যাবে না। কেননা তার মুক্তি তার নিজের হাতেই রয়েছে, সে সহজেই তওবা করতে পারে। দেখুন حاشية الصاوى ج ١ ص ٢٣٢ অন্যরা বলেছেন, পাপটা কি ধরনের তা দেখতে হবে। নর হত্যার বা কারুর ইজ্জত নষ্ট করার ইচ্ছা থাকলে দেওয়া যাবে না, তওবা করলে দেওয়া যাবে।

www.amarboi.org

আনন্দ ও বিনোদনের সফর পর্যায়ে খুব বেশি মতভেদের সৃষ্টি হয়েছে বিশেষ করে শাফেয়ী ও হাম্বলী মাযহাবের লোকদের মধ্যে।

তাঁদের কেউ কেউ বলেছেন, দেওয়া যাবে। কেননা এ সফর পাপমুক্ত। অপররা বলেছেন, দেওয়া যাবে না। কেননা এ সফরের প্রকৃত কোনো প্রয়োজন নেই। বরং এ এক প্রকারের বেহুদা অর্থব্যয়।[১]

তৃতীয়, সে যদি ঋণ বা অগ্রিম হিসেবে পাওয়ারও কোনো উপায় না পায়– তাকে দেওয়ার মতো কোনো লোকই না পাওয়া যায় সেই স্থানে, যেখানে সে রয়েছে তাহলে তাকে যাকাত থেকে দেওয়া যাবে। এই কথা সে লোক সম্পর্কে যার নিজের ঘরে ধন-মাল রয়েছে, ঋণ শোধ করার সামর্থ্যও আছে।[২]

এই শর্তটি মালিকী ও শাফেয়ী মাযহাবের কেউ কেউ আরোপ করেছেন যদিও এ মাযহাবেরই অপর লোকেরা এর বিরোধিতা করেছেন।

ইবনুল আরাবী তাঁর 'আহকামুল কুরআন' গ্রন্থে এবং কুরতুবী তাঁর তাফসীরে অগ্রাধিকার দিয়েছেন এ মতকে যে, 'ইবনুস-সাবীল'কে যাকাত থেকে দেওয়া যাবে, অগ্রিম দেওয়ার মতো কোনো লোক পাওয়া গেলেও। তাঁরা দুজনই বলেছেন, কারোর ব্যক্তিগত অনুগ্রহের বশবর্তী হওয়ার কোনো আবশ্যকতা নেই। আল্লাহ্র অনুগ্রহ নিয়ামতও তো পাওয়া গিয়েছে।[৩] তা-ই যথেষ্ট।

ইমাম নববী বলেছেন, 'ইবনুস-সাবীল' যদি এমন লোক পেয়ে যায়, যে তাকে লক্ষ্যস্থলে পৌছার জন্য প্রয়োজন পরিমাণ সম্পদ ঋণ বাবদ দেবে, তবু তার পক্ষে ঋণ করা জরুরী নয়। বরং তার জন্যে যাকাত ব্যয় করা সম্পূর্ণ জায়েজ।[৪]

হানাফী আলিমগণের বক্তব্য হচ্ছে, পারলে ঋণ নেওয়াই তার পক্ষে উত্তম। তবে তা করা কর্তব্য নয়। কেননা হতে পারে সে ঋণ আদায় করতে অক্ষম হয়ে পড়বে।[৫]

ইবনুল আরাবী ও কুরতুবী যে কারণের উল্লেখ করেছেন তার সাথে সংযোজিত এ হচ্ছে অপর একটি কারণ। এই দুই 'ইল্লাত' বা কারণ ইবনুস সাবীলের জন্যে ঋণ গ্রহণ করার বাধ্যতা আরোপ করতে নিষেধ করে ঃ

---

১. দেখুন المجموع للنووى ج ٦ ص ٢١٤- ٢١٥ والشرح الكبير المطبوع مع المغنى ج ٢ ص ٨٠١ - ٨٠٢

২. এই জন্য দেখুন شرح الخرشى على خليل ج ٢ ص ٢١٩ نهاية المحتاج للرملى ج ٦ص ١٥٦

৩. الحكام القوان - القسم الثانى ص ٩٥٨ تفسير القرطبى ج ٨ ص ١٨٧

৪. المجموع ج ٦ص ١٨٧

৫. দেখুন فتح القدير ج ٢ ص ١٨ رد المحتارج ٢ ص ٦٤

www.amarboi.org

প্রথম, ঋণ গ্রহণ করায় লোকদের অনুগ্রহ স্বীকার করতে হয়। কিন্তু আল্লাহ্ তা করার জন্যে চাপ দেন নি।

দ্বিতীয়, ঋণ ফেরত দিতে অক্ষম হওয়া সম্ভব। আর তা হলে সেটা তার পক্ষেও যেমন ক্ষতিকর, তেমনি ক্ষতিকর ঋণদাতার জন্যেও।

'ইবনুস-সাবীল'কে কত দেওয়া হবে

ক. 'ইবনুস-সাবীল'কে খোরাক-পোশাকের ব্যয় এবং লক্ষ্যস্থল পর্যন্ত পৌঁছার জন্যে যা প্রয়োজন অথবা তার ধন-মাল পথিমধ্যে কোথাও থাকলে তা যেখানে রয়েছে, সে পর্যন্ত পৌঁছার খরচ দিতে হবে। এ ব্যবস্থা তখনকার জন্যে, যখন পথিকের সঙ্গে আদৌ কোনো ধন-মাল থাকবে না। আর যদি এমন পরিমাণ মাল তার সঙ্গে থাকে যা যথেষ্ট নয়, তা হলে প্রয়োজনীয় পরিমাণ দিতে হবে।

খ. সফর দীর্ঘ পথের হলে তার জন্যে যানবাহনের ব্যবস্থা করে দিতে হবে। দীর্ঘ সফরের পরিমাণ হচ্ছে যে পথে চললে নামায 'কসর' করা চলে তা। প্রায় ৮০ কিলোমিটার দীর্ঘ। অথবা পথিক দুর্বল– পথ চলতে অক্ষম হলে সে দৃষ্টিতেও পথের দৈর্ঘ্য নিরূপণ করা যায়। আর পথিক যদি সক্ষম ব্যক্তি হয় এবং তার সফর নামায 'কসর' করার পরিমাণ দীর্ঘ পথের না হয় তাহলে যানবাহনের ব্যবস্থা করা হবে না। তবে তার সঙ্গের জিনিসপত্র নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করা যাবে। কিন্তু সে জিনিসপত্র যদি সে নিজেই বহন করে নিতে সক্ষম হয় তাহলে তা বহনের ব্যবস্থা করারও প্রয়োজন হবে না।

ফিকাহবিদগণ বলেছেন, যানবাহনের ব্যবস্থা করা বলতে বোঝায়, সম্পদ বিপুল থাকলে তা দিয়ে একটা যান ক্রয় করা। আর কম হলে ভাড়ায় নেওয়া হবে। তাঁরা একথা বলেছেন এজন্যে যে, সেকালে যানবাহনরূপে সাধারণত জন্তু-জ ানোয়ারই ব্যবহৃত হতো। এজন্যেই তা ক্রয় করতে বা ভাড়ায় নিতে বলা হয়েছে। কিন্তু আজকের দিনে যানবাহনের অনেক বিবর্তন ও উন্নতি সাধিত হয়েছে। মোটর গাড়ি, রেল গাড়ি, জাহাজ, লঞ্চ, উড়োজাহাজ ইত্যাদি কত রকমেরই না যানবাহন একালে পাওয়া যায়! এগুলো ক্রয় করার কোনো উপায় নেই, প্রয়োজনও নেই। মোটকথা অবস্থা অনুপাতে সহজলভ্য কোনো যানবাহনের ব্যবস্থা করে দিলেই হবে। যার পক্ষে রেল গাড়ি বা জাহাজ-লঞ্চ সহজ হবে, তার জন্যে উড়োজাহাজের ব্যবস্থা করা অনাবশ্যক। যেন যাকাতের মাল নির্দয়ভাবে ব্যয় করা না হয়। যা না হলে চালে না, শুধু তার ব্যবস্থাই তা দিয়ে করা যাবে।

গ. সফরের সব খরচই বহন করা যাবে। কেবল তা-ই শুধু নয়, যা সফরের দরুন অতিরিক্ত পড়ছে। এটাই সহীহ কথা।

www.amarboi.org

ঘ. সফরকারী উপার্জনে সক্ষম হোক কি অক্ষম– উভয় অবস্থাতেই দেওয়া যাবে।

ঙ. তার যাওয়ার ও ফিরে আসার জন্যে যে পরিমাণটা যথেষ্ট তা-ই দেওয়া যাবে– যদি সে ফিরে আসার ইচ্ছা রাখে এবং সেখানে ধন-মাল কিছু পাওয়ার সুযোগ তার যদি না থেকে থাকে।

কোনো কোনো আলিম বলেছেন, তার সফরকালে ফিরে আসার জন্য কিছু দেওয়া যাবে না, তা দেওয়া যাবে যখন সে ফিরে আসবে তখন। আর কেউ কেউ বলেছেন, সে যদি যাওয়ার পরই ফিরে আসবার ইচ্ছা রাখে তাহলে ফিরে আসার জন্যেও দেওয়া যাবে। আর সে যদি একটা সময় পর্যন্ত তথায় অবস্থান করার ইচ্ছা রাখে তাহলে ফিরে আসার জন্যে দেওয়া যাবে না। কিন্তু প্রথমোক্ত মতটিই ঠিক।

চ. অবস্থান করার ইচ্ছা থাকলে তখন কি করা হবে এই পর্যায়ে শাফেয়ী আলিমগণ একটু বিস্তারিত করে বলেছেন। আর তা হচ্ছে, যদি চারদিনের কম সময় অবস্থান করার ইচ্ছা থাকে– যাওয়া ও আসার দিন ছাড়া তাহলে অবস্থানের ব্যায়ও বহন করা হবে। কেননা আসলে সে তখন সফরেই রয়েছে। এজন্যে সে রোযা ভাঙতে পারে, নামায কসর করতে পারে, সফরের সব সুবিধাই সে ভোগ করতে পারে। কিন্তু যোদ্ধার ব্যাপার তা নয়। তার দূরদেশে অবস্থানকালীন খরচাদিও বহন করতে হবে, তা যত দীর্ঘই হোক। পার্থক্য হচ্ছে, যোদ্ধাকে তো বিজয়ের আশায় বসে থাকতে হয়। যোদ্ধা 'গাযী' এই নাম বা পরিচিতিটা তার অপরিবর্তিতই থাকে কোনো স্থানে অবস্থান করলেও বরং তা আরও শক্ত হয়। কিন্তু সফরকারীর তা হয় না।

অন্যদের কেউ কেউ বলেছেন, 'ইবনুস-সাবীল'কেও দিতে হবে তার অবস্থানকালের জন্যেও তা যত দীর্ঘই হোক। অবশ্য সাফল্যের আশায় অবস্থান করার প্রয়োজন দেখা দিলে তবেই।[১]

ছ. 'ইবনুস-সাবীল' যখন সফর থেকে ফিরে আসবে, তখন কিছু পরিমাণ সম্পদ উদ্বৃত্ত ও অবশিষ্ট থাকলে তা তার নিকট থকে ফেরত নেওয়া হবে কি হবে না এ একটা প্রশ্ন। ফিকাহবিদগণ এ বিষয়ে মতামত ব্যক্ত করেছেন।

এর জবাবে শাফেয়ীরা বলেছেন ঃ হ্যাঁ, নেয়া হবে, সে নিজের ওপর কৃচ্ছতা গ্রহণ করে থাকুক কি না-ই থাকুক। অন্য মত হচ্ছে, যদি সে নিজের ওপর কৃচ্ছতা করে থাকে তবে এবং এই কারণেই যদি সম্বল উদ্বৃত্ত থেকে থাকে, তাহলে তা ফেরত নেওয়া হবে না। কিন্তু যোদ্ধার জন্যে তা নয়। সে নিজের ওপর কৃচ্ছতা

---

১. দেখুন المجموع ج ٦ ص ٢١٥-٢١٦ الشرح الكبير ص ٧٨٠١ - ٧٠٢

www.amarboi.org

করে থাকলে তার নিকট থেকে তা ফেরত নেওয়া হবে না। কেননা যোদ্ধা যা নেয়, তা বিনিময় হিসেবেই নেয়। আমরা তার মুখাপেক্ষী, সে যুদ্ধ করলেই আমরা রক্ষা পাই। আর তা সে করছে। পক্ষান্তরে 'ইবনুস-সাবীল' নিজেই তার নিজের প্রয়োজনে সাহায্য গ্রহণ করে আর এই সাহায্য গ্রহণ করায় তার সে প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে।[১] অতএব উদ্বৃত্তের ওপর তার কোনো অধিকার থাকার কথা নয়।

এ যুগে 'ইব্‌নুস্-সাবীল' পাওয়া যায় কি

সমকালীন কোনো কোনো আলিম মনে করেছেন, আমাদের এ যুগে 'ইবনুস্-সাবীল' ধরনের লোক দেখতে পাওয়া যায় না। কেননা এ কালের যোগাযোগ ব্যবস্থা খুবই উন্নত, দ্রুত গতিবান এবং বিচিত্র ধরনের। মনে হচ্ছে, গোটা পৃথিবী যেন একটি শহরে পরিণত হয়েছে। তাছাড়া লোকদের উপায়-উপকরণও বিপুল, সহজলভ্য। দুনিয়ার যে কোনো স্থানে বসে মানুষ স্বীয় ধন-মাল নিয়ন্ত্রিত করতে পারে ব্যাংকের মাধ্যমে, অন্যান্য উপায়ে।[২]

উপরিউক্ত কথা মরহুম শায়খ আহমাদ আল-মুস্তফা আল-মারাগী তাঁর তাফসীরে উদ্ধৃত করেছেন। কিন্তু আমরা এই মতের বিপরীত কথা বলতে চাই। কেননা আমরা দেখতে পাচ্ছি, আমাদের এ যুগেও 'ইবনুস-সাবীল' পাওয়া যায়– যে কোনো শহর থেকে– যে-কোনো উপায়েই হোক ধন-মাল লাভ করা যেতে পারে বলে যতই দাবি করা হোক না কেন।

---

১. ردالمحتار ج ٢ ص - ٦٤ فتح القدير ج ٢ ص ١٨
২. দেখুন ঃ تفسير المراغى ج ٢٨ সূরা হাশর-এর ষষ্ঠ আয়াতের তাফসীরে এই মত লেখা হয়েছে।

www.amarboi.org

গ্রন্থকার পরিচিতি

মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম (রহ) বর্তমান শতকের এক অনন্যসাধারণ ইসলামী প্রতিভা। এ শতকে যে ক'জন খ্যাতনামা মনীষী ইসলামী জীবন-ব্যবস্থা কায়েমের জিহাদে নেতৃত্ব দানের পাশাপাশি লেখনীর সাহায্যে ইসলামকে একটি কালজয়ী জীবন-দর্শন রূপে তুলে ধরতে পেরেছেন, তিনি তাঁদের অন্যতম।

এই ক্ষণজন্মা পুরুষ ১৩২৫ সনের ৬ মাঘ (১৯১৮ সালের ১৯ জানুয়ারী) সোমবার, বর্তমান পিরোজপুর জিলার কাউখালী থানার অন্তর্গত শিয়ালকাঠি গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৩৮ সালে তিনি শর্ষীনা আলিয়া মাদ্রাসা থেকে আলিম এবং ১৯৪০ ও ১৯৪২ সালে কলকাতা আলিয়া মাদ্রাসা থেকে যথাক্রমে ফাযিল ও কামিল ডিগ্রী লাভ করেন। ছাত্রজীবন থেকেই ইসলামের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে তাঁর জ্ঞানগর্ভ রচনাবলি পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হতে থাকে। ১৯৪৩ থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত তিনি কলিকাতা আলীয়া মাদ্রাসায় কুরআন ও হাদীস সম্পর্কে উচ্চতর গবেষণায় নিরত থাকেন। ১৯৪৬ সালে তিনি এ ভূখণ্ডে ইসলামী জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার আন্দোলন শুরু করেন এবং সুদীর্ঘ চার দশক ধরে নিরলসভাবে এর নেতৃত্ব দেন।

বাংলা ভাষায় ইসলামী জ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম (রহ) শুধু পথিকৃতই ছিলেন না, ইসলামী জীবন দর্শনের বিভিন্ন দিক ও বিভাগ সম্পর্কে এ পর্যন্ত তাঁর প্রায় ৬০টিরও বেশি অতুলনীয় গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর 'কালেমা তাইয়েবা', 'ইসলামী রাজনীতির ভূমিকা', 'মহাসত্যের সন্ধানে', 'বিজ্ঞান ও জীবন বিধান', 'বিবর্তনবাদ ও সৃষ্টিতত্ত্ব', 'আজকের চিন্তাধারা', 'পাশ্চাত্য সভ্যতার দার্শনিক ভিত্তি', 'সুন্নাত ও বিদয়াত', 'ইসলামের অর্থনীতি', 'ইসলামী অর্থনীতি বাস্তবায়ন', 'সুদমুক্ত অর্থনীতি', 'ইসলামে অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ও বীমা', 'কমিউনিজম ও ইসলাম', 'নারী', 'পরিবার ও পারিবারিক জীবন', 'আল-কুরআনের আলোকে উন্নত জীবনের আদর্শ', 'আল-কুরআনের আলোকে শিরক ও তওহীদ', 'আল-কুরআনের আলোকে নবুয়্যাত ও রিসালাত', 'আল-কুরআনে রাষ্ট্র ও সরকার', 'ইসলাম ও মানবাধিকার', 'ইকবালের রাজনৈতিক চিন্তাধারা', 'রাসূলুল্লাহর বিপ্লবী দাওয়াত', 'ইসলামী শরীয়াতের উৎস', 'অপরাধ প্রতিরোধে ইসলাম', 'অন্যায় ও অসত্যের বিরুদ্ধে ইসলাম', 'শিক্ষা সাহিত্য ও সংস্কৃতি', 'ইসলামে জিহাদ', 'হাদীস শরীফ (তিন খণ্ড)' ইত্যাকার গ্রন্থ দেশের সুধীমহলে প্রচণ্ড আলোড়ন তুলেছে। এছাড়া অপ্রকাশিত রয়েছে তাঁর অনেক মূল্যবান পাণ্ডুলিপি।

মৌলিক ও গবেষণামূলক রচনার পাশাপাশি বিশ্বের খ্যাতনামা ইসলামী মনীষীদের রচনাবলি বাংলায় অনুবাদ করার ব্যাপারেও তাঁর কোনো জুড়ি নেই। এসব অনুবাদের মধ্যে রয়েছে মওলানা মওদূদী (রহ)-এর বিখ্যাত তফসীর 'তাফহীমুল কুরআন', আল্লামা ইউসুফ আল-কারযাভী-কৃত 'ইসলামের যাকাত বিধান (দুই খণ্ড)' ও 'ইসলামে হালাল হারামের বিধান', মুহাম্মদ কুতুবের 'বিংশ শতাব্দীর জাহিলিয়াত' এবং ইমাম আবু বকর আল-জাসসাসের ঐতিহাসিক তফসীর 'আহকামুল কুরআন'। তাঁর অনূদিত গ্রন্থের সংখ্যাও ৬০টিরও ঊর্ধ্বে।

মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম (রহ) বাংলাদেশ সহ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া থেকে ইসলামী সম্মেলন সংস্থা (ওআইসি)-র অন্তর্গত ফিকাহ্ একাডেমীর একমাত্র সদস্য ছিলেন। তিনি ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ সূচিত 'আল-কুরআনে অর্থনীতি' এবং 'ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস' শীর্ষক দুটি গবেষণা প্রকল্পেরও সদস্য ছিলেন। প্রথমোক্ত প্রকল্পের অধীনে প্রকাশিত দুটি গ্রন্থের অধিকাংশ প্রবন্ধ তাঁরই রচিত। শেষোক্ত প্রকল্পের অধীনে তাঁর রচিত 'সৃষ্টিতত্ত্ব ও ইতিহাস দর্শন' নামক গ্রন্থটি এখনও প্রকাশের অপেক্ষায়।

মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম (রহ) ১৯৭৭ সালে মক্কায় অনুষ্ঠিত প্রথম বিশ্ব ইসলামী শিক্ষা সম্মেলন ও রাবেতা আলমে ইসলামীর সম্মেলন, ১৯৭৮ সালে কুয়ালালামপুরে অনুষ্ঠিত প্রথম দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় ইসলামী দাওয়াত সম্মেলন, একই বছর করাচিতে অনুষ্ঠিত প্রথম এশীয় ইসলামী মহাসম্মেলন, ১৯৮০ সালে কলম্বোতে অনুষ্ঠিত আন্তঃপার্লামেন্টারী সম্মেলন এবং ১৯৮২ সালে তেহরানে অনুষ্ঠিত ইসলামী বিপ্লবের তৃতীয় বার্ষিক উৎসবে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করেন।

এই মনীষী ১৩৯৪ সনের ১৪ আশ্বিন (১৯৮৭ সালের ১ অক্টোবর) বৃহস্পতিবার এই নশ্বর দুনিয়া ছেড়ে মহান আল্লাহর সান্নিধ্যে চলে গেছেন। (ইন্না-লিল্লা-হি ওয়া ইন্না-ইলাইহি রাজিউন)